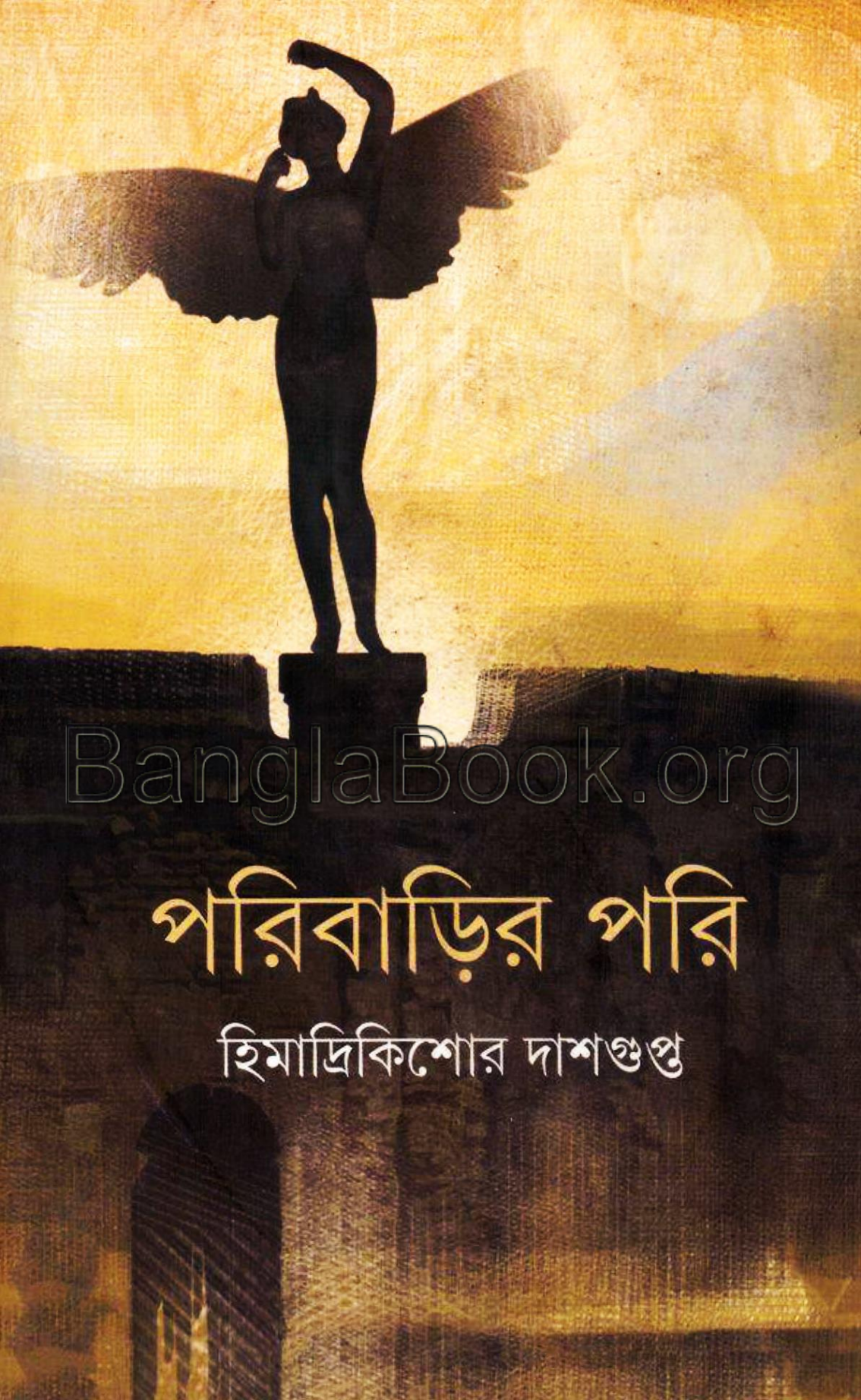

BanglaBook.org

পরিবাড়ির পরি

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

পরিবাড়ির চারপাশ ঘিরে শরদিন্দু স্যার,
তিথি, অভ্র, নীলা, আরও অনেক মানুষ।
সবাই চেষ্টা করছে নিজেদের জীবনবৃত্তকে
মেলাবার। পরিবাড়ির পরি কি পারবে
মানুষের জীবনের ছোট-বড় অসম্পূর্ণ
বৃত্তগুলোকে মিলিয়ে দিতে? এই
উপন্যাসে জীবন রহস্যময়।

গৌর কারক

ও

সোনামুখী লগ্নউষা সাহিত্যপত্রিকার বন্ধুদের

শরদিন্দু কিছুটা দূর থেকে দেখলেন, রাস্তার বাঁকে শিমুলগাছের নীচে বাণীব্রত, মানে, বাণীবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। প্রায় সাড়ে পাঁচটা বাজে, রোদ পড়ে এসেছে। আজ স্কুল থেকে বেরোতে দেরি হয়েছে শরদিন্দুর। শেষ পিরিয়ডে ক্লাস টেস্ট নিচ্ছিলেন। নিশ্চয়ই বাণীবাবু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন তাঁর জন্য। শরদিন্দু একটু বিব্রত বোধ করলেন। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে গাছটার কাছে পৌঁছোতেই বাণীবাবু তাঁকে দেখে হেসে বললেন, "কী মাস্টার, কোনও একস্ট্রা ক্লাস ছিল নাকি?"

শরদিন্দু মৃদু হেসে জবাব দিলেন, "একটা পরীক্ষা নিচ্ছিলাম।"

বাণীবাবু হাঁটতে শুরু করে বললেন, "সত্যি, আপনাদের মতো ডেডিকেটেড লোক পাওয়া আজকাল মুশকিল। তা আপনার শিক্ষকজীবনের বৃত্ত তো সম্পূর্ণ হয়ে এল। আর তো মাত্র ক'টা দিন। এরপর কী করবেন, ভেবেছেন কিছু? টোল খুলবেন?"

শরদিন্দু হাঁটতে হাঁটতে জবাব দিলেন, "না, তেমনভাবে এখনও কিছু ভাবিনি। তবে টোল খুলব না। একটা বড় বৃত্ত সম্পূর্ণ করলাম। তার পাশে আর একই ধরনের ছোট কোনও বৃত্ত আঁকব না। করলে, অন্য কিছু করব।"

"তা হলে কি সমাজসেবা?"

শরদিন্দু বললেন, "আজকাল সমাজসেবা বলতে যা বোঝায়, তা করার মতো যোগ্যতা বা ক্ষমতা, কোনওটাই আমার নেই। ইচ্ছেও নেই।"

বাণীবাবু বললেন, "আমি না হয় সারাজীবন সরকারি কাগজে পেন ঘষে গেলাম। কিন্তু আপনি তো মাস্টারি করলেন অ্যাদ্দিন। কত ছাত্র তৈরি করলেন। এটা কি সমাজসেবা নয়?"

"ছাত্র তৈরির ব্যাপারে অবশ্যই আমার একটা তৃপ্তি আছে। সেই তৃপ্তি হয়তো বেশ জোরালো। যখনই তাদের কথা ভাবি, মনটা আনন্দে ভরে যায়। কত বড় বড় জায়গায় পৌঁছেছে সব। কিন্তু কাজটা সমাজসেবা কি না, তা আমার জানা নেই। মাস গেলে বেতন তো নিই। সেবার বিনিময়ে অর্থ..." কথাটা শেষ করলেন না শরদিন্দু।

BanglaBook.org

বাণীবাবুও আর কোনও কথা না বলে পাশে হাঁটছিলেন।

রাস্তাটা কাঁচা হলেও বেশ প্রশস্ত। দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় সব গাছ। আম, শিমুল, নিম, জাম। প্রাচীন সব গাছ। তাদের নীচে পুটুশফুল, লজ্জাবতী আর আকন্দের ঝাড়। গাছের ফাঁক গলে দিনান্তের আলো এসে পড়েছে গুঁড়ির নীচে ছোট ছোট ঝোপে। হলুদ রঙের প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে তাদের উপর, কোথাও বা কাচপোকা। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় এই রাস্তাটা শরদিন্দুর বেশ লাগে। শহরটা রেলস্টেশনের পূর্বদিকে ছড়িয়ে আছে, এই অংশে বাড়েনি। শরদিন্দুর স্কুলটা রেললাইনের এপাশে হলেও ব্যাঙ্ক-পোস্ট অফিস-থানা-বাজার, অর্থাৎ, শহর বলতে যা বোঝায়, তা সবই রেললাইনের অপরপ্রান্তে। শরদিন্দুর বাড়িটাও তাই। তবে বাণীবাবু এপাশেই থাকেন। সরকারি অফিসার ছিলেন তিনি। গতবছর রিটায়ার করেছেন। গত কয়েকমাস যাবৎ বিকেলে লাইন পেরিয়ে এদিকে হাঁটতে আসেন শরদিন্দু। বয়স হচ্ছে তাঁর। স্কুল, বাজার এসব সাইকেলেই করেন তিনি। তবুও এই বয়সে একটু হাঁটা ভাল। হাঁটতে এসেই শরদিন্দুর সঙ্গে আলাপ বাণীবাবুর। তাঁদের মতো আরও অনেকে হাঁটতে আসেন এদিকে। অধিকাংশই প্রৌঢ় মানুষ। একা বা দল বেঁধে ঘোরেন আশপাশে। আর নির্জনতার সন্ধানে এখানে আসে কিছু অল্পবয়সি ছেলেমেয়ে।

এই রাস্তা, গাছপালা শরদিন্দুর বহুদিনের পরিচিত। ছেলেবেলায় দল বেঁধে আসতেন ফলের সন্ধানে। বিশেষত এই গ্রীষ্মকালে। বাড়িতে না বলে এদিকে আসার জন্য সেসময় মায়ের কাছে মারও খেয়েছেন কত! যুবা বয়সেও এসেছেন। তারপর অবশ্য দীর্ঘ ব্যবধান। এই সেদিন বৈকালিক ভ্রমণ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত এই রাস্তায় আর আসা হত না তাঁর। স্কুলটা এপাশে হলেও অনেক পিছনে। এমনিতে এই রাস্তায় আসার প্রয়োজন হয় না তাঁর। শুধু শরদিন্দু কেন, আর পাঁচজনেরও বোধহয় তেমন প্রয়োজন হয় না। এ রাস্তায় খুব একটা জনবসতি নেই। এদিক-ওদিক এক-আধটা বাড়ি আছে। তবে তা নিতান্তই নগণ্য। মাইলখানেক এগিয়ে রাস্তা শেষ হয়েছে একটা ঢিপি মতো জায়গায়। লোকে বলে, মা মনসার ঢিপি। শ্রাবণ মাসে কেউ কেউ ফুল-দুধ-কলা দিতে যায় সেখানে।

তবে এই রাস্তায় হাঁটলেই স্মৃতি যেন ঘিরে ধরে শরদিন্দুকে। অসংখ্য মুখ, ঘটনা। কতদিনের পুরনো স্মৃতি সব। কিন্তু তাঁর মনে হয়, এই তো সেদিনের

BanglaBook.org

কথা। যাঁরা এই রাস্তায় সেদিন তাঁর সাথী ছিলেন, তাঁদের প্রায় কারও সঙ্গেই আর দেখা হয় না শরদিন্দুর। হলেও তাঁরা পরস্পরকে চিনতে পারবেন কি না সন্দেহ। অথচ এই রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়িয়ে চোখ বুজলেই মুহূর্তের মধ্যে ভেসে ওঠে সার সার মুখ। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে দেখা ছোট ছোট ছেলেদের মুখ। অনেকসময় স্কুলে ছোট কোনও ছেলের মুখে সেসব মুখের আদল দেখে, কৌতূহলী হয়ে শরদিন্দু তাদের পরিচয় জানার চেষ্টা করেন। কিন্তু যেখানে পৌঁছোবার চেষ্টা করেন, পৌঁছোতে পারেন না। সময়ের অদৃশ্য প্রাচীর পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে।

আজও এই পথে হাঁটতে হাঁটতে সেসব দিনের কথাই ভাবছিলেন শরদিন্দু। বেশ কিছুক্ষণ পর হঠাৎ খেয়াল হল, বাণীবাবু তাঁকে নিয়ে রাস্তা ছেড়ে একটা সুঁড়িপথ ধরেছেন। জায়গাটা অনেকটা বাগানের মতো। সামান্য তফাতে দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় গাছ, জাম, ফলসা আম ইত্যাদি। গাছের গুঁড়িগুলো যেন মানুষের মুখের বিভিন্ন ভঙ্গিমা। স্বর্ণলতা, আমবুরুজের শিকড় নেমেছে উপর থেকে। বেশ ছায়াঘন পরিবেশ। কোথায় যেন একটা পাখি ডাকছে। সে পথে ঢুকতেই চিন্তাজাল ছিন্ন হল শরদিন্দুর। বাণীবাবুকে তিনি বললেন, "এদিকে কোথায় যাচ্ছেন?"

তিনি জবাব দিলেন, "ওদিকে একটা পুকুর আছে। আমি একদিন গিয়েছিলাম। রোজই তো এক রাস্তায় ঘুরি। চলুন, আজ ওদিকে নিয়ে যাচ্ছি। আপনার ভাল লাগবে।"

BanglaBook.org

পুকুর! বাণীবাবুর কথা শুনে সামান্য চমকে উঠলেন শরদিন্দু। মুহূর্তের মধ্যে তাঁকে এসে ঘিরে ধরল অন্য একটা স্মৃতি, যাকে তিনি আজও সযত্নে লুকিয়ে রেখেছেন মনের গহনে। শরদিন্দু চুপচাপ অনুসরণ করতে লাগলেন বাণীবাবুকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল একটা পুকুর এবং একটা জীর্ণ বাড়ির অস্পষ্ট অবয়ব। তারপর একসময় তাঁরা এসে দাঁড়ালেন পুকুরের ধারে। বিঘেখানেকের পুকুর। তার ওপাশে বেশ অনেকটা জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা প্রাচীন বাড়ি।

দেখলেই বোঝা যায়, বাড়িটা বহুদিন যাবৎ পরিত্যক্ত।

একতলার জানালা-দরজাগুলো কপাটহীন, দোতলার বারান্দার রেলিং খসে পড়েছে। বারান্দা-সংলগ্ন ঘরগুলোর বন্ধ জানালাগুলোর উপর দিয়ে নেমে এসেছে ছাদের কার্নিশে গজিয়ে ওঠা বটের ঝুরি। তারা যেন অসংখ্য

হাতে জানালার পাল্লাগুলোকে জড়িয়ে ধরে বলছে, এ জানালা আর কোনওদিন খুলবে না! তবে চিলেকোঠার মাথার উপর সেই শ্বেতপাথরের পরির মূর্তিটা কিন্তু এখনও দাঁড়িয়ে আছে। সূর্য হেলে পড়েছে বাড়ির পিছনে, তার লাল আভা চিলেকোঠায় দাঁড়ানো নিঃসঙ্গ পরির গায়ে। লাল জলফড়িং উড়ছে জলের উপর। পুকুরের জল তিরতির করে কাঁপছে। কেউ এই মুহূর্তে শরদিন্দুকে স্পর্শ করলে বুঝতে পারত, পুকুরের জলের মতোই তাঁর শরীরের মৃদু কম্পন। নিজের বুকের ভিতর জলতরঙ্গের একটা অস্পষ্ট শব্দ যেন শুনতে পাচ্ছেন তিনি। অনেকদিনের বন্ধ দরজায়, সময়ের ওপাশ থেকে এসে কে যেন ঘা দিচ্ছে।

"ও মশাই, ওভাবে কী দেখছেন? আসুন একটু বসা যাক।" বাণীবাবুর কথায় সংবিৎ ফিরল শরদিন্দুর। কয়েকধাপ জীর্ণ সিঁড়ি নেমেছে ঘাটের দিকে। সিঁড়ির ফাটল থেকে মাথা তুলেছে ছোট ছোট ঝোপঝাড়। ঘাটের শেষ ধাপে এসে বসলেন দু'জনে। পায়ের কাছে টলটলে জল।

"এ জায়গাটা বেশ, তাই না? আমি ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছিলাম একদিন। আপনি এখানে এসেছেন কোনওদিন?" জানতে চাইলেন বাণীবাবু।

শরদিন্দু সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, এসেছি," তারপর মনে মনে হিসেব করতে লাগলেন। ঠিক কতবছর আগে তিনি শেষ এসেছিলেন এখানে? ত্রিশ বছর হবে কি? না, না, তারও বহু আগে।

"এই বাড়িটা কার জানেন? এভাবে পড়ে আছে! এত বড় বাড়ি... কোনও জমিদারের কি?" আবার জানতে চাইলেন বাণীবাবু।

"কেন আপনি জানেন না? আপনি তো এপারেরই লোক?"

"এপারের লোক হলে কী হবে। আপনাদের শহরে তো এসেছি মাত্র পাঁচবছর। তাও বদলির চাকরি বলে এসে পড়লাম, শহরটা ভাল লাগল বলে থেকে গেলাম। যদ্দিন চাকরি ছিল, ভোরবেলা উঠে অফিসে ছুটতাম। বাড়ি-অফিস-বাজার ছাড়া এখানকার অনেককিছুই আমার অজানা।"

শরদিন্দু কয়েকমুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, "জমিদার নয়, তবে বড় ব্যাবসা ছিল ওদের। নর্থ বেঙ্গলে চা-বাগান, আরও অনেককিছুই ছিল। জানেন, এই শহরে প্রথম মোটরগাড়ি ঢুকেছিল ওদের দৌলতেই। প্রথম টেলিফোনও এসেছিল এখানেই। দোল, দুর্গাপুজো সব এই বাড়িতে হত। ওই যে বাড়ির ডানদিকে জঙ্গল দেখছেন, ওখান দিয়ে এই বাড়িতে আসার একটা

BanglaBook.org

রাস্তা ছিল। রাস্তাটা এদিক-ওদিক ঘুরে, আমাদের স্কুলের রাস্তা হয়ে পৌঁছোত রেল স্টেশনে।"

বাণীবাবু বললেন, "এত বড় বাড়ির কী দুর্দশা, দেখেছেন? আচ্ছা, বাড়িটা ফেলে ওঁরা সব কোথায় গেলেন? ওদের কোনও ওয়ারিশ নেই? এভাবে এতবড় সম্পত্তি ফেলে রেখেছেন।"

শরদিন্দু কোনও জবাব না দিয়ে তাকিয়ে রইলেন জলের দিকে। নিঃস্তব্ধ চারপাশ। শুধু মাঝে মাঝে কাছের কোনও ঝোপ থেকে সোনাপোকার শব্দ ভেসে আসছে। পুকুরের জলে কাঠিপোকারা বৃত্ত রচনা করছে। ছোট ছোট সব বৃত্ত। বৃত্তগুলো পূর্ণতা পাওয়ার আগেই অন্য একটা বৃত্তরঙ্গ এসে, তাকে ভেঙে দিয়ে, নিজেও ভেঙে যাচ্ছে। একটা আবছা অবয়ব ফুটে উঠছে জলে, তারপরই আবার মুছে যাচ্ছে কম্পিত অসম্পূর্ণ বৃত্তের তরঙ্গের নীচে। ক্ষণিকের জন্য তৈরি হওয়া সেই আবছা অবয়ব কার? চিলেকোঠায় দাঁড়িয়ে থাকা একাকী পরিটার, না শরদিন্দুর মনের গভীরতম অংশ থেকে উঠে আসা অন্য কোনও নারীর মুখ? জলের দিকে তাকিয়ে সেটা বোঝার চেষ্টা করতে লাগলেন শরদিন্দু।

বেশ কিছুক্ষণ পর বাণীবাবু বললেন, "আপনি যে আজকে একদম চুপ মেরে গেলেন! অন্যদিন তো আপনার সংসার, মানে, আপনার স্কুলের ব্যাপারে কত কথা বলেন। সেখানে কিছু হয়েছে? নাকি শরীর খারাপ?"

শরদিন্দু হেসে বললেন, "না, না, ওসব কিছু নয়। আসলে একসময় আমি এখানে খুব আসতাম। সেসব দিনের কথা ভাবছি। দেখতে দেখতে কতদিন হয়ে গেল!"

"এখানে আসতেন মানে? কোথায়? ওই বাড়িটায়?"

শরদিন্দু প্রশ্নটাকে এড়িয়ে পালটা প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, স্মৃতি আপনাকে পিছনদিকে টানে?"

বাণীবাবু জবাবে বললেন, "তা কখনও কখনও টানে। যেমন, আমি ছেলেবেলায় যে বাড়িতে থাকতাম, সেখানে একটা কাঁঠালিচাঁপা গাছ ছিল। হলুদরঙের ফুল ফুটত তাতে। বেশ গন্ধ। এখনও কোথাও সে গন্ধ পেলে, আমার বাড়িটার কথা মনে পড়ে যায়। তবে কী জানেন, ওই স্মৃতিফিতি নিয়ে আমি বিশেষ মাথা ঘামাই না। তাতে অনেক সময় কষ্ট বাড়ে। জীবন তো প্রায় শেষ হয়ে এল। গড়িয়ে গড়িয়ে বাকি ক'টা দিন কেটে গেলেই হল," বেশ

BanglaBook.org

দার্শনিকের মতো শেষ কথাগুলো বলে তিনি প্রশ্ন করলেন, "হঠাৎ একথা জিজ্ঞেস করলেন?"

শরদিন্দু শুধু জবাব দিলেন, "এমনি জিজ্ঞেস করলাম।"

আরও বেশ কিছুক্ষণ সেখানে বসে রইলেন তাঁরা। সময় দ্রুত সরে যাচ্ছে। পাখির ঝাঁক ঘরে ফিরতে শুরু করেছে। কালো হয়ে আসছে পুকুরের জল। পাখিদের শেষ ঝাঁকটা চিলেকোঠার পরির মাথার উপর দিয়ে দূরে মিলিয়ে যাওয়ার পর উঠে দাঁড়ালেন দু'জনে। এবার ফিরতে হবে। ঘাটের উপর উঠে বাড়িটার দিকে শেষবারের মতো একবার ফিরে তাকালেন শরদিন্দু। একটা ধূসর ছায়া গ্রাস করে নিচ্ছে বাড়িটাকে, পরিটা যেন হারিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ তারই মধ্যে একটা দৃশ্য ধরা দিল শরদিন্দুর চোখে। বাড়ির ডানদিকের জংলা জায়গাটা, যেখান দিয়ে অনেকদিন আগে একটা রাস্তা ছিল এদিকে আসার, সেদিকের ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে বাড়িটার সামনে এসে থামল একটা সাইকেল। দু'জন মানুষ নামল। কিছুটা অস্পষ্ট হলেও তাদের দু'জনের একজন যে নারীমূর্তি, তা বুঝতে পারলেন শরদিন্দু।

কারা ওরা? একটু থমকে দাঁড়ালেন শরদিন্দু। ছায়ামূর্তিদুটো কিন্তু সেখানে দাঁড়াল না। সাইকেল নিয়ে হেঁটে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল বাড়ির ভিতর। বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছেন বাণীবাবু। শরদিন্দুও তাঁর পিছন পিছন হাঁটতে শুরু করলেন।

BanglaBook.org

॥ ২ ॥

চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে একবার ঘড়িটা দেখল অভ্র। বিকেল পাঁচটায় সুবীর আসবে বলেছে। পাঁচটা প্রায় বাজতে চলেছে। পার্টি অফিসে ঢোকার পথটা গুমটি থেকে অভ্র দেখতে পাচ্ছে। পার্টি অফিসের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে একটা কালো এসইউভি। অভ্র অনুমান করল, ওটাই নীহার চৌধুরীর গাড়ি হবে। সুবীরের 'নীহারদা'! লোকটাকে এর আগে দূর থেকে দু'বার মাত্র দেখেছে অভ্র। একবার ইলেকশন ক্যাম্পেনিং-এ, আর-একবার অভ্রদের বাড়ির পাশের ক্লাবের অ্যানুয়াল প্রোগ্রামের উদ্বোধনে, যে ক্লাবের সেক্রেটারি সুবীর।

নীহার চৌধুরী সম্বন্ধে ঠিক ধারণা নেই অভ্রর। লোকে বলে, এই শহরের মুকুটহীন রাজা হল নীহার চৌধুরী। পাড়ার ক্লাব থেকে শুরু করে স্কুল, ব্যবসায়ী সমিতি, থানা-পুলিশ, সবই নাকি নীহার চৌধুরীর নির্দেশে চলে। আবার কিছু কানাঘুষোও শোনা যায়। পরিবাড়ির পুকুরে যে জোড়া লাশ ভেসে উঠেছিল, তার পিছনে নাকি এই লোকটারই হাত ছিল। অভ্র একদিন ব্যাপারটা সুবীরকে জিজ্ঞেস করায় সে বলেছিল, "এসব স্রেফ অপপ্রচার। নীহারদা অ্যাসেম্বলিতে ক্যান্ডিডেট হতে চলেছে, তাই অপোনেন্ট আগে থেকেই এসব অপপ্রচার শুরু করেছে। অবশ্য আমাদের পার্টিরও একটা ফ্যাকশন ব্যাপারটায় ইনভলভ্ড। তবে নীহারদার কিছু করতে পারবে না। নীহারদা এই বেল্টের লিডার অফ দ্য লিডার্স।"

"অপোনেন্ট না হয় অপপ্রচার শুরু করেছে, কিন্তু তোদের নিজেদের পার্টির লোকও ইনভলভ্ড কেন?" অভ্র অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল।

সুবীর জবাব দিয়েছিল, "ব্যাপারটা তুই ঠিক বুঝবি না। এসব ইন্ট্রা পার্টি স্ট্রাগলের ব্যাপার। অসীম রুদ্র লোকটাও আমাদের পার্টির ক্যান্ডিডেট হতে চায়। তাই ও চাইছে, পার্টির হায়ার লিডারশিপের কাছে নীহারদার ইমেজটা খারাপ করতে, যদি নীহারদার বদলে ওর শিকে ছেঁড়ে! শালা শুয়োরের বাচ্চা!" অসীম রুদ্রর উদ্দেশে আরও বেশ কিছু চোখা চোখা বিশেষণ প্রয়োগ করে সুবীর বলেছিল, "যদি তোর কোনওদিন নীহারদাকে দিয়ে কোনও কাজ করাতে হয়, বলবি আমাকে। তোকে নিয়ে যাব। দেখবি, দাদার সঙ্গে আমার কীরকম র‍্যাপো! একদিন আমার সঙ্গে গিয়ে পরিচয়ও করে আসতে পারিস।"

রাজনীতির সঙ্গে অভ্রর পরিবারের কেউ কোনওদিন যুক্ত ছিল না। অভ্র তো নয়ই। তাই সুবীর তার নীহারদার গুণকীর্তন অভ্রর কাছে করলেও, ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করার আগ্রহ সে এর আগে দেখায়নি।

কিন্তু নীহার চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করার জন্যই আজ এখানে বসে আছে অভ্র। সুবীর থাকতে বলেছে। সে তাকে পার্টি অফিসে নিয়ে যাবে। লোকটা কেমন হবে? হুট করে চাকরির ব্যাপারে লোকটার শরণাপন্ন হওয়া! ভিতরে ভিতরে একটা অস্বস্তি অনুভব করছে অভ্র।

বয়েজ স্কুলে ডেপুটেশন ভ্যাকেন্সিতে একজন টিচার নেবে একবছরের জন্য। অভ্র অ্যাপ্লাই করেছে। এই কথাটা নীলাকে বলতেই সে বলেছিল,

BanglaBook.org

"দ্যাখো না চেষ্টা করে। যদিও একবছরের ব্যাপার, কিন্তু এটা দেখিয়েই বিয়েটা সেরে নেওয়া যাবে। স্কুলের সঙ্গে যুক্ত থাকলে টিউশনটা ধরতে পারবে। তোমার-আমার চলে যাবে।"

অভ্র বলেছিল, "সবই তো বুঝলাম। চাকরিটা পাওয়ার জন্যই তো অ্যাপ্লাই করেছি। কিন্তু আমার সঙ্গে অনেকেই নিশ্চয়ই অ্যাপ্লাই করবে।"

নীলা পালটা বলেছিল, "এসব ব্যাপারও শুনেছি, পার্টি ঠিক করে। তুমি একদিন বলছিলে না, তোমার এক বন্ধু তোমাকে নীহার চৌধুরীর কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিল? আমি শুনেছি, ওই লোকটার নাকি অনেক ক্ষমতা। দ্যাখো না ওকে ধরে, যদি হয়ে যায়!"

শেষপর্যন্ত নীলার চাপাচাপিতেই খানিকটা দোনামোনা করে দু'দিন আগে অভ্র কথাটা পেড়েছিল সুবীরের কাছে।

শুনেই সুবীর বলেছিল, "ঠিক আছে, নিয়ে যাব'খন। নীহারদা এ ব্যাপারে কাউকে কথা না দিয়ে থাকলে হয়ে যাবে। সন্ধ্যার পর পার্টি অফিসে নানা উটকো লোক আসে, সেসময় এসব ব্যাপারে কথা বলা যাবে না। তুই বরং পরশু পাঁচটার সময় পার্টি অফিসের কাছের চায়ের দোকানটায় থাকিস। নীহারদা সাড়ে চারটের সময় চলে আসেন। ওই সময় অফিস ফাঁকা থাকে।"

সুবীরের কথামতোই এখানে হাজির হয়েছে অভ্র।

দোকানে খদ্দের নেই। সবে আঁচ হয়েছে উনুনে। শুধু শুধু দোকানে বসা যায় না, তাই চায়ের অর্ডার দিয়েছে অভ্র। দোকানদার মাঝবয়সি, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সসপ্যানে জল গরম করতে করতে একসময় অভ্রর উদ্দেশে বলল, "দাদা কি পার্টি অফিসে এসেছেন?"

রাস্তার দিকে চোখ রেখে অভ্র বলল, "হুঁ।"

দোকানদার বলল, "দেখে তো মনে হচ্ছে, নতুন। তা এসেছেন কেন? জমি-জায়গার ঝামেলা, স্বামী-ইস্ত্রির গন্ডগোল, না থানা-পুলিশের চক্কর?"

লোকটার ঔৎসুক্য দেখে আরও বেশি অস্বস্তি বোধ করতে লাগল অভ্র। সে শুধু বলল, "না, অন্য কাজে এসেছি।"

দোকানদার জলে চা পাতা ঘুঁটতে ঘুঁটতে বলতে লাগল, "দরকারেই তো সব আসে। জন্ম থেকে মেয়ের বিয়ে, সবেতেই তো এখন পার্টি! কত লোক আসে, দোকানে বসে আলোচনা করে..."

BanglaBook.org

অভ্র তার সঙ্গে আলোচনা করছে না বলে মনে হয় আক্ষেপ হল লোকটার।

চা দিল লোকটা। অভ্র চায়ে চুমুক দিতেই একটা বাইকের শব্দ শুনতে পেল, আর তারপরই সুবীর তার লাল রঙের বাইকটা নিয়ে দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। অভ্র তাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আয়, চা খাবি?"

সুবীর বলল, "না, তুই চ'। দাদার একটা মিটিং আছে, এখনই বেরিয়ে যাবেন।"

অভ্র চায়ে শেষ চুমুকটা দিয়ে, পয়সা মিটিয়ে বেরিয়ে দোকানের সামনে রাখা সাইকেলটা নিয়ে এগোল পার্টি অফিসের দিকে। তার পাশে হাঁটতে হাঁটতে সুবীর জানতে চাইল, "দোকানদারটাকে কিছু বলিসনি তো?"

অভ্র বলল, "না, বলিনি। জিজ্ঞেস করছিল, কেন এসেছি? শুধু বললাম, কাজ আছে।"

সুবীর বলল, "বুদ্ধিমানের কাজ করেছিস। ও শালা অসীম রুদ্রর খোঁচড়। অসীম রুদ্র পার্টি অফিসের বদলে এই দোকানে বসে। সারাদিনে কারা দাদার কাছে কী কারণে এল-গেল, সে ব্যাপারে দোকানদারটাই ওকে খবর দেয়," একটু থেমে গলাটা নামিয়ে অভ্রকে জানাল "শোন, দাদার সঙ্গে বেশি কথা বলতে যাবি না। শুধু প্রশ্ন করলে উত্তর দিবি। যা বলার আমিই বলব। নইলে কেস কেঁচে যেতে পারে। দাদা কোনও কারণে একবার না বলে দিলে সেটা আর হ্যাঁ করানো যাবে না।"

অভ্র বলল, "আচ্ছা।"

পার্টি অফিসের সামনে সেই গাড়িটার পাশে সাইকেল আর বাইক রেখে ভিতরে ঢুকল দু'জনে। প্রথমে একটা বড় ঘর। টিভি চলছে। ইতস্তত ছড়ানো চেয়ার-বেঞ্চে বসে টিভি দেখছে কয়েকজন। সুবীরকে দেখে একজন হাসল। ঘরের একপাশে একটা অ্যান্টিচেম্বার। ভারী পরদা ঝুলছে। সুবীর সেঘরের সামনে গিয়ে, পরদা ফাঁক করে, 'আসছি' বলে অভ্রকে নিয়ে ঢুকল। ছোট ঘর, একটা টেব্‌লের ওপাশে তোয়ালে দিয়ে ঢাকা গদিআঁটা চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন নীহারদা। মাঝবয়সি লোক। পরনে গিলে করা পাঞ্জাবি। বেশ মোটাসোটা চেহারা। মাথার সামনের দিকের চুল পাতলা হয়ে চকচকে টাক উঁকি দিচ্ছে। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। বেশ কায়দা করে ডানহাতে খবরের কাগজটা ধরে রেখেছেন তিনি। বাঁ হাতের আঙুলের

BanglaBook.org

ফাঁকে ধরা কিং সাইজ সিগারেট থেকে মৃদু ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। প্যাকেটটা সামনের টেব্‌লে টেলিফোনের পাশে রাখা। দুটো দামি সেলফোনও রাখা আছে। অভ্ররা ঘরে ঢুকতেই কাগজের দিকে চোখ রেখেই নীহারদা সুবীরের উদ্দেশে বলল, "বোস।"

টেব্‌লের এপাশে দুটো চেয়ারে বসল দু'জনে।

নীহারদার মাথার পিছনে, দেওয়ালের গায়ে ফ্রেমে বাঁধানো ছবিতে পরিচিত এক মন্ত্রীর সঙ্গে নীহার চৌধুরী। ছবিটা যেন সুবীরের 'লিডার অফ দ্য লিডার্স'-এর ক্ষমতার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

বসে আছে অভ্ররা। ঘড়ির মৃদু টিকটিক শব্দ ছাড়া অন্য কোনও শব্দ নেই। নীহারদা আর মুখ তোলেননি কাগজ থেকে। যেন তাদের উপস্থিতি ভুলেই গিয়েছেন তিনি। দু'মিনিট কেটে গেল, তিনমিনিট-পাঁচমিনিট... বেশ অস্বস্তি হচ্ছে অভ্রর। সে একবার তাকাল সুবীরের দিকে। সুবীর ইশারায় চুপ করে থাকতে বলল তাকে।

প্রায় মিনিটদশেক পর কাগজটা টেব্‌লে রেখে মুখ তুলে তাকালেন নীহারদা। অভ্রর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে সুবীরকে বললেন, "বল, খবর কী? ভোটার্স লিস্টের কাজ কতদূর?"

সুবীর জবাব দিল, "প্রায় শেষ, দাদা। কাল-পরশুর মধ্যেই জমা দেব। কারা আমাদের ভোটার, কারা এলাকায় নেই, সবই নিখুঁতভাবে মার্ক করছি।"

সুবীরের কথা শুনে তিনি বললেন, "দেখতে দেখতে ইলেকশন চলে আসবে। কাজ যতটা এগিয়ে রাখা যায়, ততই ভাল।"

"আপনাকেই কিন্তু এবার আমরা এমএলএ হিসেবে দেখতে চাই, দাদা। আপনি দাঁড়ালে রেকর্ড মার্জিনে জিতবে পার্টি। সকলেই কিন্তু সে আশাই করছে," একটু মোসাহেবি ঢঙে কথাগুলো বলল সুবীর।

ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটিয়ে নীহারদা বললেন, "তোদের ওই একটাই কথা! আমি পার্টির অনুগত সৈনিক। এই তো বেশ আছি। এমএলএ না হলে কি জনগণের কাজ করা যায় না?"

সুবীর বলল, "সে তো আপনি করেনই। সেটা জানি বলেই তো আমার বন্ধু, এই অভ্রকে আপনার কাছে আনলাম। ওকে বলেছি, একমাত্র দাদাই সাধারণ মানুষের কথা ভাবে।"

"কী ব্যাপার?" প্রশ্ন করে নীহারদা ভুরু কুঁচকে তাকালেন অভ্রর দিকে।

BanglaBook.org

অভ্র হাতজোড় করে নমস্কার করল তাঁকে। প্রত্যুত্তরে নীহারদা মৃদু মাথা নাড়লেন। কিন্তু মুখ খোলার আগেই সুবীর তার হয়ে বলল, "ব্যাপারটা হল, আমাদের বয়েজ় স্কুলে একবছরের ডেপুটেশন ভ্যাকেন্সিতে একজন অঙ্কের টিচার নেবে। অঙ্কের অজিত মিত্র লিয়েন লিভ নিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছেন, তাঁর জায়গায় লোক নেবে। আপনি যদি একটু বলে দেন, তবে ওর চাকরিটা হয়। বৃহস্পতিবার ইন্টারভিউ। ও আমাদের পাড়াতেই থাকে।"

নীহারদা বললেন, "বুঝেছি। তা ও কি আমাদের পার্টির ছেলে?" বলে তাকালেন অভ্রর দিকে।

অভ্র এবার একটু ঘাবড়ে গেল। সে কোনওদিন কোনও মিটিং-মিছিলে যায়নি। কী বলবে সে? কিন্তু এবার সুবীর তাকে বাঁচিয়ে দিল। বলল, "আসলে ও টিউশন নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ওর উপরেই সংসার কিনা। সবসময় মিছিল-মিটিং-এ থাকতে না পারলেও ওদের ফ্যামিলি সেন্টপার্সেন্ট আমাদের। কলকাতায় লাস্ট মিটিং-এও আমাদের সঙ্গে গিয়েছিল। মুকুন্দপুরে আপনার মিটিং-এও ছিল। ক্লাবের রক্তদান শিবিরেও ও প্রতিবার রক্ত দেয়।"

নীহারদা দেখতে লাগলেন অভ্রকে। অভ্র রক্ত দেয় ঠিকই, তবে কাজটা ভাল বলে। তার সঙ্গে পার্টির কোনও ব্যাপার নেই। বাদবাকি যে কথাগুলো সুবীর বলল, তা সব মিথ্যে।

সুবীর থামল না, "ওর আমাদের এলাকায় ভাল ছেলে বলে পরিচিতি আছে। এবার ক্লাবের রক্তদান শিবির আপনি উদ্বোধন করবেন জেনে, ক্লাবেরই কিছু জুনিয়র ছেলেকে উসকে ব্যাপারটা বানচাল করতে চেয়েছিল অসীম রুদ্রর লোকেরা। পাড়ার অনেককেই আড়ালে ডেকে বলেছিল, যাতে তারা রক্ত না দেয়, এই অভ্রকেও বলেছিল। ও সঙ্গে সঙ্গে প্রোটেস্ট করে বলে, যারা রক্তদান শিবিরের মতো কাজ বানচাল করতে চায়, তারা সমাজের শত্রু। অভ্রর ইনিশিয়েটিভেই আরও আট-দশজন রক্ত দিয়েছে!"

একঝুড়ি মিথ্যে বলে দম নিল সে। অভ্র কী বলবে, বুঝতে পারল না।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবার পর নীহারদা বললেন, "আসলে এমন ছোটখাটো ব্যাপারে তো আমি তেমন মাথা ঘামাই না। তারউপর আবার স্কুলের ব্যাপার! কাকে বলি, বল তো? এসব লেখাপড়া জানা লোকদের বোঝা মুশকিল। সকালে একজনের সঙ্গে থাকে, তো বিকেলে অন্যজনের সঙ্গে। হয়তো আমার কথাটা অপোনেন্টের কানে তুলে দিল। পরদিনই

BanglaBook.org

পোস্টার হবে, রিক্রুটমেন্টে আমি হস্তক্ষেপ করছি। আমার হয়েছে জ্বালা!"

সুবীর বলল, "আপনি বরং টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি রসময়বাবুকে বলে দিন। উনি স্কুলের সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলে নেবেন। সেক্রেটারিও তো আমাদের।"

সুবীরের কথা শুনে আর-একটু ভেবে নিয়ে একটা সেলফোন তুলে নিলেন নীহারদা। একটা নম্বর ডায়াল করে ফোনটা কানে নিলেন। ওপাশে কেউ একজন ফোন ধরায় নীহারদা বললেন, "আমি দাদা বলছি। শুনলাম, ডেপুটেশনে বয়েজ স্কুলে একজন টিচার নেওয়া হবে। আমার কাছে অভ্র বলে একটা ছেলে এসেছে। পার্টির সমর্থক। আমাদের যুবদলের প্রেসিডেন্ট সুবীরকে তো তুমি চেনো, ও-ই এনেছে..."

ওপাশ থেকে এর উত্তরে কী বক্তব্য এল, তা শোনা গেল না। এরপর বেশ কিছুক্ষণ 'হ্যাঁ-না' 'হ্যাঁ-না' করলেন নীহারদা। তারপর ফোন নামিয়ে রেখে অভ্রকে বললেন, "কথা বললাম। রসময় বলল, ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলবে। দেখা যাক কী হয়। আমি সুবীরকে জানিয়ে দেব।"

অভ্রকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে সুবীর বলল, "তুই চিন্তা করিস না। দাদার একটা ফোনই যথেষ্ট। এই শহরে দাদার কথা কেউ ফেলতে পারে না," এরপর সে নীহারদার উদ্দেশে বলল, "তা হলে এখন আসছি, দাদা। আপনার তো আজ আবার মিটিং আছে। ভোটার্স লিস্টটা কাল-পরশু দিয়ে যাব।"

নীহারদা বললেন, "হ্যাঁ, দিয়ে যাস। ওটা পার্টির মিটিং-এ প্লেস করতে হবে। আমিও এখন উঠব। এবার আয় তোরা।

পার্টি অফিসের বাইরে বেরিয়ে এল দু'জন। অভ্র সাইকেলের তালা খুলতে খুলতে চাপাস্বরে বলল, "তুই এত বানিয়ে বলতে গেলি কেন?"

সুবীরও চাপাস্বরে বলল, "তুই এসব বুঝবি না। এসব হল ট্যাকটিক্স। তোর কাজটা যাতে হয়, তাই বললাম! তবে কাজটা মনে হয় হয়ে যাবে। না হলে দাদা স্পষ্ট বলে দিতেন। আমার কথায় দাদা গুরুত্ব দেয়," বাইক স্টার্ট করতে করতে সে আরও বলল, "আমাকে এখন এলাকায় ফিরে ভোটার্স লিস্ট নিয়ে বেরোতে হবে। রাতে ঠেকে আসিস, দেখা হবে। তুই এখন যাবি কোথায়?"

অভ্র বলল, "আমিও পাড়ার দিকেই ফিরব ভাবছি।"

BanglaBook.org

সুবীর আর দাঁড়াল না, বাইক স্টার্ট করে এগিয়ে গেল।

সাইকেলে উঠে প্যাডেলে চাপ দিতেই অভ্রর মনে পড়ল, এখনই কুসুমবাগানের মোড়ে নীলার দাঁড়িয়ে থাকার কথা। অভ্র টেনশনে ভুলে গিয়েছিল। ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা বেজে গিয়েছে। রোদ নরম হয়ে এসেছে। ছ'টায় আসবে বলেছে নীলা। তার মধ্যে পৌঁছে যেতে হবে। সাইকেলের প্যাডেলে চাপ দিল অভ্র।

কুসুমবাগানের মোড়ের কাছে পৌঁছে অভ্র দেখল, নীলা দাঁড়িয়ে আছে। পরনে গাঢ় রঙের শাড়ি, কালো ব্লাউজ। নীলা লম্বা, বেশ ফরসাও। শরীরের গঠনও ভাল। রং, নাক-চোখ-মুখ মিলিয়ে যথেষ্ট সুন্দরীই বলা চলে তাকে। কালো বা গাঢ় রঙের পোশাকে তার দেহের উন্মুক্ত অংশের রং আরও উজ্জ্বল মনে হয়। কুসুমবাগান জায়গাটা শহরের বাইরে, রেললাইনের এপাশে বলে বেশ ফাঁকা ফাঁকা। শেষ বিকেলের রোদ এসে পড়েছে নীলার মুখের একপাশে। কানের লতির নীচে আনারদানার মতো চিকচিক করছে একবিন্দু ঘাম। অভ্র সাইকেল নিয়ে এসে দাঁড়াতেই শাড়ির আঁচল কোমরে গুঁজে কেরিয়ারে উঠে বসল নীলা। আবার প্যাডেলে চাপ দিল অভ্র। দোকানপাট, লোকবসতি দ্রুত পেরিয়ে গিয়ে সাইকেলের গতি কমিয়ে, বেশ জোরে নিশ্বাস ছেড়ে সে বলল, "আজ গিয়েছিলাম ওখানে।"

নীলা জানতে চাইল, "কোথায়? নীহার চৌধুরীর ওখানে?"

অভ্র জবাব দিল, "হ্যাঁ।"

নীলা উৎসাহিত হয়ে বলল, "কী কথা হল? আশ্বাস পেলে কিছু?"

অভ্র বলল, "চলো, কোথাও বসে বলি। পরিবাড়ির ওখানে যাবে?"

নীলা বলল, "দু'দিন আগেই তো গেলাম ওখানে। ওই জায়গাটা কেমন নিঝুম! আমার বেশ ভয় ভয় করে," তারপর একটু ভেবে মাথা নাড়ল, "ঠিক আছে, চলো।"

ফের প্যাডেলে চাপ দিল অভ্র। দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বড় বড় গাছের ছায়া ক্রমশ দীর্ঘ হতে শুরু করেছে। আলো মরে আসছে বলে বৈকালিক ভ্রমণে যারা এদিকে আসে, তারা ফিরতে শুরু করেছে। একটা কাঠবিড়ালি সাইকেলের চাকার সামনে দিয়ে রাস্তা পেরিয়ে পাশের একটা গাছে উঠে গেল। কিছুটা এগিয়ে রাস্তা ছেড়ে ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে আর-একটা পথ ধরল অভ্র। কোনও একসময় এটাও রাস্তা ছিল, তবে এখন আর কেউ

BanglaBook.org

ব্যবহার করে না। পরিবাড়িতে গিয়েই রাস্তার শেষ। সে রাস্তা ধরে খানিকটা পথ আরও চলার পর তারা দেখতে পেল পরিটাকে। গোধূলির আলোয় বাড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে থাকা পরিটা যেন নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি পেতে তাদের জন্যই অপেক্ষা করছে।

সাইকেল চালাতে চালাতে সেদিকে তাকিয়ে অভ্র বলল, "পরিটাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে, তাই না?" তারপর একটু থেমে বলল, "তোমাকে অনেকসময় ওই পরিটার চেয়েও বেশি সুন্দর লাগে!"

নীলা বলল, "এখানে এলেই তোমার একথা মনে হয়! যত্তসব নাটক! আজই শেষ, আমি আর আসব না। রোজ বাড়িতে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে বলতে হচ্ছে। নার্সিংহোমে ইভনিং শিফ্‌টে ডিউটি আছে বলে কোনওরকমে এলাম।"

অভ্র কিছু বলল না, শুধু হাসল।

বাড়িটার সামনে সাইকেল থেকে নামল দু'জন। সামনের পুকুরের জল ক্রমশ কালো হতে শুরু করেছে। বাড়ির ছায়াটা দীর্ঘ হতে হতে গ্রাস করে নিচ্ছে পুকুরটাকে। পুকুরের ওপাশে বিরাট বাগানেও অন্ধকার নামছে দ্রুত। সেদিকে একবার তাকিয়ে দু'জনে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করল। চারপাশে নিস্তব্ধ। জায়গাটা তাদের কিছুটা চেনা। একটা ভাঙা দেওয়ালের গায়ে সাইকেলটা হেলান দিয়ে রাখল অভ্র। একটা সিঁড়ি সেই ঘর থেকে দোতলায় উঠে গিয়েছে। পুরনো আমলের কাঠের সিঁড়ির লোহার রেলিংগুলো কারা যেন খুলে নিয়ে গিয়েছে। সিঁড়ির ধাপে জমে থাকা ধুলো ঝেড়ে বসার পর নীলা বলল, "বলো, কী হল?"

অভ্র বলল, "পার্টি অফিসে নীহারবাবুর কাছে সুবীর নিয়ে গিয়েছিল। নীহারবাবু সব শুনে ওদের টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারিকে ফোনে আমার কথা বললেন। সুবীর তো বলল, নীহারদা যখন বলেছেন, তখন কাজটা হয়ে যাবে। দেখি, কী হয়?"

"আর?"

"আর কী? জানো; লোকটাকে পটাবার জন্য সুবীর বানিয়ে বানিয়ে আমার সম্বন্ধে অনেক কথা বলল। বলে, আমি নাকি ওদের পার্টির মিটিংফিটিং-এ যাই! আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। যখন স্কুলে পড়তাম, তখন ক্লাসে মিথ্যে কথা বললে শরদিন্দুস্যার কী বলতেন জানো? বলতেন, 'মিথ্যে দিয়ে কোনও

BanglaBook.org

কিছু ঢাকা যায় না। সত্যিটা একসময় ঠিক বেরিয়ে আসে।'"

নীলা বলল, "কিন্তু মানুষকে বাঁচার জন্য অনেকসময় মিথ্যে বলতেই হয়। সকলে বলে। ধরো, আমি যদি সত্যি বলতাম, তা হলে কি বাড়ি থেকে আমায় আসতে দিত? তোমার শরদিন্দুস্যারের যুগ আর নেই," একটু থেমে সে জুড়ল, "আচ্ছা, তুমি শরদিন্দুস্যারকেও তো বলতে পারো। যদি উনি কোনও সাহায্য করতে পারেন?"

অভ্র বলল, "কী বলব তাঁর কাছে গিয়ে? ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়র তো কিছুই হলাম না, এখন আপনি আমাকে একটা ঠিকে মাস্টারিতে ঢুকিয়ে দিন, এটাই বলব কি?"

নীলা কোনও জবাব দিল না। অভ্রর ভিতরে লুকিয়ে থাকা যন্ত্রণাটা, সে তার কথার ভঙ্গিতে স্পষ্ট অনুভব করতে পারল।

অভ্র সকালে তিনটে টিউশন করেছে, দুপুরে আরও একটা। ক্লান্ত লাগছে শরীরটা। চোখ বন্ধ করে নীলার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল সে। বাইরে অন্ধকারটা গাঢ় হয়ে এসেছে। ঘরের দেওয়ালগুলো অস্পষ্ট হতে হতে একসময় মুছে গেল। নীলার শরীরের ঘ্রাণ অন্ধকারে একটা মিষ্টি আবেশ ছড়াচ্ছে। অভ্র যেন ধীরে ধীরে মিশে যাচ্ছে তার সঙ্গে। বেশ কিছুক্ষণ পর অভ্র যখন চোখ মেলল, তখন চাঁদের আলো ভাঙা জানলা দিয়ে প্রবেশ করে তার প্রেমিকার শরীর স্পর্শ করেছে। অভ্র খেয়াল করতে পারল না, অন্ধকারে সে কখন নীলার বুকের আবরণ সরিয়ে দিয়েছে। নাকি নীলা নিজেই? অভ্রর চোখের সামনে চাঁদের আলোতে শুভ্র শঙ্খের মতো জেগে আছে তার উন্মুক্ত স্তন। অভ্রর মনে হল, সেই পরিটা যেন ধরা দিয়েছে তার কাছে! কয়েকমুহূর্ত মাত্র... হঠাৎ নীলা কেঁপে উঠে তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলাতে সামলাতে বলল, "অ্যাই, তাড়াতাড়ি ওঠো, এখনই!"

অভ্র উঠে বসে বলল, "কেন, কী হল?"

নীলা শঙ্কিত গলায় পিছন ফিরে সিঁড়ির মাথার দিকে তাকিয়ে বলল, "ওখানে যেন একটা ছায়া সরে গেল বলে মনে হল!"

BanglaBook.org

॥ ৩ ॥

সার্ভিসবুকের পাতায় সইগুলো ঠিকমতো করেছেন কি না দেখে নিয়ে সেটা হেডমাস্টারের হাতে ফিরিয়ে দিলেন শরদিন্দু। হেডমাস্টার অমিয়ভূষণ বইটা দেখতে দেখতে বললেন, "সব রেডি করে রাখলাম। সার্ভিস রেকর্ডে তো গন্ডগোল কিছুই নেই, একটু দৌড়ঝাঁপ করলে রিটায়ারমেন্টের মাসতিনেকের মধ্যেই সব পেয়ে যাওয়ার কথা। পেনশনও চালু হয়ে যাবে।"

শরদিন্দু হেসে বললেন, "যবে হওয়ার, হবে! ধরাকরা ব্যাপারটা আসলে আমার ঠিক আসে না। শুনেছি, অনেককে হত্যে দিয়ে ইন্সপেক্টর অফিসে পড়ে থাকতে হয়!"

অমিয়ভূষণও হাসলেন এবার। তারপর বললেন, "আপনার ক্ষেত্রে হয়তো তা হবে না। গেল হপ্তায় ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টরের অফিস, মানে, আমাদের ডিআই অফিসে গিয়েছিলাম। নতুন একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর জয়েন করেছেন। নাম, অভিরূপ রায়। সে আমাদের স্কুলেরই ছাত্র ছিল একসময়। আপনার কথা বারবার জিজ্ঞেস করছিল। বলছিল, 'শরদিন্দুস্যার না থাকলে আমরা অনেকে মানুষই হতাম না।' আপনার রিটায়ারমেন্ট সামনে শুনে ও বলল, 'স্যারকে চিন্তা করতে বারণ করবেন। ফাইলটা তাড়াতাড়ি জমা দেবেন। আমি সব ব্যবস্থা করব।'"

অভিরূপ রায়? ছেলেটাকে ঠিক মনে করতে পারলেন না শরদিন্দু। তিনদশকেরও বেশি সময়ব্যাপী শিক্ষকজীবনে কত ছাত্রই তো পড়িয়েছেন তিনি। অভিরূপ তাদের মধ্যেই কেউ হবে। তবে তার বলা কথাগুলো শুনে বেশ তৃপ্তি বোধ করলেন তিনি। সূর্যের আলোকরশ্মি ঘুলঘুলি বেয়ে এসে পড়েছে টেব্‌লের উপর। সেই আলোকবৃত্তের দিকে তাকিয়ে শরদিন্দু বেশ আত্মশ্লাঘার সঙ্গে বললেন, "আমার কত ছাত্র ছড়িয়ে আছে চারদিকে। কত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার! বড় বড় জায়গায় আছে সব! ভাবলেই গর্বে বুক ফুলে ওঠে। আমার আত্মীয়-পরিজন বলতে তেমন কেউ নেই। লোকে আলোচনার সময় যখন তাদের বড় বড় আত্মীয়স্বজনের কথা বলে, তখন আমি বলি আমার ছাত্রদের কথা। অনেক সময় দেখা যায়, তারা যাদের কথা বেশ গর্বের সঙ্গে শোনাচ্ছে, তারাও আমার ছাত্র ছিল।"

অমিয়ভূষণ বললেন, "আপনি তো কলেজেও সুযোগ পেয়েছিলেন বলে

BanglaBook.org

শুনেছিলাম। গেলেন না কেন? সেখানে থাকলে তো অনেককিছুই পেতেন। টাকাপয়সার কথাটা আপনার ক্ষেত্রে যদি নাও ধরি, স্টেটাসের ব্যাপার তো ছিলই।"

শরদিন্দু জবাব দিলেন, "আসলে ওসব নিয়ে তেমনভাবে আমি ভাবিইনি। পরিচিত একজনের পাল্লায় পড়ে ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিলাম। কিছুদিন পর দেখি, অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এসেছে। ততদিনে এই স্কুলটাকে ভালবেসে ফেলেছি। স্কুলে ঢোকার সময় শিশুরা থাকে কাদার তালের মতো। চেষ্টা করলে তাদের গড়েপিটে যেমন খুশি মূর্তি বানানো যায়। কলেজে কি সেই সুযোগ আছে?" তিনি বলে চললেন, "আমার মনে হয়, স্কুলের সঙ্গে কলেজ-ইউনিভার্সিটির সম্পর্ক অনেকটা ডাকের সাজের প্রতিমা তৈরির মতো। কুমোর মূর্তি গড়ে প্যান্ডেলে পাঠায়। মালাকার-শোলাকারের হাতযশে প্যান্ডেলে সেই প্রতিমায় উপর পড়ে ডাকের সাজের প্রলেপ। তাতে প্রতিমা বাইরের লোকের কাছে আকর্ষক হয় ঠিকই, কিন্তু বেসিক কাজটা সেই কাদামাটি ঘিরেই। স্কুল হল কুমোরবাড়ি আর কলেজ হল পুজোপ্যান্ডেল। কুমোরবাড়িতে আলোর রোশনাই না থাকলেও, কাদামাটি ঘেঁটে মূর্তি গড়ার আনন্দ আছে। তাই কুমোরই রয়ে গেলাম, মালাকার আর হলাম না," কথাটা শেষ করে মৃদু হাসলেন তিনি।

অমিয়ভূষণ তাঁর কথা শুনে প্রথমে বললেন, "বাহ্, অঙ্কের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু বাংলাটাও অনায়াসে পড়াতে পারতেন আপনি," তারপর বললেন, "তবে বুঝতে পারছি না, ভাল কুমোরের সংখ্যা আজকাল কমে আসছে কি না? শুনতেই তো পান, আজকাল আমাদের নিয়ে লোকে কত কথা বলে। যা দেখছি, তাতে শেষপর্যন্ত আমাদের স্কুলটাও..." কথাটা শেষ করলেন না তিনি।

তাঁর অব্যক্ত কথাটা ধরতে অসুবিধে হল না শরদিন্দুর।

তিনি একটু চুপ করে থেকে জবাব দিলেন, "আসলে আমরা একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে হাঁটছি। তাকে আমরা অস্বীকার করব কীভাবে? আমরা তো সমাজের বাইরে নই।"

কথাটা শেষ করার পরই শরদিন্দুর চোখ গেল ঘড়ির দিকে। সওয়া চারটে বেজে গিয়েছে। লাস্ট পিরিয়ড চলছে। শরদিন্দুর খেয়াল হল, ক্লাসে যাওয়ার জন্যই হেডমাস্টারের ঘরের শেল্‌ফ থেকে বোর্ডে আঁকার জন্য কাঠের বড়

BanglaBook.org

কম্পাস নিতে এসেছিলেন তিনি। অমিয়ভূষণ তাঁকে সার্ভিসবুকে সই করার জন্য বসিয়ে দিয়েছিলেন। কোনওদিন ক্লাস ফাঁকি দেন না শরদিন্দু। অন্য কেউ হলে হয়তো আর দশ পনেরো মিনিট গল্প করে ক্লাসটাই কাটিয়ে দিত।

শরদিন্দু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন, "আমি এখন যাচ্ছি। আরও দশমিনিট আছে। দেখি, ফাইভ বি-র ক্লাসটা যদি একটু ছোঁয়া যায়।"

হেডমাস্টার বললেন, "ঠিক আছে। কাল সেক্রেটারির আসার কথা। সার্ভিসবুকে সইগুলো করিয়ে নেব। তেমন হলে আপনাকে ডাকব।"

কম্পাস নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন শরদিন্দু। একটা বড় মাঠকে ঘিরে গড়ে উঠেছে দোতলা স্কুল বিল্ডিং। মাঠের ধারে বিল্ডিংগুলোর গা ঘেঁষে সার সার আকাশমণি, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়াগাছ। দু'-একটা ঘোড়ানিমও আছে। বেশ বড় হয়েছে গাছগুলো। দোতলার ছাদ ছুঁয়েছে। ক্লাসরুমের লাগোয়া বলে গরমের দিনে ঘরগুলোয় বেশ আরাম দেয় এদের ছায়া। এদের বেশিরভাগই শরদিন্দু আর প্রাক্তন ড্রিল টিচার উমাপতিবাবুর হাতে পোঁতা। শেষবেলার আলো এসে পড়েছে গাছগুলোর মাথায়। উজ্জ্বল লাল-হলুদ মাথা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কৃষ্ণচূড়া-রাধাচূড়া যেন হাসছে শরদিন্দুর দিকে তাকিয়ে। তাদের দেখে তিনিও মনে মনে হাসলেন। পরিতৃপ্তির হাসি। আর ক'দিন পর তিনি স্কুল ছেড়ে যাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু চারদিকে ছড়িয়ে থাকা নিজের অসংখ্য ছাত্রের মতো এই গাছগুলোকেও মাথা উঁচু করে দাঁড় করিয়ে গেলেন!

ফাইভ বি-র ক্লাসটা দোতলার একদম শেষমাথায়, কোনার ঘরে। কোনাকুনিভাবে মাঠটা পেরিয়ে শরদিন্দু এগোলেন সেদিকে। ক্লাস চলাকালীন এই মাঠ দিয়ে হাঁটার সময় ক্লাসগুলোর ভিতরের অবস্থাও অনুমান করতে পারেন শরদিন্দু। প্রথমদিকের পিরিয়ডে মাঠের মাঝখানে দাঁড়ালে, তার চারপাশের ঘরগুলো থেকে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে পাঠের আদানপ্রদানের এক অদ্ভুত ঐকতান শোনা যায়। অনেকটা ভ্রমরের গুঞ্জনের মতো। টিফিনের পর থেকে তা ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে। শেষ পিরিয়ডে, ছুটির ঘণ্টা বাজার আগে আগে সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হয়ে যায় স্কুল। ছাত্র-শিক্ষক উভয়েরই আর সেই উৎসাহ থাকে না। অবশ্য শেষ ঘণ্টা বাজলেই তুমুল হর্ষধ্বনিতে আলোড়িত হয় মাঠের বাতাস।

মাঠ পেরিয়ে দোতলার সিঁড়িতে পৌঁছে গেলেন শরদিন্দু। তাঁর শিডিউল্ড

BanglaBook.org

ক্লাস বলতে যা বোঝায়, তা সবই ক্লাস নাইন থেকে টুয়েলভের। ক্লাস ফাইভ-সিক্সের অঙ্ক নেয় অজয় আর পরিতোষ। তাদের থেকে একটা করে নিচু ক্লাস যেচেই নিয়েছেন শরদিন্দু। জ্যামিতিটা তিনিই দেখাচ্ছেন। আসলে ওই ছোট ছোট মুখগুলোকে দেখতে বড় ভাল লাগে তাঁর, পড়াতেও।

একটা মৃদু গুঞ্জন হচ্ছিল ক্লাসের মধ্যে। শরদিন্দু ক্লাসে ঢুকতেই সেটা থেমে গেল। জনাতিরিশ ছাত্রের ক্লাস। শরদিন্দুকে দেখে সকলে উঠে দাঁড়িয়ে আবার সোজা হয়ে বসল। টেব্‌লের কাছে এসে কম্পাস রেখে ছাত্রদের দিকে তাকালেন তিনি। একটু এলোমেলো চেহারা তাদের। প্রথম পিরিয়ডের সেই উজ্জ্বল ভাবটা এখন আর নেই। টিফিনের হুটোপুটির ছাপ পড়েছে তাদের চুলে, পোশাকে। একটা চাপা আনন্দ খেলা করছে অনেকেরই চোখের কোণে। ঘণ্টা পড়ার সময় হয়ে এসেছে।

একঝলক ভাল করে ছাত্রদের দেখে নিয়ে শরদিন্দু তাদের উদ্দেশে বললেন, "আজ তোমাদের কী করাব বলেছিলাম, মনে আছে?"

কচি গলার হুল্লোড় উঠল একটা, "হ্যাঁ স্যার, মনে আছে। বৃত্ত আঁকা শেখাবেন বলেছিলেন।"

"তোমরা বৃত্ত আঁকতে জানো?"

হইহই করে আবার সকলে বলে উঠল, "জানি স্যার, জানি স্যার!" কেউ কেউ আবার এঁকে প্রমাণ দেওয়ার জন্য ব্যাগ থেকে জ্যামিতি বাক্স, খাতা বের করতে লাগল।

উত্তরটা প্রত্যাশিত ছিল শরদিন্দুর কাছে। প্রথম জ্যামিতি বাক্স কেনার পর ভিতরের জিনিসগুলোকে খেলনা বলেই মনে হয় বাচ্চাদের। ছেলেবেলায় শরদিন্দুরও তাই মনে হয়েছিল। কম্পাসটাই সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে ছোটদের। কেউ শেখাবার আগেই, ছোটরা কম্পাসে পেন্সিল আটকে খেলার ছলেই বৃত্ত আঁকা শেখে। তবু শরদিন্দু ছেলেদের সরলরেখা, বৃত্ত আঁকা নিজে একবার দেখিয়ে দেন, যাতে অঙ্কশিক্ষার গোড়াতে কোনও ফাঁক না থেকে যায়।

শরদিন্দু বললেন, "তা হলে তোমরা সকলেই জানো?"

"হ্যাঁ-আ-আ..." ফের সমবেত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

ঠিক এই সময় তিনি দেখলেন একজনকে। অন্যদের চেয়ে কিছুটা দূরে লাস্ট বেঞ্চে ঘাড় গুঁজে বসে আছে ছেলেটা। শরদিন্দুর কথার কোনও জবাব

BanglaBook.org

দেয়নি সে। যেন তাঁর কথা শেষ বেঞ্চ পর্যন্ত পৌঁছোয়নি।

শরদিন্দু এগিয়ে গেলেন তার দিকে। তিনি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই, তাঁর উপস্থিতি টের পেয়ে ছেলেটা উঠে দাঁড়াল।

শরদিন্দুর দিকে একবার তাকিয়েই আবার চোখ নামিয়ে নিল। ছোটখাটো, শীর্ণ চেহারা ছেলেটার। তার বেঞ্চের উপর রাখা আছে একটা খাতা। ঘরে উল দিয়ে সেলাই করা দিস্তা কাগজের খাতা। এরকম খাতাতেই একসময় পড়াশোনা করতেন শরদিন্দুরা। এখনকার ছাত্ররা এরকম খাতা আর ব্যবহার করে না। খাতাটার দিকে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্য নিজের শৈশবের কথা মনে পড়ে গেল শরদিন্দুর। এরকম খাতাতেই তাঁকে অঙ্ক শেখাতেন তাঁর মা।

শরদিন্দু এই ক্লাসে আগে তিনদিন এসেছেন, কিন্তু ছেলেটাকে এর আগে ঠিক খেয়াল করেছেন বলে তাঁর মনে হল না। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কী? আগের দিন আমার ক্লাসে ছিলে তুমি?"

"আমার নাম কিংশুক... আগের দিন ক্লাসে ছিলাম স্যার," সামনে খোলা সাদা খাতার দিকে চোখ রেখে নিচুস্বরে জবাব দিল ছেলেটা।

শরদিন্দুর পিছনে, ক্লাসের সামনের দিকের কোনও একটা বেঞ্চ থেকে কে যেন বলল, "সেদিন এসেছিল, কিন্তু প্রায়ই ও স্কুল কামাই করে, স্যার। কালকেও আসেনি।"

তার কথার সমর্থনে আরও কয়েকটা গলা শোনা গেল।

শরদিন্দু জানতে চাইলেন, "তুমি প্রায়ই স্কুল কামাই করো?"

ছেলেটা জবাব দিল না।

শরদিন্দু ছেলেটার পিঠে হাত রাখতেই অনুভব করলেন, তিরতির করে কাঁপছে তার ছোট্ট দেহটা। তার স্কুল কামাই করার ব্যাপারটা স্যারের কানে যাওয়ায় মনে হয় ভয় পেয়ে গিয়েছে সে। জানালা গলে বিকেলের একফালি রোদ এসে পড়েছে ছেলেটার মুখে, তার খোলা খাতার উপর। সেই আলোতে কেমন যেন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে তার মুখ। ঠোঁট দুটোও মৃদু মৃদু কাঁপছে। ছেলেটাকে দেখে মায়া হল শরদিন্দুর। হয়তো ভাবছে, স্যার তাকে এখনই বকাঝকা শুরু করবেন! তার স্কুল করা নিয়ে আর না খুঁচিয়ে শরদিন্দু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি বৃত্ত আঁকতে জানো?"

"না," ঘাড় নাড়ল ছেলেটা।"

এবার একটা হাসির রোল উঠল ক্লাসের বাকি ছাত্রদের মধ্যে। শরদিন্দু

BanglaBook.org

মৃদু ধমকে তাদের থামিয়ে ছেলেটার উদ্দেশে বললেন, "কম্পাস বের করো, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।"

ছেলেটা একইভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তাঁর কথায় সাড়া না দেওয়ায় শরদিন্দু এবার সামান্য ধমকের সুরে বললেন, "কী হল, দাঁড়িয়ে আছ কেন? কম্পাস বের করতে বললাম না?"

কিংশুক নামে বাচ্চা ছেলেটা স্পষ্টতই কেঁপে উঠল এবার। বলল, "আমার কম্পাস নেই। মা বলেছেন, সামনের সপ্তাহে কিনে দেবেন।"

শরদিন্দুদের স্কুলটা সরকারি হলেও নামী। এখানে যারা পড়তে আসে, তারা প্রায় সকলেই সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। কম্পাস কেনার ক্ষমতা অভিভাবকদের থাকে। তা-ই দেখে আসছেন শরদিন্দু। নিজের অভিভাবকের ব্যস্ততার কারণেই সম্ভবত জ্যামিতি বক্স কেনা হয়নি কিংশুকের।

শরদিন্দু জ্যামিতি বক্স কেনার প্রসঙ্গ নিয়ে আর কথা বাড়ালেন না। শুধু বললেন, "মাকে বোলো, তাড়াতাড়ি কিনে দিতে। আমি তোমাকে এখন দেখিয়ে দিচ্ছি।" একটা ছেলের কাছ থেকে কম্পাস চেয়ে নিয়ে কিংশুকের খাতাটা টেনে নিলেন তিনি। কাঁটাটা খাতার ঠিক মাঝখানে বসিয়ে বৃত্ত আঁকতে শুরু করলেন। কম্পাস ধরে খাতার উপর হাতটা ঘোরালেন, কিন্তু কিছুটা ঘুরে হঠাৎ থেমে গেল শরদিন্দুর হাত, কবজি আর ঘুরছে না! খাতার উপর একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করে হাতটা থেমে গিয়েছে তাঁর। কী হল ব্যাপারটা?

শরদিন্দু আর-একটা পৃষ্ঠায় কম্পাস বসিয়ে আঁকার চেষ্টা করলেন। এবারও সেই একই ব্যাপার ঘটল। খাতার পাতায় আরও একটা অর্ধবৃত্ত এঁকে থেমে গেল তাঁর হাত। কবজি এবারও ঘুরল না!

আরও দু'বার শরদিন্দু চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোনওবারই সম্পূর্ণ হল না তাঁর বৃত্ত। হঠাৎ তাঁর চোখ গেল ছেলেটার মুখের দিকে। ভয়ের ভাবটা কেটে গিয়ে একটা চাপা কৌতুক ফুটে উঠছে তার চোখে। শরদিন্দু বুঝতে পারলেন না, কেন এমন ঘটছে। তবে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বেশ বিব্রত বোধ করলেন। ঠিক এই সময় নীচ থেকে ভেসে এল ছুটির ঘণ্টার শব্দ। একটা গুঞ্জন উঠল ক্লাসরুমে।

যার কাছ থেকে কম্পাসটা নিয়েছিলেন, শরদিন্দু তাকে সেটা ফেরত দিয়ে ইশারায় সকলকে ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বললেন। সকলেই বেরিয়ে গেল। রয়ে গেলেন শরদিন্দু আর তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কিংশুক নামে

BanglaBook.org

ছেলেটা। বাকি ক্লাসগুলোও ভেঙে গিয়েছে। ছাত্রদের চেঁচামেচি ভেসে আসছে অন্য ক্লাসগুলো থেকেও। তার চোখে কৌতুকের চিহ্ন এবার স্পষ্ট ধরা দিচ্ছে। শরদিন্দু শেষপর্যন্ত তাকে বললেন, "আমার এই হাতটায় মনে হয় কোনও গন্ডগোল হয়েছে। হাতটা ঘুরছে না। পরশু ক্লাসে দেখিয়ে দেব। সেদিন জ্যামিতি বক্স নিয়ে এসো কিন্তু।"

ছেলেটা ঘাড় নেড়ে, খাতাটা কাপড়ের ব্যাগে ঢুকিয়ে ক্লাসরুম ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

শরদিন্দুও টেব্‌ল থেকে কাঠের কম্পাসটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না তাঁর। অজান্তেই হাতে চোটফোট লাগিয়েছেন নাকি? সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় ডানহাতটা উপরে তুলে কয়েকবার কবজিটা মোচড় দিলেন শরদিন্দু। কব্‌জিটা ঠিকঠাক ঘুরছে বলেই মনে হল তাঁর। কোনও ব্যথাও অনুভব করছেন না। তা হলে? হঠাৎ পিছন থেকে শুনতে পেলেন, "শরদিন্দুবাবু, হাত ঘোরাচ্ছেন কেন? মুষ্টিযোগ প্র্যাক্টিস করছেন নাকি?"

সিঁড়ি বেয়ে শরদিন্দুর পিছনেই নামছিলেন ইতিহাসের ভানুবাবু। শরদিন্দু খেয়াল করেননি তাঁকে। ভানুবাবুর কথার উত্তরে পিছনে তাকিয়ে 'হ্যাঁ-না' গোছের উত্তর দিলেন তিনি।

মাঠে নেমে এলেন শরদিন্দু। সব ক্লাসই ছুটি হয়ে গিয়েছে। ছেলেরা মাঠ পেরিয়ে ছুটছে গেটের দিকে। পায়ে পায়ে ধুলোর সঙ্গে লজেন্সের মোড়ক, কাগজের কুচি উড়ছে মাঠে। শরদিন্দু একবার খোঁজার চেষ্টা করলেন সেই ছেলেটাকে। পেলেন না। ছাত্রদের ভিড়ে মিশে গিয়েছে কিংশুক নামে ছেলেটা।

BanglaBook.org

॥ ৪ ॥

স্নান সেরে ঘরে ঢুকে তিথি দেখল, বাবলু স্কুল যাওয়ার জন্য তৈরি না হয়ে অনির্বাণের পাশে বসে আছে। মেঝেতে রাখা খাতার উপর ঝুঁকে পড়ে অনির্বাণ তাতে হিজিবিজি লিখে চলেছে। বাবলুর দৃষ্টি খাতাটার উপর নিবদ্ধ। হঠাৎ কেউ ঘরে ঢুকলে ভাববে, অনি ছেলেকে পড়াচ্ছে। কিন্তু খাতাটায়

সে কী লিখছে, তিথি জানে। অর্থহীন কতগুলো সংখ্যা, কখনও কোনও ডায়াগ্রাম। বাবলু অবাক চোখে সেগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। একদিন সে তিথিকে জিজ্ঞেস করেছিল, "আচ্ছা, বাবা অঙ্কটা মেলাতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, তাই না? বাবা আবার কথা বলবে সবার সঙ্গে, অফিস যাবে।"

তিথি জবাব দিয়েছিল, "হ্যাঁ, তাই।"

"তুমি তো আমার অঙ্ক করে দাও, তুমি বাবার অঙ্কটা মেলাতে পারবে না? তা হলেই তো বাবা আবার অফিস যেতে পারে," বাবলু বলেছিল।

তিথি ছেলের কথার পিঠে বলেছিল, "খুব কঠিন অঙ্ক তো! হয়তো মিলবে একদিন, কিন্তু সময় লাগবে।"

তিথির কথা শোনার পর থেকে, অনি খাতা নিয়ে বসলেই তার পাশে গিয়ে বসে বাবলু। অনি লিখতে লিখতে বিড়বিড় করে বলে, 'মিলবে না, মিলবে না।' বাবলুর আশা, চেনা সংলাপের পরিবর্তে হয়তো সে কোনওদিন বলে উঠবে, 'আরে, এই তো মিলে গেল!'

তিথি এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল তাদের সামনে। আজ সকালে অনির দাড়ি কামিয়ে দিয়েছে সে। জানালা দিয়ে আসা সূর্যের আলোয় অনির ফরসা গালে একটা সবুজ আভা খেলছে। হয়তো সেটা অনেকদিন পর দাড়ি কামিয়ে দেওয়ার জন্যই।

গতকাল বাবলু স্কুল যাওয়ার পর জানালার সামনে তিথি দাঁড়িয়েছিল। দুটো ছেলে যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে। বাবলুরই বয়সি হবে তারা। তাদের একজন বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় অপরজনকে বলছিল, "জানিস তো, এই বাড়িতে একটা পাগল থাকে!"

দ্বিতীয় ছেলেটি উত্তর দিয়েছিল, "তাই নাকি? আচ্ছা, পাগল দেখতে কেমন হয় রে? আমি কোনওদিন পাগল দেখিনি।"

"বলিস কী, তুই পাগল দেখিসনি! পাগলের দাড়ি থাকে, চিৎকার করে, কাগজ খায়," কথাগুলো বলেই ছেলেটা তার সঙ্গীকে পাগলের দর্শন করাতে তিথিদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। অনি তখন ঘরে ছিল। ছেলেদুটো তাকে দেখতে পায়নি। কিন্তু জানালার সামনে দাঁড়ানো তিথির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গিয়েছিল তাদের। তার আর দাঁড়িয়ে থাকেনি। তিথি তখনই ঠিক করেছিল, অনির দাড়িটা কামিয়ে দেবে। সুস্থ থাকাকালীন অনি হালকা দাড়ি রাখত। তাই আগে মাঝে মাঝে ছেঁটে দিলেও, অনির দাড়িটা

BanglaBook.org

একদম কামিয়ে দেয়নি তিথি। আজ দিয়েছে। কাজটা করার সময় অনি কোনও বাধা দেয়নি। শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল তার দিকে।

এখন তিথি এসে দাঁড়াতেই বাবলু তাকাল তার দিকে। ছেলেকে সে বলল, "কী রে, তুই আজ স্কুলে যাবি না? এখনও তো তৈরি হলি না!"

বাবলু ইতস্তত করে বলল, "আজ স্কুলে যাব না। বাবার কাছে থাকব।"

অনির অসুস্থতা মধ্যে বেড়েছিল। তার জন্য বেশ ক'দিন স্কুল যেতে পারেনি বাবলু। গত পরশু তারই জিম্মায় অনিকে রেখে কলেজ স্ট্রিটে পাবলিশারের কাছে গিয়েছিল তিথি। সেদিনও স্কুল কামাই হয়েছে। কিন্তু আজ তিথির অবচেতন মন চাইছিল, বাবলু যেন আজ স্কুলে না যায়! বলা যায় না, সে-ই হয়তো তিথিকে দেখে, মাস্টারমশাইদের সামনেই তার কাছে চলে আসতে পারে। বাবলুকে কেউ করুণা করুক, তিথি তা চায় না। 257667

ছেলের জবাব শুনে তিথি তাই বলল, "ঠিক আছে, আজই শেষ কিন্তু! কাল থেকে আর স্কুল কামাই করা চলবে না। অনেক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে তোমার।"

বাবলু বলল, "মা, আমার জ্যামিতি বক্স কবে আনবে? স্যার বলছিলেন, তাড়াতাড়ি কিনে নিতে।"

কথাটা শুনে একটু চুপ করে থাকল তিথি। এই মাসে খুব টানাটানি যাচ্ছে তার। প্রতিটা পয়সা গুনে গুনে খরচ করতে হচ্ছে। পোস্ট অফিসের সুদ তো মাত্র আড়াই হাজার টাকা। তার মধ্যে একহাজার টাকা গিয়েছে এই বাড়ির অগ্রিম ভাড়ায়। দিনকুড়ি হল এই বাড়িতে উঠে এসেছে তারা। এর মধ্যেই অনিকে আবার নতুন ডাক্তার দেখাবার কথা আছে। ডাক্তারের ফিজ় আছে, ওষুধের খরচ আছে, সংসারের খরচ আছে! পাবলিশার ভদ্রলোক বলেছেন, বইটার কাজটা ঠিকঠাক করলে একহাজার টাকা মতো পাওয়া যাবে। তিথি বলল, "এর মধ্যেই কিনে আনব। আচ্ছা, তোদের স্কুলের অঙ্কস্যারের নাম কী রে?"

বাবলু বলল, "আমাদের ক্লাসে তিনজন স্যার অঙ্ক দেন। পরিতোষস্যার, অজয়স্যার আর শরদিন্দুস্যার। তবে শরদিন্দুস্যার সবচেয়ে ভাল। কাউকে মারেন না।"

অনি যখন সুস্থ ছিল, তখন তার মুখে শরদিন্দুবাবুর নাম অনেক শুনেছে তিথি। বাবলুর মুখে শোনা বাকি নামগুলো মনে মনে আউড়ে নিল সে। নামগুলো কাজে আসবে।

BanglaBook.org

বাবলু হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা মা, তোমার ব্যাগে কয়েকটা বই দেখলাম... কার জন্য এনেছ?"

তিথি বলল, "তুই আমার ব্যাগ খুলেছিলি কেন? তোকে বলেছি না, আমার ব্যাগে হাত দিবি না। দরকারি জিনিস থাকে ব্যাগে।"

বাবলু জবাব দিল, "তুমি আমার যে পেনটা নিয়েছিলে, সেটা খুঁজছিলাম। বইগুলো দেখে আবার রেখে দিয়েছি। সব ক'টাই তো অঙ্কের বই। একটা বইয়ে বেশ কয়েকটা বৃত্ত আঁকা আছে! জানো মা, কাল শরদিন্দুস্যার আমার খাতায় বৃত্ত আঁকতে পারলেন না। অনেকবার চেষ্টা করেও পারলেন না। বইটা আগে দেখলে আমি নিজেই এঁকে দিতাম। ওই তো একটা গোল্লা!" মৃদু হাসি ফুটে উঠল বাবলুর ঠোঁটের কোণে।

তিথি ঠিক বুঝতে পারল না ছেলের কথাটা। সে জিজ্ঞেস করল, "তার মানে?"

বাবলু তার কথার জবাবে কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ অনি খাতা থেকে মুখ তুলে তিথির দিকে তাকাল। তারপর মাথা নেড়ে বলতে শুরু করল, "মিলছে না, মিলছে না... কিছুতেই মিলছে না।"

তিথি ভয় পেয়ে গেল। সে জানে, এরপর কী ঘটবে। অনি প্রবলভাবে মাথা নাড়তে থাকবে, তার গলার স্বর ক্রমশ চড়বে। ব্যাপারটা ততক্ষণ চলবে, যতক্ষণ না সে অবসন্ন হয়ে পড়ে।

অনিকে সামলানোর জন্য তিথি সঙ্গে সঙ্গে উবু হয়ে তার পাশে বসে, তার হাত থেকে পেনটা নিয়ে কাগজে কয়েকটা সংখ্যা লিখতে লিখতে বলল, "দ্যাখো, এই তো মিলেছে অঙ্কটা! মিলে গিয়েছে! কী রে বাবলু, মিলে গিয়েছে, তাই না?"

এই অবস্থায় কী করতে হবে, তা বাবলু জানে। সে মায়ের কথায় সায় দিয়ে বলল, "হ্যাঁ, মিলে গিয়েছে! ও বাবা, অঙ্কটা মিলে গিয়েছে যে..."

অনি, বাবলুর দিকে তাকিয়ে অস্পষ্ট স্বরে বলল, "অঙ্কটা মিলে গিয়েছে?"

"হ্যাঁ, মিলে গিয়েছে," বাবাকে শান্ত করার জন্য বলল বাবলু।

ঘাড় নাড়া বন্ধ করে খাতার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল অনি। সে কিছুটা শান্ত হয়েছে বুঝতে পেরে, তার হাতে পেনটা আবার ধরিয়ে দিল তিথি। অনি খাতার মধ্যে ফের হিজিবিজি সংখ্যা লিখতে শুরু করল। তিথি

BanglaBook.org

উঠে দাঁড়িয়ে একবার ভাবল, আজ আর সে বেরোবে না। অনি যদি আবার অশান্ত হয়ে ওঠে, বাবলু সামাল দেবে কী করে? একটাই বাঁচোয়া যে, খেপে উঠলে অনি ভাঙচুর বা মারধর-গালিগালাজ করে না। এক জায়গায় বসে প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকায় আর চিৎকার করে বলে, "মিলছে না, মিলছে না, কিছুতেই মিলছে না..."

বাইরে না বেরোনোর ভাবনাটা আর-একবার মাথায় পাক খাওয়ার পরই তিথির মনে হল, না, আজ বেরোতেই হবে! বাবলু বাড়িতে আছে আজ। পাবলিশার ভদ্রলোক সেদিন বলছিলেন, "সেল্‌সম্যানের বিজ্ঞাপন তো আমরা কবেই দিয়েছিলাম। আপনি যোগাযোগ করতে দেরি করে ফেলেছেন। সব স্কুলেই বুকলিস্ট বেরিয়ে গিয়েছে। তবে যখন এসেইছেন, অঙ্কের ক'টা বই দিচ্ছি। বইগুলো রিপ্রিন্ট করতে দেরি হল বলে ঠিক সময় বাজারে ছাড়তে পারিনি। তবে ভাল লেখকের বই। তিরিশবছর পর আবার প্রিন্ট হল। গোল্ড মেডেলিস্ট ছিলেন ভদ্রলোক। দেখুন, যদি কোনও স্কুলে গছাতে পারেন রেফারেন্স বই হিসেবে! বড় স্কুলগুলোয় অনেকসময় রেফারেন্স বইও টেক্সট বইয়ের মতো কম্পালসরি হয়। একশো স্টুডেন্টপিছু হাজার টাকা মতো দিতে পারব।"

টাকাটা এখন খুব প্রয়োজন তিথির। বলা যায় না, আজ না গেলে হয়তো বইটা কোনও স্কুলে চালানোর সম্ভবনা আরও কমে যাবে। তিথি ভেবে রেখেছে, আজ তিনটে স্কুলে যাবে। কাছাকাছি সব স্কুল। বাবলুর স্কুল দিয়েই শুরু করবে। তাই ছেলের কাছ থেকে অঙ্কের স্যারদের নাম জেনে নিচ্ছিল সে।

তিথি, বাবলুকে বলল, "আমি এখন একটু বাইরে যাব। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরব। বাবা যদি বাড়াবাড়ি শুরু করে, তা হলে টেব্‌লে রাখা হলুদ ক্যাপসুলটা খাওয়াস আর ঘুমিয়ে পড়লে মাথায় একটা বালিশ দিয়ে দিস।"

বাবলু প্রশ্ন করল, "তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ মা?"

তিথি প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, "দু'জনে সাবধানে থাকিস। অচেনা পাড়া... কেউ এলে দরজা খুলবি না। বলবি, মা নেই, পরে আসবেন।"

দুটো বয়েজ, একটা গার্লস স্কুল প্রায় পাশাপাশি। বাবলুকে স্কুলে ভরতি করার জন্য বারতিনেক সেখানে গিয়েছে তিথি। অন্য দুটোর ভিতরে না ঢুকলেও, স্টেশন থেকে আসা-যাওয়ার পথে বাইরে থেকে স্কুলগুলোকে

BanglaBook.org

প্রায়ই দেখে সে। নতুন বাড়ি থেকে বাবলুর স্কুল হেঁটে মিনিটকুড়ির রাস্তা। আগের বাড়িটা থেকে সময় লাগত দশমিনিট, সুবিধে হত বাবলুর। সেও হেঁটেই যাতায়াত করে। দশটাকা রিকশাভাড়া, কিন্তু দশটা টাকাই এখন মূল্যবান তিথির কাছে। অগত্যা স্কুলের দিকে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল সে।

স্কুলের গেটের কাছে পৌঁছোতেই প্রেয়ারের শব্দ ভেসে এল তিথির কানে। এগারোটা বাজে, এখনই স্কুল বসবে। গেটের সামনে অভিভাবক আর রিকশার জটলা। তিথি একবার চারপাশে তাকাল। বাবলুর অ্যাডমিশন টেস্ট আর ভরতির দিন ওদের ক্লাসের বেশ কয়েকজন ছাত্রের বাবা-মায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তার। আজ তিথির স্কুলে আসার কারণ জানতে পারলে হয়তো বাবলুরই ক্ষতি হবে। ক্যানভাসারের ছেলে বলে তার সঙ্গে হয়তো নিজেদের সন্তানদের মিশতে বারণ করবেন অভিভাবকরা। এমনিতেই বাবলু কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে আজকাল। স্কুল থেকে ফিরে আর বাইরে বেরোয় না। অনির পাশে বসে তার খাতার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারউপর স্কুলে যদি কোনও সমস্যা হয়...

"কী ব্যাপারে এসেছেন?" দারোয়ানের প্রশ্নে ঘোর ভাঙল তিথির।

তিথি চাপাস্বরে বলল, "পাবলিশারের কাছ থেকে আসছি। একটু স্যারদের সঙ্গে দেখা করব।"

লোকটা অসন্তোষের ভঙ্গিতে বলল, "আমি এখন গেট সামলাব, না স্যারদের ডাকব! কোন কোন স্যারের সঙ্গে দেখা করবেন?"

তিথি একটু ঘাবড়ে গেল। লোকটা যদি এখনই তাকে 'না' বলে দেয়? বাবলুর মুখে শোনা প্রথম দুটো নাম মনে এল না তার। সে চট করে বলল, "অঙ্কের স্যার। শরদিন্দুস্যারের সঙ্গে দেখা করব আমি।"

লোকটা এবার যেন একটু দয়াপরাবশ হয়েই বলল, "দাঁড়ান, প্রেয়ারটা আগে শেষ হোক, নিয়ে যাচ্ছি।"

মিনিটখানেক পর প্রেয়ার শেষ হলে, লোকটা তিথিকে ডাকল, "আসুন।"

ক্লাসে বেরোচ্ছিলেন শরদিন্দু। স্টাফরুমের করিডরে দেখলেন, হরি এক ভদ্রমহিলাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

"স্যার, ইনি পাবলিশারের কাছ থেকে এসেছেন। আপনার সঙ্গে কথা বলবেন," শরদিন্দুর উদ্দেশে কথাটা বলেই হরি নামে সেই দারোয়ান চলে

BanglaBook.org

গেল। ঘড়ি দেখলেন শরদিন্দু। দু'মিনিট সময় আছে তাঁর হাতে। দেরি করে ফার্স্ট ক্লাসে ঢুকতে চান না তিনি। ভদ্রমহিলার দিকে তাকালেন তিনি। অনুমান করলেন, তার বয়স তিরিশের আশপাশে হবে। ছোটখাটো, শ্যামলা গড়ন ভদ্রমহিলার, তবে সুন্দর মুখশ্রী। চট করে দেখে ক্যানভাসার বলে মনে হয় না। বরং নিপাট গৃহবধূ বলেই মনে হয়।

তিথি শরদিন্দুকে নমস্কার করে বলল, "স্যার, আমি কয়েকটা অঙ্কবই এনেছি। ভাল লেখকের পুরনো বই। ছাত্রদের কথা ভেবে অনেকবছর পর যত্ন নিয়ে রিপ্রিন্ট করা হয়েছে। আপনি যদি বইগুলো দেখে আপনাদের স্কুলে রেকমেন্ড করেন, তা হলে ছাত্রদের উপকার হতে পারে," কথাটা শেষ করেই ব্যাগ থেকে তিনটে বই বের করল সে। পাবলিশারের বলে দেওয়ার রাস্তাই অনুসরণ করছে সে। শরদিন্দু বললেন, "আমাদের বইয়ের সিলেকশন তো অ্যাকাডেমিক ইয়ার শুরু হওয়ার আগেই হয়ে যায়। ক্লাস শুরুর ক'দিনের মধ্যেই ছেলেদের বুকলিস্ট দেওয়া হয়। এবারও তাই হয়েছে।"

তিথি হেসে বলল, "তা জানি, স্যার। আসলে বইগুলো পাবলিশড হতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছে। অঙ্কের বই তো, তাই প্রকাশক যত্ন নিয়ে ছেপেছেন। সবে তো ক্লাস শুরু হয়েছে, যদি রেফারেন্স হিসেবেও এই বইটা আপনি..."

শরদিন্দু বললেন, "আমরা রেফারেন্স বইও বুকলিস্টে লিখে দিয়েছি।"

তিথির হঠাৎ খেয়াল হল, স্যার কথাটা বললেও, বাবলুদের অঙ্কের কোনও রেফারেন্স বই নেই। সে বুকলিস্ট দেখেছে। তিথি আবার বলল, "কিন্তু ক্লাস ফাইভের তো কোনও রেফারেন্স বই নেই। দেখুন না, যদি কোনওভাবে একটা বই অন্তত করে দেওয়া যায়।"

মহিলার কণ্ঠস্বরে যে একটা আকুতি আছে, তা ধরতে পারলেন শরদিন্দু। সে ঠিকই বলছে, ক্লাস ফাইভের কোনও রেফারেন্স বই নেই। এবার ফাইভের উপযোগী অঙ্কের কোনও রেফারেন্স বই সিলেকশনের জন্য জমা পড়েনি। পাবলিশারদের নজর সব উঁচু ক্লাসের দিকে। কিন্তু এখন বইটা কীভাবে করা যাবে? হঠাৎ শরদিন্দুর মনে হল, করালীবাবু বলছিলেন, সেভনের ইতিহাস আর নাইনের ভৌতবিজ্ঞান বইদুটো পালটাতে হবে। একটায় সাল-তারিখের গন্ডগোল, অন্য বইটায় কী একটা অনুচ্ছেদ বাদ পড়েছে। এই মহিলার আনা বইগুলো যদি ভাল হয়, তবে ওদের সঙ্গে এদের মধ্যে কোনও একটা ঢুকিয়ে

BanglaBook.org

দেওয়া যাবে। দেরি হয়ে যাচ্ছিল শরদিন্দুর। তিনি একটু ভেবে বললেন, "আপনি এক কাজ করুন। ফাইভের বইটা আমাকে দিন। অন্য যারা ফাইভের ক্লাস নেন, তাঁদের সঙ্গে আমি বইয়ের ব্যাপারে কথা বলব। অন্য বইদুটো আপনি বিকাশবাবুকে দিন। উনি অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের মেম্বর। বই সিলেকশনের ব্যাপারে ওঁর অনেকটা হাত আছে। উনি যদি কিছু করতে পারেন।"

হরি নামের সেই লোকটা ততক্ষণে আবার ফিরে এসেছে। শরদিন্দু আর দাঁড়ালেন না। তাকে, বিকাশস্যারকে স্টাফরুম থেকে ডেকে দিতে বলে, তিনি এগোলেন ক্লাসের দিকে।

হরি চলে গেল বিকাশবাবুকে খবর দিতে। তিথি জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল করিডরের একপাশে। মাস্টারমশাইরা সব ক্লাসে চলে যাওয়ার পর করিডর ফাঁকা। ক্লাস শুরু হয়ে গিয়েছে। একটা গুনগুন শব্দ মাঠের বাতাসে পাক খেয়ে করিডরে এসে ঢুকছে। বেশ কিছুক্ষণ পর স্টাফরুম থেকে বেরিয়ে এলেন এক মাঝবয়সি ভদ্রলোক। পরনে জিন্স আর নীল টি-শার্ট। মাথার চুল ব্লিচ করা। কয়েক কদম এগিয়ে, সামান্য গলা তুলে তিনি বললেন, "কই, পাবলিশারের কাছ থেকে কে এসেছেন?"

"এই যে আমি," বলে তিথি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তাকে দেখে যেন একটু অবাকই হলেন ভদ্রলোক। তারপর মাথার চুল হাত দিয়ে ঠিক করতে করতে বললেন, "হ্যাঁ, আমিই বিকাশবাবু। কী বলবেন, বলুন?"

তিথি ভদ্রলোককে বলল, "আমি কটা বই এনেছি, স্যার। শরদিন্দুস্যারের হাতে একটা দিয়েছি। তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে বললেন..." শরদিন্দুকে বলা কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করল তিথি।

বিকাশবাবু বললেন, "কিন্তু আমাদের বুকলিস্ট যে পাবলিশড হয়ে গিয়েছে। এখন তো কিছু করার নেই। আপনারা একটু দেরি করে ফেলেছেন।"

তিথি হেসে বলল, "হ্যাঁ স্যার, আসতে দেরি হয়ে গিয়েছে। আপনি তো অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের মেম্বর, আপনার হাতে ক্ষমতা আছে। দেখুন না, যদি একটা বই করতে পারেন!"

তিথির কথা শুনে বিকাশবাবু বললেন, "এসব কথা নিশ্চয়ই শরদিন্দুদা আপনাকে বলেছে? ওঁকে নিয়ে আর পারা গেল না! উনি তো ক্লাসের বাইরে স্কুলের অন্য-কোনও ব্যাপারে মাথা ঘামান না। স্কুলের যাবতীয় ঝক্কি সামলাতে হয় আমাকেই। কত কিছু আর করব?"

BanglaBook.org

তিথি বলল, "দেখুন না, যদি একটা বই অন্তত করা যায়। আমার খুব উপকার হয় তা হলে।" শেষ বাক্যটা নিজের অজান্তেই তিথির মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

বিকাশবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "উপকার হয়?" তারপর স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তার মুখের দিকে।

ওভাবে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকায় তিথি একটু অস্বস্তি বোধ করল। অস্বস্তি কাটাতে দুটো বই তাড়াতাড়ি বিকাশবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "বইদুটো একবার দেখুন, স্যার।"

বিকাশবাবু দুটো বই একহাতে নিয়ে, অন্য হাতে আবার চুল ঠিক করতে করতে বললেন, "ক্যানভাসিং লাইনে আপনি কি নতুন? আপনাকে তো আগে দেখিনি।"

"হ্যাঁ, বলতে পারেন নতুনই," জবাব দিল তিথি।

"আপনার বাড়িতে কে কে আছেন?"

বিকাশস্যারের ব্যক্তিগত প্রশ্নের কারণটা বুঝতে পারল না তিথি। সে অস্পষ্টভাবে উত্তর দিল, "সকলেই আছেন।"

বিকাশস্যার যেন আরও কয়েকমুহূর্ত জরিপ করলেন তাকে। তারপর বললেন, "হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, কোন বই হবে সেটা ফাইনালি আমিই ডিসাইড করি। ইচ্ছা হলে হয়তো এখনও একটা করতে পারি। কিন্তু..."

তিথি একটা আশার আলো দেখতে পেয়ে বলল, "কিন্তু কী, স্যার? দেখুন না তা হলে। বইগুলো সত্যিই ভাল, স্যার। আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন।"

বিকাশবাবু হাতে ধরা বইদুটোর দিকে একবারও তাকালেন না। তিথির মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "আপনার নাম আর মোবাইল নাম্বারটা দেবেন?"

সদ্যপরিচিত এক ব্যক্তিকে নিজের সেলফোনের নম্বর দিতে মুহূর্তের জন্য থমকাল তিথি। বিকাশবাবু ব্যাপারটা চট করে ধরে ফেলে বললেন, "মোবাইল নাম্বারটা চাইছি কারণ, বইটা সিলেক্টেড হলে আপনাকে জানিয়ে দেব। সোমবারই আমাদের কাউন্সিলের মিটিং আছে। আপনি তো নিশ্চয়ই কলকাতা থেকে আসছেন। অনেকসময় বইয়ের ব্যাপারে নানা জিজ্ঞাস্য থাকে। আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হতে পারে।"

BanglaBook.org

এরপর আর সে দ্বিধা করল না নম্বরটা দিতে। বিকাশবাবু নিজের মোবাইলে তার নাম্বারটা সেভ করার পর, তিথি মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "তা হলে আশা রাখছি, স্যার?"

বিকাশস্যারের ঠোঁটের কোণেও এবার আবছা হাসির রেখা ফুটে উঠল। তিনি বললেন, "দ্যাখা যাক। আমি আপনাকে জানাব।"

তিথি যখন স্কুলের বাইরে বেরোল, তখন বেশ চড়া রোদ। ছাতা খুলে সে হাঁটতে শুরু করল পাশের স্কুলের দিকে।

॥ ৫ ॥

প্ল্যাটফর্মে পা দিয়েই বসুধরা বুঝতে পারলেন, জায়গাটা অনেক পালটে গিয়েছে। একসময় এটা ছিল একটা হল্ট স্টেশন। লাল ইটের তৈরি ব্রিটিশ আমলের একটা ঘর ছিল শুধু। সেটাই ছিল স্টেশনমাস্টারের ঘর, পার্সেলঘর এবং সবকিছুই। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ালে অনেকদূর পর্যন্ত বাড়ি-ঘর-গাছপালা চোখে পড়ত।

বড় বড় কয়েকটা গাছও ছিল মোরাম বিছানো প্ল্যাটফর্মে। যাত্রীরা বিশ্রাম নিতেন তাদের ছায়ায়। বসুধরা শেষবারের মতো যেদিন এই প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ধরতে এসেছিলেন, সেদিন ওরকমই ছিল স্টেশনটা। এখন স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম উঁচু করা হয়েছে। সেই প্রাচীন গাছগুলোও আর নেই। মোরামের বদলে বসেছে কংক্রিটের স্ল্যাব, মাথার উপর শেড বসেছে। টাইল্‌স বসানো সিমেন্টের বেঞ্চ চোখ পড়ল। আশপাশে বড় বড় দোকানপাট, সিনেমা হল নিয়ে বেশ জমজমাট হয়ে গিয়েছে জায়গাটা। এই সাতসকালেই প্ল্যাটফর্মে বেশ ভিড়। দুটো সুটকেস নিয়ে কিছুক্ষণ প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে চারপাশে পরিচিত কোনও চিহ্ন খোঁজার চেষ্টা করলেন বসুধরা। পেলেন না। সুটকেস নিয়ে, ভিড় ঠেলে ধীরে ধীরে স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি। সামনেই রিকশা স্ট্যান্ড, কয়েকটা সাইকেল গ্যারেজ, পান-সিগারেটের দোকানও আছে। একটা অল্পবয়সি ছেলে তাঁকে দেখে রিকশা ছেড়ে এগিয়ে এসে বলল, "ঠাকুমা, যাবে নাকি?"

'ঠাকুমা' ডাকটা শুনে মনে মনে হাসলেন বসুধরা। সত্যি, কতগুলো যুগ

BanglaBook.org

সকলের অলক্ষ্যে কীভাবে যেন পেরিয়ে গেল! বসুধরার মাথার চুল বহুদিন আগেই ধবধবে সাদা হয়ে গিয়েছে, হয়তো সময়ের আগেই। তাঁর চোখে এখন বাইফোকাল লেন্সের চশমা, শরীর স্থূল হয়ে এসেছে। প্রায় চল্লিশ বছর আগে এক কুয়াশামাখা ভোরে যে তন্বী যুবতী এই স্টেশন ছেড়েছিল, তার সঙ্গে আজকের বসুধরার কোনও মিল নেই। সাদা গরদের শাড়ি পরিহিতা বসুধরাকে ঠাকুরমা ডাকাই স্বাভাবিক। অনেকেই তাই ডাকে।

বসুধরা জবাব দিলেন, "যাব।"

"কোথায়?"

এবার জবাব দেওয়ার আগে একটু ভেবে নিলেন বসুধরা। একসময় তাদের বাড়ি এই চত্বরের সকলেই একডাকে চিনত। এতবছর পর সেকথা বললে লোকে চিনবে কি? হয়তো সেখানেও ঘরবাড়ি গজিয়ে উঠেছে, নতুন কোনও নগর বা পল্লির গোড়াপত্তন হয়েছে। তবে তার কাছাকাছি একটা জায়গার নাম মনে এল তাঁর। তিনি বললেন, "এখানে কুসুমবাগান বলে একটা জায়গা আছে, না? সেখানেই যাব।"

ছেলেটা বলল, "ঠাকুমা, কুড়িটাকা লাগবে কিন্তু।"

বসুধরা আর বাক্যব্যয় না করে রিকশায় উঠে বসলেন। সুটকেসদুটো তাঁর পায়ের কাছে উঠিয়ে দিয়ে ছেলেটা রিকশা চালাতে শুরু করল। দোকান-বাজারের ঘিঞ্জি এলাকা পেরিয়ে এগিয়ে চলল রিকশা। বড় রাস্তা ধরে বেশ কিছুটা এগোনোর পর রাস্তার ধারে পরিচিত একটা জিনিস প্রথম চোখে পড়ল বসুধরার। একটা বুড়ো বটগাছ, আর তার লাগোয়া একটা স্কুল। গাছটা দেখেই তিনি স্কুলটা চিনতে পারলেন। বাইরে থেকে দেখে তিনি বুঝতে পারলেন, বেশ উন্নতি হয়েছে স্কুলটার, অন্তত বাহ্যিক উন্নতি তো হয়েইছে। টিনের চালের পরিবর্তে এখন উঁচু পাঁচিলঘেরা দোতলা বিল্ডিং চোখে পড়ছে। কিন্তু সে পথে আরও দুটো স্কুল পরপর দেখতে পেলেন বসুধরা। ছেলেটাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁরে, এই দুটো স্কুল কবে হল?"

ছেলেটা একটু অবাক হয়ে বলল, "কবে হল মানে? স্কুলদুটো তো এখানেই ছিল!"

বসুধরা বুঝতে পারলেন, তাঁর শৈশব-কৈশোরে স্কুলগুলো না থাকলেও, এই ছেলেটার জন্মের আগেই হয়তো এই দুটো স্কুল তৈরি হয়েছে। ছেলেটার বয়স বছরপঁচিশ হবে। বসুধরার শহর ছাড়া এবং প্রত্যাবর্তনের মধ্যে তো

BanglaBook.org

প্রায় সাড়ে তিন-চার দশকের ব্যবধান।

বসুধরা বললেন, "স্কুলগুলোয় অনেক ছেলেমেয়ে পড়ে, তাই না? আমরা যখন পড়াশোনা করতাম, তখন এপাশে প্রথম বয়েজ স্কুলটা আর রেললাইনের ওপাশে একটা মাত্র গার্লস স্কুল ছিল। অন্য সবক'টাই ছিল প্রাইমারি স্কুল।"

রিকশা চালাতে চালাতে ছেলেটা বলল, "হ্যাঁ, অনেক ছেলেমেয়ে পড়ে। বয়েজ ইস্কুলের ছেলেদের আমি মানথিলি টানি, টিনশনি টানি।"

"টিনশনি মানে?" কথাটা ঠিক ধরতে পারলেন না বসুধরা।

ছেলেটা তাঁকে বোঝাবার জন্য বলল, "টিনশনি হল, পড়ানো। আজকাল ইস্কুলে তো ঠিক পড়াশোনা হয় না। তাই টিনশনি পড়তে হয়। ইস্কুলের মাস্টাররাই পড়ায়। এক-একটা ব্যাচে পঁচিশজন-তিরিশজন ছাত্তর। মাস্টাররা কেলাসের চেয়ে টিনশনিতে ভাল পড়ায়। মহীতোষস্যার, সুবলস্যার যখন ব্যাচ ছাড়ে, তখন মনে হয় ইস্কুল ভাঙল!"

"ওহ্, টিউশন!" হেসে ফেললেন বসুধরা। জিজ্ঞেস করলেন, "তা স্কুলে যে পড়াশোনা হয় না, একথা তুই জানিস কী করে?" ছেলেটা রিকশা টানতে টানতে বিজ্ঞের মতো বলল, "আমি সব জানি। যেসব ছাত্তর নিয়ে যাই, তাদের গার্জিনরা আলোচনা করে, আমি শুনি।"

সে যে এই ব্যাপারে আরও জানে, তা বোঝাবার জন্য বসুধরাকে বলল, "মাস্টারদের কিন্তু টিনশনি করতে মানা আছে, তবু করে। বয়েজ ইস্কুলের করালীস্যার, বিকাশস্যার, দুশো টাকা করে নেয়। কিন্তু ছাত্তরদের থেকে লিখিয়ে নেয়, স্যার কোনও পয়সা নেয় না! একবার কী হয়েছিল, জানো? আমি ভাড়া নিয়ে গেচি করালীস্যারের টিনশনে। স্যার ব্যাচ শুরু করবে, ছাত্তররা সব আসছে, এমন সময় কোথা থেকে যেন দুটো লোক ক্যামেরা নিয়ে হাজির। স্যারদের মধ্যে টিনশনি নিয়ে গুরুপ আছে। কেউ চুলকে দেচিল বোধহয়। স্যার তাদের দেখেই আমার রিশকায় লাফিয়ে উঠে বলে, 'তাড়াতাড়ি চ', তাড়াতাড়ি চ'!' আমি ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বলি, 'কোথায় যাব, স্যার? ইস্কুলে?' স্যার বলল, 'না, না, ওখানে নয়, যেখানে খুশি! তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি!' তারপর সে এক দেশ্য! স্যারকে নিয়ে পাঁইপাঁই করে ছুটছি, পিছনে ছুটছে ক্যামেরা ঘাড়ে দুই রেপোটার! তাদের পিছনে আবার ছুটছে ছাত্তররা। সেদিন ছিল আবার স্যারের মাইনে দেওয়ার দিন। টাকা না দিলে

BanglaBook.org

স্যার আবার টিনশানিতে পরদিন ঢুকতে দেবে না। তাই ছাত্তররা ছুটছে আর চিল্লাচ্ছে, 'স্যার টাকা নিয়ে যান, টাকা নিয়ে যান!' তবে রেপোটারদুটো স্যারকে ধরতে পারেনি। স্যারকে নিয়ে আমি সোজা চলে গেলাম পরিবাড়ির জঙ্গলে," কথা শেষ করে হাসতে লাগল ছেলেটা।

বসুধরাও হাসতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ছেলেটার কথার শেষে 'পরিবাড়ি' শব্দটা শুনে থমকে গেলেন। কতদিন পর তাঁর কানে এল শব্দটা! তার মানে জায়গাটাকে এখনও ওই নামেই ডাকা হয়। মুহূর্তের জন্য বসুধরার মনে হল, এখনও তা হলে সবকিছু মুছে যায়নি। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "তোর নাম কী রে? এখানেই থাকিস? বাড়িতে কে কে আছে?"

রিকশা টানতে টানতে সে জবাব দিল, "আমার নাম পল্টু। ইস্টিশনের পাশে ক্ষুদিরাম পল্লিতে আমি আর আমার বউ থাকি।"

"সারাদিনের টাকা দিলে তুই থাকবি আমার সঙ্গে?"

ছেলেটা জবাব দিল, "থাকব। কোথায় যাবে?"

বসুধরা জবাব দিলেন, "এখন যাব পরিবাড়িতে। সেখানে থাকা না গেলে, কোনও হোটেল বা বাড়ি ভাড়া নিতে হবে।"

ছেলেটা এবার চমকে উঠল, "সেখানে থাকবে কী গো ঠাকুমা! পরিবাড়িতে কোনও লোক থাকে না। আমি জন্ম থেকে বাড়িটাকে ভাঙাচোরা দেখে আসছি। আশপাশেও কেউ থাকে না। যাদের বাড়ি ছিল, তারা মরে ভূত হয়ে ওখানে থাকে!"

BanglaBook.org

বসুধরা বললেন, "আগে আমাকে ওখানে নিয়ে চল, তারপর দেখা যাবে।"

বিস্মিত পল্টু আর কোনও কথা না বলে রিকশা চালাতে লাগল।

বসুধরা এবার খেয়াল করলেন, তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছেন। স্কুল, দোকানবাজার বেশ অনেকটা পিছনে ফেলে এসেছেন। রাস্তাটা পাকা। কয়েকটা বাড়ি এদিকে-ওদিকে বিক্ষিপ্তভাবে গজিয়ে উঠলেও এদিকটা মোটামুটি একইরকম আছে। ফাঁকা ফাঁকা, নিরিবিলি, চারদিকে বড় বড় সব গাছ। কুসুমবাগানের মোড় পেরিয়ে কিছুটা এগিয়ে, বড় রাস্তা ছেড়ে পরিবাড়ির পথ ধরল পল্টু। যতই এগোচ্ছেন, ততই যেন বুকের ভিতর একটা কাঁপুনি অনুভব করছেন বসুধরা। তাঁর মনে হচ্ছে, সময়ের পথে পিছু হেঁটে ধীরে ধীরে কালের গর্ভে লুকিয়ে থাকা অতীতে ফিরে যাচ্ছেন

তিনি। এই তো সেই রাস্তা, সেই গাছগুলো। গতকাল বিকেলেই তো এই রাস্তা ধরে হেঁটে গিয়েছেন তিনি। মাঝের ঘটনাপ্রবাহ নিছক স্বপ্ন, অলীক কল্পনা মাত্র। তিনি কালও এখানে ছিলেন, আজও এখানেই আছেন। এই জায়গা ছেড়ে কোথাও কোনওদিন যাননি!

আরও কিছুটা এগোবার পর পল্টু আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল, "ঠাকুমা, ওই যে!"

বসুধরা এবার দেখতে পেলেন তাকে। বহুযুগ পর আবার! ঝলমলে রোদ গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে আছে সে। পরিবাড়ির পরি!

বাড়ির সামনে রিকশা থেকে নামলেন বসুধরা, তাকালেন বাড়িটার দিকে। নাটমন্দির, সেরেস্তা, সবই ধসে পড়েছে। দোতলার বারান্দার রেলিং উধাও। তবে পূর্বদিকের কয়েকটা ঘর এখনও দাঁড়িয়ে আছে। বসুধরার চোখ গেল পুকুরের দিকে। পুকুরপাড় বুনো ঝোপে ঢেকে গিয়েছে। সংস্কারের অভাবে পুকুরের জল সবুজাভ। তার উপর সূর্যের আলো পড়ে চিকচিক করছে। জলের উপর উড়ে বেড়াচ্ছে একঝাঁক লালরঙা ফড়িং। বাইরে থেকে দোতলার ঘরগুলোর দিকে তাকিয়ে বসুধরা ভাবলেন, ঘরদুটো বাসযোগ্য আছে তো! বছরদশেক আগে তিনি একবার ভেবেছিলেন, এই বাড়িতে কিছুদিন থাকবেন। তারপর বাড়িটার একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে ফিরে যাবেন। মুম্বইয়ে বসুধরার পরিচিত একজন আর্কিটেক্ট আছেন। কলকাতাতেও অফিস আছে তাঁর। ওই ভদ্রলোকের মাধ্যমে বসুধরা তখন দোতলার দুটো ঘর মেরামত করিয়েছিলেন। সেই সংস্থার পক্ষ থেকে দুটো ঘরে দরজা বসিয়ে, তার চাবি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল বসুধরার কাছে। কিন্তু তখন আর তাঁর আসা হয়নি। সেই চাবি সঙ্গে এনেছেন তিনি। তবে উপরে না উঠলে বোঝা যাবে না, সেই দুই দরজা আদৌ আছে কি না!

পল্টু হাঁ করে একবার বাড়িটাকে দেখছিল, তারপর দেখছিল বসুধরাকে। ব্যাপারটা তার কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছে না! এই মানুষটা সত্যি এখানে থাকতে এসেছে!

রিকশা থেকে নামলেন বসুধরা। পল্টুকে আশ্বস্ত করার জন্য বললেন, "এটা আমারই বাড়ি," তারপর ধীরপায়ে এগিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকলেন। ছাদ থেকে খসে পড়া পলেস্তরা স্তূপাকৃত হয়ে রয়েছে, পায়রার বিষ্ঠা ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। তাঁকে দেখে একঝাঁক গোলাপায়রা কড়িকাঠের নীচ থেকে

BanglaBook.org

বেরিয়ে, শব্দ করে ডানা ঝাপটে ছাদের কার্নিশে গিয়ে বসল। বসুধরার মনে হল, তারা যেন করতালি দিয়ে স্বাগত জানাল তাঁকে। তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল, একটু ঝুঁকে ভূমি স্পর্শ করার, কিছুটা মাটি তুলে নিতে। কিন্তু পল্টুও যে তাঁর পিছন পিছন ঢুকছে। সে হয়তো ভাববে, বুড়িটার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ! বসে বসে নোংরা মাটি ঘাঁটছে! কাজেই ইচ্ছে হলেও ভূমি স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকলেন তিনি।

বসুধরা উপস্থিত হলেন সেই ঘরটায়, যেখান থেকে উঠে গিয়েছে দোতলার সিঁড়ি। রেলিংহীন সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে যাচ্ছিলেন তিনি। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে পল্টু বলল, "আমি আগে উঠি, তুমি আমার পিছন পিছন এসো, ঠাকুমা। সাপখোপ থাকতে পারে।"

পল্টু আগে উঠল। তার পিছনে বসুধরা। ধুলোময় বারান্দা ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকটা ঘর। মাকড়সা জাল বুনেছে ঘরের এমাথা থেকে ওমাথা। ছাদের কড়িবরগার ফাঁক থেকে ঝুলছে শুকনো ঘাস, খড়কুটো, পায়রার পালক, উঁকি দিচ্ছে পায়রার মাথা। বেশ গুছিয়ে সংসার পেতেছে ওরা এখানে। কত পুরুষ ধরে, কে জানে! বারান্দা থেকে একটু এগিয়েই চিলেকোঠার সিঁড়ি। বেশ ক'টা ঘর দরজা-জানালাহীন হলেও, দুটো পাশাপাশি ঘরের বন্ধ দরজা দেখতে পেলেন বসুধরা। তার মানে এই দুটো ঘরই তখন সারানো হয়েছিল। এই দুটো দরজার উপর এখনও নজর পড়েনি কারও, তাই এখনও রয়েছে। ধুলোমাখা দুটো তালাও ঝুলছে।

পল্টুকে দিয়ে তালাদুটো পরিষ্কার করালেন বসুধরা। তারপর হ্যান্ডব্যাগ থেকে চাবি বের করে তার হাতে দিলেন তালা খোলার জন্য। ভারী পিতলের তালা, রং ফ্যাকাশে হয়ে গেলেও মরচে পড়েনি। পল্টু চাবি নিয়ে কসরত শুরু করল, যদি কোনও একটা তালা খোলা যায়। কিন্তু কোনও তালাই খুলল না। ভিতরের কলকবজা সব ধুলোয় ভরে গিয়েছে সম্ভবত। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করে পল্টু বলল, "দাঁড়াও, আমার রিশকার সিটের নীচে চাকায় দেওয়ার তেল, চাকার ইস্পোক, হাতুড়ি আছে, সেগুলান আনি আগে।"

চট করে নীচ থেকে যন্ত্রপাতি, তেল ইত্যাদি নিয়ে ফিরে এল পল্টু। কিছুক্ষণের চেষ্টায় কীভাবে যেন খুলেও ফেলল একটা দরজার তালা। তারপর দরজার পাল্লাটাও। ঘরের বন্ধ বাতাস বেরিয়ে যাওয়ার পর পল্টুকে নিয়ে তার ভিতর পা রাখলেন বসুধরা। একটু কসরত করে একদিকের জানলা

BanglaBook.org

খুলে ফেলতেই ঘর ভেসে গেল রোদে। বসুধরা খুঁটিয়ে দেখলেন ঘরটাকে। একসময় এটা ছিল তাঁর পড়ার ঘর। পাশেরটা ছিল শোওয়ার ঘর। বসুধরা মনে করার চেষ্টা করলেন, ওই কোণে একটা টেব্‌ল ছিল, এপাশে সম্ভবত সেই বইয়ের আলমারিটা। আর... আর কী ছিল? স্মৃতি এই মুহূর্তে খুব একটা সাহায্য করল না তাঁকে। একটা দেওয়ালে নোনা ধরলেও ঘর মোটামুটি অক্ষতই আছে। পল্টু ততক্ষণে চেষ্টা করতে শুরু করেছে পুকুরের দিকের জানালাটা খোলার। কিন্তু সেটা খোলা গেল না। ছাদ থেকে নেমে আসা বটের ঝুরি বাইরে থেকে আটকে রেখেছে তাকে। জানালা খুলতে ব্যর্থ হয়ে পল্টু ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল বসুধরার দিকে। এতক্ষণ ধরে দরজা-জানালা চেষ্টা করলেও, ব্যাপারটা এখনও তার মাথায় ঢুকছে না। কী করতে চাইছে এই বুড়িটা!

তার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে হাসলেন বসুধরা। বললেন, "বাবা, তোকে যদি কিছু পয়সা দিই, তা হলে তুই আমার কিছু কাজ করে দিবি?"

"কী কাজ?"

"এই ঘরটা একটু পরিষ্কার করা। একটা ক্যাম্পখাট, একটা স্টোভ, দু'-একটা বাসনপত্র কিনে আনা। একজন মানুষের ক'দিন থাকার জন্য যা দরকার হয় আর কী! ওগুলো যাওয়ার সময় না হয় তোকেই দিয়ে যাব।"

তাঁর কথা শুনে বিস্মিত কণ্ঠে পল্টু বলে উঠল, "তুমি সত্যি এখানে থাকতে এসেছ?"

বসুধরা শান্ত গলায় বললেন, "হ্যাঁ, ক'দিনের জন্য থাকতে এসেছি। ক'টা কাজ আছে এখানে। মিটলে আবার চলে যাব।"

পল্টু অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বলল, "ঠিক আছে ঠাকুমা, করে দেব।"

বসুধরার যখন ঘুম ভাঙল, তখন বাইরের আলো প্রায় মরে এসেছে। আবছা অন্ধকার খেলা করছে ঘরের ভিতর। ক্যাম্পখাটে শুয়েছিলেন তিনি। পল্টু ছেলেটা বেশ করিতকর্মা। ক্যাম্পখাট, স্টোভ, জলের বালতি এবং আরও কিছু জিনিস তাকে দিয়েই কিনিয়েছেন তিনি। ঘরটাও দু'জনে মিলে পরিষ্কার করেছেন। সেসব কাজ মিটতেই তিনটে বেজে গিয়েছিল। পল্টু চলে যাওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তিনি। কাল থেকে বেশ ধকল যাচ্ছে তাঁর। মুম্বই

BanglaBook.org

থেকে ফোনে কলকাতা আসা, হোটেলে রাত কাটিয়ে কাকভোরে শিয়ালদা থেকে ফাস্ট ট্রেন ধরা, তারউপর আবার ঘর পরিষ্কারের ধকল। ক্যাম্পখাটে গা এলিয়ে দেওয়ার পরই ক্লান্তিতে তাঁর দু'চোখে ঘুম নেমে এসেছিল।

পল্টু বারবার বলছিল, "এত বড় বাড়িতে একা থাকলে কী করে গো ঠাকুমা? অনেকে বলে, এই বাড়িতে নাকি ভূত থাকে।"

বসুধরা তাকে বলেছেন, "ভূত তো একসময় মানুষই ছিল। তারা নিশ্চয়ই কথাবার্তাও বলে। তা হলে তো আর আমি একা থাকব না। তাদের সঙ্গেই থাকব।"

তাঁর সাহস দেখে অবাক হয়ে গিয়েছে পল্টু।

বসুধরা এমনিতেও একাই থাকেন। এখানে তবু পায়রার ডাক আছে, বাগানে বাতাসে দুলতে থাকা বড় বড় গাছ আছে, দু'-একটা পাখির ডাকও কানে এসেছে তাঁর। আর আছে এখানকার মাটি। সেও তো জীবন্ত বসুধরার কাছে! এতগুলো প্রাণী ঘিরে আছে তাঁকে। সুতরাং ভয় কী? বরং মুম্বইয়ের চব্বিশ তলার অ্যাপার্টমেন্টে তিনি একদম একলা। সেখানে এক-একসময় তাঁর মনে হয়, তিনি যেন মহাশূন্যে ভেসে বেড়ানো নভঃশ্চরের মতো একলা এক মানুষ। মহাকাশযানের ককপিটে থাকা নভঃশ্চরের মতোই অ্যাপার্টমেন্টের জানালা দিয়ে চাঁদ-সূর্য দেখেন বসুধরা। সূর্যালোক বা চন্দ্রিমা মাটির কাছে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের মনে যে প্রাণের স্পন্দন জাগায়, তা চব্বিশ তলার ফ্ল্যাটের জানালা থেকে পাওয়া যায় না। আলোর ছোঁয়ায় সেখানে নিঃসঙ্গতা আরও প্রকট, দহনজ্বালা তীব্রতর।

এখানে অন্য কোনও ভয়ও নেই বসুধরার। তিনি পূর্ণ যৌবনবতী নন, খুব বেশি টাকাকড়িও নেই। সঙ্গে এটিএম কার্ড রয়েছে। প্রয়োজনে টাকা তুলে নেবেন। থাকার মধ্যে আছে জীর্ণ পরিবাড়ির আনাচেকানাচে লুকিয়ে থাকা তাঁর কৈশোর-যৌবনের স্মৃতি। সেসব স্মৃতি তাঁর কাছ থেকে কেউ চুরি করতে পারবে না।

ঘুম ভাঙার পর খানিকক্ষণ শুয়ে রইলেন বসুধরা। প্রথমেই তাঁর মনে হল পরিটার কথা। তারই স্বপ্ন দেখছিলেন তিনি ঘুমের মধ্যে। সে তাঁকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এতক্ষণ। পরিটার সঙ্গে একজোটে কাউকে খুঁজছিলেন বসুধরা। কাকে? হঠাৎ পরিটা বসুধরাকে একলা ফেলে রেখে উড়ে গিয়ে বসল চিলেকোঠায় আর তখনই ঘুমটা ভেঙে গেল তাঁর।

BanglaBook.org

কাল দিনের আলোয় পল্টুকে সঙ্গে নিয়ে একবার চিলেকোঠায় ওঠার চেষ্টা করবেন বলে ঠিক করলেন বসুধরা। পরিটার কাছে গিয়ে একবার ছুঁয়ে দেখবেন তাকে। আর ক'দিন পরই তো লোকগুলো এসে নিয়ে যাবে পরিবাড়ির পরিকে। তার কাছে বসুধরার একটা জিনিস গচ্ছিত আছে। বিদায়ের আগে সেটা ফেরত নিতে হবে।

বাইরে অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে ঘরটাও ডুবে গেল অন্ধকারে। একসময় চাঁদও উঠল। সেই আলো স্পর্শ করল বসুধরাকে। এবার বিছানা ছেড়ে উঠলেন তিনি, গিয়ে দাঁড়ালেন জানালার সামনে। বড় বড় গাছগুলো যেন এক-একটা মানুষ। সামান্য তফাতে দাঁড়িয়ে তারা তাকিয়ে আছে বসুধরার দিকে। তাঁর খুব ইচ্ছে হচ্ছিল একবার পরিটাকে দেখার। এখন জোৎস্না মেখে একলা দাঁড়িয়ে আছে সে, ঠিক আগের মতোই। জ্ঞান হওয়ার পর নিজের মাকে কোনওদিন দেখেননি তিনি। বসুধরার দু'বছর বয়সেই তাঁর মা নিজের শিশুকন্যা, এই পরিবাড়ি, আত্মীয়স্বজন সবকিছু ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন পরির দেশে। একটু বড় হওয়ার পর বসুধরাকে কে যেন বলেছিল কথাটা। বলেছিল, রাত হলেই নাকি পরিটা জ্যান্ত হয়ে উড়ে যায় নিজের দেশে। ভোরের আলো ফোটার আগেই আবার ফিরে এসে দাঁড়ায় নিজের জায়গায়। বসুধরার শিশুমন বিশ্বাস করে ফেলেছিল কথাগুলো। তিনি ভাবতেন, নিশ্চয়ই পরিটার সঙ্গে দেখা হয় তাঁর মায়ের! ও নিশ্চয়ই সব খবর পৌঁছে দিতে পারে তাঁর মায়ের কাছে! এই বিশ্বাসের বশেই ছোটবেলায় তাঁকে কেউ বকাবকি করলেই, তিনি সোজা চলে যেতেন চিলেকোঠার পরিটার কাছে। মনের অভিযোগ-অনুযোগ উজাড় করে দিতেন তার কাছে, কখনও কখনও আনন্দ-উচ্ছ্বাসের কথাও। শিশু বসুধরার আর্জি ছিল একটাই, কথাগুলো যেন মায়ের কাছে পৌঁছে দেয় পরিটা। নিশুতি রাতে মাঝে মাঝে তাঁর ইচ্ছে হত, পরিটার কাছে যাওয়ার! বিশেষত, তার জ্যান্ত হয়ে ওঠার মুহূর্তে। তাকে বললে, সে হয়তো মায়ের কাছে নিয়ে যেতে পারত তাঁকে! কিন্তু ছাদে ওঠার অনুমতি ছিল না বসুধরার। তবু একদিন রাতে সকলের চোখ এড়িয়ে সে পৌঁছে গিয়েছিল ছাদে আর তারপরই তো সে দেখেছিল...

বহুদিনের পুরনো একটা দৃশ্য অস্পষ্টভাবে ভেসে উঠতে যাচ্ছিল বসুধরার চোখের সামনে। কিন্তু নীচ থেকে ভেসে আসা মৃদু একটা শব্দে চিন্তাজাল ছিন্ন হল তাঁর। পল্টু ফিরে এল কি? দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন

BanglaBook.org

বসুধরা। অন্ধকার বারান্দায় কিছুক্ষণ দাঁড়াবার পর তাঁর মনে হল, নীচে সিঁড়ির কাছ থেকে একটা চাপা খসখস শব্দ আসছে। শব্দটা কীসের? সাপখোপ নয় তো? তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে কয়েকধাপ নেমে বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে উঁকি দিলেন নীচের দিকে। ভাঙা জানালা দিয়ে চাঁদের আলো ঢুকছে নীচের ঘরে। সিঁড়ির ঠিক মুখে সামান্য এলিয়ে বসে আছে এক নারী। তার উন্মুক্ত স্তন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন বসুধরা। ঠিক যেন সেই শ্বেতপাথরের পরিটা! সেই নারীর কোলে মাথা রেখে পরম শান্তিতে ঘুমোচ্ছে এক পুরুষ।

মুহূর্তখানেক মাত্র! হঠাৎ মেয়েটা পিছনে ফিরে তাকাল। বসুধরাও সঙ্গে সঙ্গে সরে এলেন জায়গাটা ছেড়ে।

॥ ৬ ॥

আজ স্বেচ্ছায় পরিবাড়ির পথটা ধরলেন শরদিন্দু। বাণীবাবু পাশে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, "জায়গাটা আপনার মনে ধরেছে দেখছি।"

শরদিন্দু তাঁর কথায় জবাবে শুধু হাসলেন।

সেদিন,অনেকযুগ বাদে, বাড়িটার কাছে যাওয়ার পর থেকেই পরিবাড়ি মাঝে মাঝেই উঁকি দিয়ে যাচ্ছে তাঁর মনে। আজ ভোররাতে তাঁর স্বপ্নে হানা দিয়েছিল পরিবাড়ির পরি। শরদিন্দু দেখলেন, তিনি হাজির হয়েছেন পরিবাড়িতে। সে বাড়ি হালফিলের নিঃসঙ্গ পরিবাড়ি নয়, সে বাড়ি আলো ঝলমলে। লোকজন-ঠাকুর-নফর-চাকরে গমগম করছে। কোনও উৎসব চলছে বোধহয়, সানাই বাজছে। সকলে শশব্যস্ত। সেই ভিড়ে কাকে যেন খুঁজছিলেন শরদিন্দু। কেউ তার হদিশ দিতে পারছে না। শেষে কে যেন তাঁর কানে ফিসফিস করে বলল, "তুমি যাকে খুঁজছ, সে আছে চিলেকোঠায়। অন্যরাও তো তাকেই খুঁজছে। তার জন্যই তো এত আলো-সানাই!"

শরদিন্দু উঠে গেলেন ছাদে। ওই তো মোম-জোৎস্না গায়ে মেখে একলা দাঁড়িয়ে আছে সে! শরদিন্দু যেই তাকে ছুঁতে গেলেন, সে ডানা মেলে চাঁদের দিকে উড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পরিবাড়ির আলো-সানাই- হঠাৎ ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গেল! শরদিন্দু দেখলেন, একটা পোড়োবাড়িতে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। পরমুহূর্তেই থরথর করে কাঁপতে লাগল বাড়িটা, যেন ধসে

BanglaBook.org

পড়বে। তখনই ঘুমটা ভেঙে গেল তাঁর।

পরিবাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে স্বপ্নটার কথা ভাবছিলেন শরদিন্দু। ছেঁড়া ছেঁড়া পেঁজা তুলোর মতো স্বপ্ন সব। হাঁটতে হাঁটতে একসময় তাঁরা পৌঁছে গেলেন পরিবাড়ির পুকুরপাড়ে। গতদিন যেখানে বসেছিলেন, আজও সেখানেই বসলেন দু'জনে। শেষবেলার আলোয় পরিটা দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ একটা অদ্ভুত জিনিস শরদিন্দুর চোখে পড়ল। দোতলার ভাঙা বারান্দা থেকে একটা শাড়ি ঝুলছে, সাদা রঙের শাড়ি। কেউ যেন রোদে মেলে দিয়েছে।

ও কার শাড়ি! শরদিন্দু হঠাৎ চমকে উঠলেন। তারপর নিজের চমকে ওঠার হেতুর কথা ভেবে মনে মনে হাসলেন। যা তিনি ভাবছেন, তা সম্ভব নয়। সে তো সাদা শাড়ি পরত না! শেষ যেদিন তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তার পরনে ছিল একটা গোলাপি রঙের শাড়ি। সেই বিকেলটা আজও স্পষ্ট মনে আছে শরদিন্দুর। অবশ্য মধ্যে কেটে যাওয়া দীর্ঘ সময়টা সেই মুহূর্তে ধরতে পারলেন না তিনি। পারলে বুঝতেন, সময় উজ্জ্বল গোলাপি রংকেও সাদা করে দেয়। শরদিন্দুর মনে হল, ফাঁকা বাড়ি দেখে কোনও গরিব পরিবার হয়তো বাসা বেঁধেছে ওখানে। শাড়িটা তাদেরই কারও হবে হয়তো।

"আপনার হাতে কি কিছু হয়েছে? চোটফোট লেগেছে?" বাণীবাবুর কথায় সংবিৎ ফিরল তাঁর। নিজের অবচেতনেই বাড়িটার দিকে তাকিয়ে ডানহাতের কবজিটা মোচড় দিচ্ছিলেন শরদিন্দু। সেটা দেখেই বাণীবাবু প্রশ্ন করলেন।

প্রশ্নটা শুনে, একটু ইতস্তত করে তিনি জবাব দিলেন, "ইয়ে... মানে, আমার কব্‌জিটা... মনে হয়, ঠিকঠাক ঘুরছে না।"

'ঘুরছে না মানে?"

"দু'দিন আগে ক্লাসে একটা ছেলেকে বৃত্ত আঁকা শেখাচ্ছিলাম। কিন্তু সেটা আঁকতে গিয়ে হাতটা অর্ধেক ঘুরে আর ঘুরল না। একটা অর্ধবৃত্ত হয়েই হাত থেমে গেল। পরপর বেশ কয়েকবার চেষ্টা করলাম, হল না। বাড়িতেও একদিন চেষ্টা করেছি, কিছুতেই হচ্ছে না! শুধু অর্ধবৃত্ত আঁকা হচ্ছে।"

"কোনও পুরনো চোট নয় তো? ডাক্তার দেখিয়েছেন?"

শরদিন্দু জবাব দিলেন, "ঠিক খেয়াল হচ্ছে না। তবে ব্যথা নেই। ডাক্তার দেখাইনি, তবে এবার দেখাব ভাবছি। আপনাকেই প্রথম জানালাম ব্যাপারটা।"

বাণীবাবু বললেন, "পারলে আজই দেখিয়ে নিন। এসব ব্যাপার ফেলে

BanglaBook.org

রাখবেন না। তাই করেই তো আমার মেয়েটা... কথাটা বাণীবাবু আর শেষ করলেন না।

শরদিন্দু বললেন, "মেয়েটা কী?"

সামান্য চুপ করে থেকে বাণীবাবু বললেন, "চল্লিশ বছর বয়স, মাঝে মাঝে বমি হত, সঙ্গে হজমের গণ্ডগোল, মাথাব্যথা। দু'-একবার পাড়ার ডাক্তার দেখানো হলেও, ব্যাপারটায় আমরা তেমন আমল দিইনি। ওষুধ খাইয়ে অবস্থা সামাল দেওয়া হত। হঠাৎ একদিন মেয়ের খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। যা খাচ্ছে, তাতেই বমি। বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি বললেন, নার্সিংহোমে ভরতি করতে। কয়েকটা টেস্টের পরই আসল ব্যাপারটা জানা গেল, লিভার ক্যান্সার! মাসছয়েক আগে আনলেও নাকি বাঁচানো যেত মেয়েটাকে। অথচ পেটের গোলমাল-বমি চলছিল প্রায় একবছর ধরে। আমরা কোনও গুরুত্বই দিইনি। সামনের মাসে তার চলে যাওয়ার একবছর হবে।"

শরদিন্দু চমকে উঠলেন তাঁর কথা শুনে। হাঁটতে আসার সুবাদে মাসখানেক হল বাণীবাবুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তাঁর। কারও পারিবারিক বিষয়ে উঁকিঝুঁকি মারতে শরদিন্দুর রুচিতে বাঁধে। বাণীবাবু এর আগে নিজে তাঁকে যতটুকু বলেছেন, ততটুকুই তাঁর জানা। বেশ উঁচুপদের সরকারি চাকরি থেকে তিনি অবসর নিয়েছেন। তাঁর পরিবার বলতে স্ত্রী আর বিবাহযোগ্য এক পুত্র। স্ত্রী এখনও সরকারি চাকরি করেন, ছেলে একটা নামী সংস্থায় উচ্চপদে মোটা অঙ্কের বেতনে আসীন। স্ত্রী-পুত্রের চাকরি, নিজের পেনশন, দোতলা বাড়ি, সব মিলিয়ে জীবনের উপান্তে দাঁড়িয়ে থাকা বাণীবাবুকে খুশি এবং সুখী বলেই মনেই হয়েছে শরদিন্দুর। বাণীবাবুর সদা হাস্যময় সত্তা তাঁর সেই ধারণাকেই এতদিন সমর্থন করে এসেছে। শরদিন্দু আজ বুঝতে পারলেন, ব্যাপারটার মধ্যে একটা ফাঁক রয়ে গিয়েছে।

পুকুরের দিকে তাকিয়ে বাণীবাবু বললেন, "জানেন, বেশ দেখতে ছিল আমার মেয়েটাকে। চাঁপাফুলের মতো গায়ের রং, একরাশ চুল, টানা টানা চোখ। সদ্য গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেছিল। আপনাকে বলতে দ্বিধা নেই, যেখানে চাকরি করতাম, সেখানে বেতনের চেয়ে উপরি আয় বেশি ছিল। বেতনের টাকার অধিকাংশই আমি সঞ্চয় করে রেখেছিলাম মেয়ে আর ছেলের জন্য। ভেবেছিলাম, সোনার গয়নায় মুড়ে মেয়েকে পাত্রস্থ করব। সবই ঠিক ছিল, কিন্তু সামান্য নেগ্লিজেন্স। তাতেই সব শেষ!"

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বাণীবাবু ফের বললেন, "এখানে হাঁটতে আসি কেন, জানেন? রিটায়ার্ড মানুষ, বাড়িতে সারাদিন একলাই থাকি। স্ত্রী-ছেলে সকালে বেরিয়ে ফেরে সন্ধেবেলায়। সকালটা কোনওরকমে কেটে গেলেও, দুপুরের পর থেকে খালি মনে হয় মেয়েটার কথা। বিশ্বাস করুন, আমি আপ্রাণ চেষ্টা করি ব্যাপারটা ভোলার! কিন্তু ভুলব কী করে? বাড়ির সবকিছুর সঙ্গেই যে জড়িয়ে আছে ও। টেবিলের কুশন, দেওয়ালে আঁকা ল্যান্ডস্কেপ, বারান্দার সামনে পোঁতা ঝাউগাছটা... সবকিছুর সঙ্গে..." গলাটা ধরে এল বাণীবাবুর। থেমে গিয়ে তিনি মাথা নিচু করলেন।

শরদিন্দু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "আমাকে ক্ষমা করবেন। ব্যাপারটা আমার জানা ছিল না, তা হলে এই প্রসঙ্গটা..."

বাণীবাবু তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "মশাই, আপনি বিব্রত হচ্ছেন কেন? আমিই তো ব্যাপারটা বললাম আপনাকে। জানেন, আমি জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। সময় তো হয়ে এল। পরের জন্মে আমি হয়তো শরদিন্দুমাস্টার হয়ে জন্মাব। তখন আমার না থাকবে মেয়ে, না থাকবে অন্য কেউ। তাদের জন্য আমার দুঃখ-কষ্টও থাকবে না। গোরু-ভেড়া হয়ে জন্মালে তো আরও ভাল, কোনও কষ্টই থাকবে না," নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো করে হেসে উঠলেন তিনি।

শরদিন্দু কিন্তু হাসতে গিয়েও পারলেন না। বাণীবাবুর হাসিটা যেন চাপা কান্নার মতো বাতাসে ঘুরপাক খেতে খেতে মিশে যেতে লাগল পুকুরের জলে। মেয়ের প্রসঙ্গ থেকে বাণীবাবুকে সরানোর জন্য শরদিন্দু জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, আমার হাতটার ব্যাপারে কোন ডাক্তার দেখানো যায়, বলুন তো?"

বাণীবাবু হাসি থামিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "আমার মনে হয় অর্থোপেডিক বা নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম হতে পারে আপনার। আপনি বরং ডাক্তার চক্রবর্তীকে দেখান। ওই যে, যিনি বিদেশে ছিলেন, মাসআষ্টেক হল স্টেশনরোডে নার্সিংহোম খুলেছেন। নামী ডাক্তার, প্রচুর পেশেন্ট হয়। নার্সিংহোমে আমাদের পাড়ার একজন কাজ করে। আপনি বললে, ওকে দিয়ে নাম লেখানোর ব্যবস্থা করতে করা যেতে পারে।"

শরদিন্দু উজ্জীবিত হয়ে বললেন, "আপনি নিশ্চয়ই ডাক্তার প্রশান্ত চক্রবর্তীর কথা বলছেন? ও ও আমার ছাত্র ছিল। সম্ভবত একানব্বইয়ের

BanglaBook.org

হায়ার সেকেন্ডারি ব্যাচ। ব্রিলিয়ান্ট ছেলে ছিল। ও আর অনির্বাণ বলে আর-একজন সেই বছর এইচএসে অঙ্কে দুশোয় দুশো পেয়েছিল," পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে।

বাণীবাবু বললেন, "ব্যস, তা হলে তো আর কথাই নেই। আজ বাড়ি ফেরার পথে একবার নার্সিংহোম হয়ে যান। ওঁকে পেলে হাতটা একবার দেখিয়ে নিন।"

শরদিন্দু বললেন, "ঠিক আছে, তা হলে তাই করব।"

বাণীবাবু এরপর জলের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবতে লাগলেন। সম্ভবত নিজের মেয়ের কথাই। শরদিন্দুও চুপ করে তাকিয়ে রইলেন পরিবাড়ির দিকে। বিদায়ী সূর্যকিরণ ছড়িয়ে পড়েছে পরির গায়ে। তার সারা গায়ে গোলাপি আভা। শরদিন্দুর মনে হল, ওই পরিটা যেন বহুদিন আগে দেখা গোলাপি শাড়িপরিহিত রক্তমাংসের কোনও নারী।

বেশ কিছুক্ষণ পর বাণীবাবু বললেন, "আমাকে কিন্তু এখন উঠতে হবে। এক পাত্রীর খোঁজ নিয়ে এক ভদ্রলোকের আসার কথা। ছেলের বিয়েটা তাড়াতাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করছি। বউমা এসে যদি মেয়ের অভাব কিছুটা পূরণ করতে পারে।"

দু'জনেই উঠে পড়লেন।

ফেরার পথে বাণীবাবু বললেন, "যা বললাম, পারলে আজই একবার নার্সিংহোমে যান। ডাক্তারবাবুর ফোননম্বর কি আছে আপনার কাছে?"

শরদিন্দু বললেন, "না, নেই। ও এডিনবরা যাওয়ার আগে শেষ দেখা হয়েছিল। সেও প্রায় আটবছর আগে হবে। কিন্তু ওর কাছে গেলে..." কথাটা শেষ করলেন না তিনি।

"কিন্তু কী? ভাবছেন, উনি যদি চিনতে না পারেন আপনাকে? ফিজ় দিয়ে ডাক্তার দেখাবেন, মশাই! তাতে চেনা-অচেনার কোনও ব্যাপার থাকবে না," কথাটা মজা করে বললেন বাণীবাবু।

শরদিন্দু বললেন, "ওই ফিজ়ের জন্যই তো ওর কাছে যেতে আমার কিন্তু কিন্তু লাগছে। ও নিশ্চয়ই আমার কাছে ফিজ় নিতে চাইবে না। ছাত্রদের কাছ থেকে প্রিভিলেজ নিতে আমার অস্বস্তি হয়। মনে হয়, শিক্ষকের পোস্টটা ভাঙিয়ে খাচ্ছি।"

"ভাঙিয়ে খাওয়ার কী আছে? ছাত্র তার শিক্ষকের কাছ থেকে শ্রদ্ধাবশত

BanglaBook.org

টাকা না-ই নিতে পারে। শিক্ষকেরও তো ছাত্রর প্রতি দাবি থাকে। 'গুরুদক্ষিণা' শব্দটা তা হলে আছে কী করতে?"

"দাবি থাকে ঠিকই। তবে আর্থিক ব্যাপারস্যাপার দূরে রাখাই ভাল। ছাত্রদের পড়ানোর বিনিময়ে আমি আর্থিক দিক থেকে পুষ্ট হয়েছি। ছাত্ররাও কমবেশি অর্থব্যয় করে লেখাপড়া শেখে উপার্জনের জন্য। সেখান থেকে ভাগ নেওয়া ঠিক নয়।"

বাণীবাবু হাঁটতে হাঁটতে বললেন, "এক-একসময় আপনি এমন সব কথা বলেন যে, আমি ঠিক বুঝতে পারি না।"

শরদিন্দু শুধু হাসলেন, কোনও জবাব দিলেন না।

রেললাইনের ওপাশে বাণীবাবুকে ছেড়ে ওভারব্রিজ পেরিয়ে শরদিন্দু যখন স্টেশনরোডে নামলেন, তখন দু'পাশের দোকানে আলো জ্বলে উঠেছে। শহরের লোকসংখ্যা গত পাঁচ-সাতবছরে অনেক বেড়েছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গজিয়ে উঠেছে, ফ্রিজ-টিভি-মোটরসাইকেল, মোবাইলফোনের ঝাঁ-চকচকে সব দোকান। শরদিন্দুকে কে যেন বলছিল, একটা শপিংমলও নাকি হতে চলেছে। দ্রুত বদলে যাচ্ছে শহরটা। নার্সিংহোম যাওয়ার জন্য স্টেশনরোড ধরে পূর্বদিকে এগোতে হবে। সেদিকে যাওয়ার জন্য একটা রিকশা নিলেন শরদিন্দু।

নার্সিংহোমের সামনে পৌঁছেও একটু দ্বিধা হচ্ছিল তাঁর। শেষমেশ দ্বিধা কাটিয়ে কাচের সুইংডোর ঠেলে ভিতরে ঢুকলেন তিনি। রিসেপশনে একজন মধ্যবয়সি লোক আর এক সুবেশা তরুণী বসে আছে। ঘাড় গুঁজে কীসব কাগজপত্র দেখছে তারা। ঘরের অপরপ্রান্তে লম্বা লম্বা বেঞ্চে বসে আছে আরও কয়েকজন। তারা হয়তো রোগীদের আত্মীয়পরিজন হবেন। শরদিন্দু রিসেপশনে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি ডাক্তার চক্রবর্তীর কাছে এসেছি।"

লোকটা মুখ না তুলেই বলল, "পেশেন্ট?"

শরদিন্দু জবাব দিলেন, "হ্যাঁ।"

"আজ আর হবে না। স্যার পেশেন্ট দেখা শেষ করে একটু আগেই উপরে গিয়েছেন। নাম লিখিয়ে, একশো টাকা জমা দিয়ে যান। কাল বেলা এগারোটায় আসতে হবে।"

"ওঁর ফোননম্বরটা দেওয়া যাবে?"

BanglaBook.org

"স্যার না বললে ওঁর নাম্বার দেওয়া হয় না। নার্সিংহোমের নম্বর দিতে পারি। লিখে নিন..."

লোকটা নম্বর বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই পাশের মেয়েটি কাগজ থেকে মুখ তুলে তাকিয়ে একটু ইতস্তত করে বলল, "আপনি শরদিন্দুস্যার, না?"

শরদিন্দু তাকালেন মেয়েটির দিকে। বয়স আন্দাজ পঁচিশ-ছাব্বিশ। ফরসা, সুন্দর মুখশ্রী। কিন্তু আগে তাকে কোথাও দেখেছেন বলে ঠিক মনে করতে পারলেন না।

মৃদু হেসে তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আপনাদের স্যার আমার ছাত্র ছিলেন। তাই নম্বরটা চাইছিলাম।"

মেয়েটি কয়েকমুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "দাঁড়ান, আমি দেখছি।" সামনে রাখা ইন্টারকমের দিকে হাত বাড়াল মেয়েটা। শরদিন্দু শুনলেন, এপাশ থেকে মেয়েটি বলল, "স্যার, আপনার সঙ্গে বয়েজ় স্কুলের শরদিন্দুস্যার দেখা করতে এসেছেন..."

ওপাশের কথা তিনি শুনতে পেলেন না। মেয়েটি ইন্টারকম নামিয়ে রেখে মিষ্টি হেসে বলল, "চলুন, আমি আপনাকে স্যারের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।"

মেয়েটির সঙ্গে লিফ্‌টে চারতলায় পৌঁছে গেলেন শরদিন্দু। নীচের তিনটে তলা মিলে নার্সিংহোম আর চারতলায় ডাক্তার চক্রবর্তীর থাকার জায়গা। মেয়েটি শরদিন্দুকে একটা দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে বাইরে থেকে বলল, "স্যার, উনি এসেছেন।"

BanglaBook.org

দরজা খুলে গেল। ডাক্তার চক্রবর্তীর দিকে মুহূর্তখানেক তাকিয়ে রইলেন শরদিন্দু। প্রশান্ত বেশ মোটা হয়ে গিয়েছে। গাল-থুতনির মাংসও কেমন ঝুলে গিয়েছে। ঝুলপিতে হালকা রুপোলি রেখা। বছরআটেক আগে দেখা সেই ছিপছিপে প্রশান্তর সঙ্গে এই লোকটার কোনও মিলই নেই। শুধু তার উজ্জ্বল চোখদুটো ছাড়া। ওই চোখ ছাত্র পড়াতে পড়াতে চিনে গিয়েছেন শরদিন্দু। ওর পিছনে লুকিয়ে থাকে মেধা। চোখদুটো ছাড়া, দূর থেকে দেখলে আজকের প্রশান্তকে শরদিন্দু চিনতে পারতেন কি না সন্দেহ!

প্রশান্ত ঝুঁকে পড়ে শরদিন্দুকে প্রণাম করে বলল, "আসুন স্যার, ভিতরে আসুন। কতদিন পর আপনার সঙ্গে দেখা হল!"

যে মেয়েটি পৌঁছে দিতে এসেছিল, সে এবার চলে গেল। প্রশান্তর সঙ্গে তার ঘরে ঢুকলেন শরদিন্দু।

সুন্দরভাবে সাজানো ঘর। চারপাশে বইয়ের আলমারি, দেওয়ালে ঝুলছে ল্যান্ডস্কেপ। ঘরের ঠিক মাঝখানে, কার্পেটের উপর একটা টেবল ঘিরে সোফাসেট। শরদিন্দু সোফায় বসার প্রশান্ত জিজ্ঞেস করল, "আগে বলুন, স্যার, কী খাবেন? আপনি যে এসেছেন, ঠিক বিশ্বাসই হচ্ছে না! জানেন, মাঝে মাঝেই আপনার কথা মনে হয়। কতদিন ভেবেছি, আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাব। কিন্তু এই সাত-আটমাসে হয়ে ওঠেনি। নতুন নার্সিংহোম তো, অন্য ডাক্তারদের এখানে বসানোর ব্যবস্থা করা, অপারেশন থিয়েটারের ব্যবস্থা, ম্যানেজমেন্টের কাজ, সব মিলিয়ে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে আছি।"

শরদিন্দু হেসে বললেন, "তুমি এখন কতবড় ডাক্তার! কাজের চাপ তো থাকবেই। তোমার কথা আমি অনেককে বলি। তোমরাই তো আমার গর্ব।"

প্রশান্তও এবার হাসল। বলল, "দাঁড়ান, আপনার সঙ্গে একজনের পরিচয় করিয়ে দিই।"

পাশের ঘরে ঢুকে একটি বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে ফিরে এল প্রশান্ত, শরদিন্দুকে বলল, "এই যে আমার মেয়ে, তিতাস," তারপর শরদিন্দুকে দেখিয়ে মেয়ের উদ্দেশে বলল, "ইনি আমার মাস্টারমশাই, প্রণাম করো।"

সে প্রণাম করল শরদিন্দুকে। তিনি তার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, "বাবার মতো বড় হও মা। কোন ক্লাসে পড়ো?"

তিতাস বলল, "ফাইভে।"

পাশ থেকে প্রশান্ত বলল, "ও কিন্তু একদম পড়াশোনা করতে চায় না। সারাদিন কার্টুন দেখে আর কম্পিউটারে গেম খেলে। ওকে একটু বুঝিয়ে বলুন তো! সন্ধের পর ফিরে আমি পড়াতে বসাই। সপ্তাহে তিনদিন একজন মিস আসেন, তাই পড়তে বসে।"

শরদিন্দু হেসে বললেন, "ও তো তোমারই মেয়ে। দেখবে, আর-একটু বড় হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। জেনেটিক্সের ব্যাপার তুমি আমার চেয়ে ভাল বোঝো।"

মেয়েটা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল শরদিন্দুকে। প্রশান্ত মুখোমুখি একটা সোফায় বসে বলল, "বলুন স্যার, আপনি কেমন আছেন? অর্ধেন্দুস্যার, বিধানস্যাররাই বা কেমন আছেন? স্কুলের খবর কী?"

শরদিন্দু জবাব দিলেন, "ওঁরা দু'জনেই রিটায়ার করেছেন। আর কয়েকমাস পর আমিও রিটায়ার করব। পুরনোদের মধ্যে আমি ছাড়া ভানুবাবু, অধীরবাবু

BanglaBook.org

আর সুনির্মলবাবু এখনও আছেন। ওঁদের রিটায়ারমেন্ট আমাদের পরপরই। স্কুলে নতুন বিল্ডিং হয়েছে। ছাত্রসংখ্যাও বেড়েছে।"

গল্পগুজবে কাটল কিছুক্ষণ।

শরদিন্দু এরপর বললেন, "আমি এমনি ঠিকই আছি। শরীরও ঠিকই আছে। তবে একটা সমস্যা হচ্ছে। তাই তোমাকে দেখাতে এলাম।"

"কী সমস্যা?"

"আমার ডানহাতের কবজিটা মনে হয় ঠিকঠাক ঘুরছে না। ব্যথাট্যথা নেই, চোট লেগেছে বলেও খেয়াল হচ্ছে না," বলে শরদিন্দু তার ডানহাত বাড়িয়ে দিলেন সামনের দিকে।

প্রশান্ত বলল, "ঠিক মতো ঘুরছে না? দেখি, আপনি একবার কবজিটা ঘোরান তো?"

শরদিন্দু পাঞ্জাবির হাতাটা একটু গুটিয়ে প্রশান্তর কথামতো কবজিটা ঘোরালেন। প্রশান্ত এরপর তাঁর হাতটা টেনে নিয়ে মোচড় দিয়ে কিছুক্ষণ দেখল। তারপর কবজি আর হাতের পাতা টিপতে টিপতে বলল, "কই, তেমন কিছু তো বোঝা যাচ্ছে না! কখনও কখনও হচ্ছে?"

শরদিন্দু বললেন, "এমনিতে কবজি ঘোরালে বা মোচড় দিলে বোঝা যাচ্ছে না। তবে..."

"তবে কী?"

"দু'দিন আগে ক্লাসে একটা ছেলের খাতায় কম্পাস দিয়ে বৃত্ত এঁকে দেখাতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু কব্জিটা অর্ধেক ঘুরে আর ঘুরল না। বারবারই অর্ধবৃত্ত হয়ে রইল। বাড়িতে ফিরেও বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেছি, আজও করেছি। ওই একই ব্যাপার ঘটছে।"

প্রশান্ত হালকাভাবে বলল, "সে কী, স্যার! আপনি বৃত্ত আঁকতে পারছেন না? জানেন, আপনি কম্পাস ছাড়াই চক দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে এত সুন্দর বৃত্ত আঁকতেন যে, আড়ালে আমরা আপনাকে 'বৃত্তস্যার' বলতাম। আপনার ওই নিখুঁত বৃত্ত আঁকার কথা, এডিনবরায় আমার সহপাঠীদেরও শুনিয়েছি," কথা বলতে বলতে সে এগিয়ে এল শরদিন্দুর দিকে, "একটা কম্পাস থাকলে বুঝতে পারতাম যে, আপনার কবজিটা ঠিক কোন ডাইমেনশনে লক হয়ে যাচ্ছে।"

প্রশান্তর মেয়ে তিতাস এতক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। এবার

BanglaBook.org

সে বলল, "আমার কাছে কম্পাস আছে, আমি আনছি।"

ঘর থেকে কম্পাস, পেন্সিল আর খাতা এনে টেব্‌লে রেখে শরদিন্দুর দিকে উৎসুক চোখে তাকিয়ে রইল তিতাস।

শরদিন্দু কম্পাসটা তুলে নিলেন। সাদা খাতায় তিনি বৃত্ত আঁকতে পারেন কি না দেখার জন্য প্রশান্ত আর তার মেয়ে তাকিয়ে রয়েছে। শরদিন্দুর মনে হল, এটাও যেন একটা ক্লাসরুম!

তিনি খাতার মাঝখানে কাঁটা বসিয়ে কম্পাস ঘোরালেন। অর্ধেক ঘুরে আটকে গেল হাত। বেশ কয়েকবার চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু কোনওটাই বৃত্ত হল না। খাতা জুড়ে ফুটে উঠল সারসার বিভিন্ন মাপের অর্ধবৃত্ত।

প্রশান্ত ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল শরদিন্দুর কম্পাস ধরা হাতের দিকে। তিতাসের দৃষ্টিও তাঁর হাতের উপর নিবদ্ধ, তার মুখে ফুটে উঠেছে স্পষ্ট কৌতূকের ভাব। শেষপর্যন্ত প্রশান্ত শরদিন্দুর হাত ধরে ক'টা বৃত্ত আঁকাল। ঠিক যেভাবে শরদিন্দু ক্লাসের বাচ্চাদের বৃত্ত আঁকা শেখান। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, "কবজি তো ঘুরছে বলেই মনে হল! আপনাকে কয়েকটা এক্স রে করাতে হবে। আমিই সব ব্যবস্থা করে দেব। দেখি, কী আসে। দুটো কারণে ব্যাপারটা হতে পারে। একটা নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম, আর-একটা হল..." কথাটা শেষ করল না প্রশান্ত।

একটা লোক ঘরে ঢুকে দুটো প্লেটে শরদিন্দুর সামনে চা-বিস্কুট দিয়ে গেল।

শরদিন্দু বললেন, "হ্যাঁ, তুমি আর-একটা কী বলছিলেন যেন?"

প্রশান্ত হেসে বলল, "আপনাকে আর এই ব্যাপার নিয়ে ভাবতে হবে না, স্যার। আগে রিপোর্টগুলো তৈরি হোক। আমি তো আছিই।"

শরদিন্দু মিষ্টির প্লেটটা তুলে নিয়ে বাচ্চাটার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "আমার আগে তোমাকে খেতে হবে কিন্তু। নাও..."

মেয়েটা তাকাল তার বাবার মুখের দিকে।

শরদিন্দু তার উদ্দেশে বললেন, "বাবা বকবে না। আমি তোমার বাবার মাস্টারমশাই। বাবা বকলে আমি বাবাকে বকে দেব।"

তিতাস তাঁর কাছে এসে দাঁড়িয়ে প্লেট থেকে একটা মিষ্টি তুলে নিল। শরদিন্দুও একটা মিষ্টি মুখে দিলেন। তাঁর মাথায় এবার একটা প্ল্যান এল। ফিজের টাকা নিশ্চয়ই নিতে চাইবে না প্রশান্ত। যদি সেটা অন্যভাবে দেওয়া

BanglaBook.org

যায়? তা ছাড়া, বাচ্চাটাকেও কিছু দেওয়া উচিত তাঁর। শরদিন্দুর পকেটে একটা খাম আছে। তাতে যা টাকা আছে, তা প্রশান্তর ফিজ়ের চেয়ে বেশি। একসঙ্গে দুটি কাজ সারার উদ্দেশে শরদিন্দু, প্রশান্তর মেয়েকে বললেন, "তোমার নাম তো তিতাস? জানো, ওই নামে একটা নদী আছে?"

মেয়েটা বলল, "হ্যাঁ, জানি। বাবা বলেছে।"

শরদিন্দু এরপর খামটা বের করে তিতাসের হাতে দিয়ে বললেন, "এটা তুমি রাখো, বাবা-মাকে বোলো, তোমার পছন্দমতো কিছু কিনে দিতে।"

প্রশান্ত বলল, "ও কী করছেন, স্যার! ওকে টাকা দিচ্ছেন কেন?"

শরদিন্দু জবাব দিলেন, "এটা কিছু না। তোমার যে মেয়ে আছে তা আগে জানলে আমিই কিছু কিনে আনতাম। তোমার খেয়াল আছে, আমি তোমাদের ছোটবেলায় টিফিন পিরিয়ডে ডেকে আলুকাবলি, ঝালমুড়ির পয়সা দিতাম? এখনও অনেককে দিই।"

প্রশান্ত হেসে ফেলে বলল, "হ্যাঁ স্যার, মনে আছে।"

তিতাস এবার হঠাৎ শরদিন্দুকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, টিফিনে স্কুলে কেউ দুষ্টুমি করলে তুমি তার আঙুল ভেঙে দাও?"

শরদিন্দু তিতাসের প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে তাকালেন তার দিকে। প্রশান্ত মেয়েকে ধমকে উঠে বলল, "কী উলটোপালটা প্রশ্ন করছ? তুমি এবার ঘরে গিয়ে পড়তে বোসো।"

তিতাস আর দাঁড়াল না। খামটা টেবিলে রেখে, ছলছল চোখে পাশের ঘরে চলে গেল।

সে চলে যাওয়ার পর প্রশান্ত একটু অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বলল, "আসলে, মাসখানেক আগে নার্সিংহোমে একটা কেস এসেছিল। কোন একটা স্কুলের ঘটনা যেন। টিফিনে দুষ্টুমি করার জন্য একজন টিচার, একটি মেয়েকে মারধর করেছিলেন। আঙুল ভেঙে গিয়েছিল বাচ্চাটার। ঘটনাচক্রে তিতাস তখন নীচে রিসেপশনের কাছে ছিল। বাচ্চাটাকে যখন এখানে আনা হয়, তখন ও তাকে দেখেছে। ওই জন্যই কথাটা বলে ফেলল। স্যার, আপনি প্লিজ় কিছু মনে করবেন না।"

শরদিন্দু জবাব দিলেন, "মনে করব কেন? শিশুরা যা দেখে, তার উপরই তো ধারণা তৈরি করে। ওর দোষ কোথায়?"

প্রশান্ত এরপর জানতে চাইল, "স্যার, আপনি কি এখন ক্লাসে ছাত্রদের

BanglaBook.org

মারেন? আমাদের সময় তো মারধর করতেন না।"

শরদিন্দু বললেন, "আমি কোনওকালেই ছাত্রদের গায়ে হাত দিতাম না। এখনও দিই না। একবারই এর ব্যতিক্রম ঘটেছিল। একজনকে চড় মেরেছিলাম আমি, হায়ার সেকেন্ডারির টেস্ট পরীক্ষার অঙ্কখাতা দেখাবার সময়। তুমি তো সেই ঘটনার সাক্ষী ছিলে। ওই ঘটনার জন্য আজও আমার অনুশোচনা হয়।"

শরদিন্দুর কথা শুনে প্রশান্তর মনে বহুদিনের পুরানো একটা ঘটনার ছবি ভেসে উঠল। আজও সেই ঘটনা পীড়া দেয় তাকে। কয়েকমুহূর্ত চুপ করে থেকে সে বলল, "আজকাল চারপাশে যা শুনি...

শরদিন্দু বললেন, "আমিও ব্যাপারটাকে সমর্থন করি না। তা ছাড়া, গাধা পিটিয়ে ঘোড়া বানানো যায় না। বরং ঘোড়াকে পেটালে তার গাধা হওয়ার আশঙ্কা থাকে।"

অস্বস্তিকর প্রসঙ্গটা নিয়ে আর আলোচনা করতে ইচ্ছে হল না শরদিন্দুর। তিনি প্রসঙ্গটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য বললেন, "তোমার স্ত্রী বাড়িতে নেই? তার সঙ্গে তো পরিচয় হল না।"

প্রশান্তর উজ্জ্বল চোখদুটো হঠাৎই কেমন নিষ্প্রভ হয়ে গেল। সে বলল, "ও তো এখানে থাকে না।"

"থাকে না মানে?"

প্রশান্ত মাথা নিচু করে টেব্‌লের দিকে তাকিয়ে বলল, "ও বাইরে, মানে, লন্ডনে থাকে। আমাদের ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে। আমি মেয়েকে নিয়ে ফিরে এসেছি।"

BanglaBook.org

॥ ৭ ॥

জায়গাটাকে লোকে বলে 'মা মনসার ঢিপি'। চাঁদ সওদাগরের ভয়ে মা মনসা নাকি একবার এই ঢিপির নীচে আত্মগোপন করেছিলেন। এই কাহিনির উৎস কী, তা সম্ভবত এই তল্লাটে কারও জানা নেই। আসলে জায়গাটা ধুতরো, আকন্দ আর পুটুশফুলের ঝোপে ভরা উঁচু জমি। ঘোড়ানিম, আঁশফল, শ্যাওড়া, তেঁতুল... বেশ কিছু গাছও আছে। শহর থেকে একটা রাস্তা এসে

শেষ হয়েছে ঢিপির সামনে। তার পিছনে একটা মজা খাল। আশপাশে কোনও বাড়িঘর নেই।

যে রাস্তাটা শহর থেকে এদিকে এসেছে, সে রাস্তায় শ্রাবণমাসেই জনসমাগম হয়। তখন মেলা বসে ওই চত্বরে। ঢিপিতে দুধকলা দিয়ে পুজো দিতে আসেন অনেকে। অন্যসময় এখানে আসার প্রয়োজন হয় না কারও। না, কেউ কেউ আসে। ঘুঘু-ডাকা দুপুরবেলায় ইতস্তত ছড়িয়ে থাকে কয়েকজোড়া নারী-পুরুষ। ঘন ঝোপঝাড় ছায়াও দেয়, আবার আবরুও রক্ষা করে। বাইরে থেকে কাউকে দেখা যায় না। অভ্র আর নীলা দু'জনেই আজ সাইকেল নিয়ে এসেছে। একটা পছন্দসই জায়গায় বসল দু'জনে। পিছনের ঝাঁকড়া আঁশফলগাছটা ঠান্ডা ছায়া দিচ্ছে। না হলে দুপুরের প্রচণ্ড রোদে বসা যেত না।

বসার পর নীলা ওড়না দিয়ে মুখের ঘাম মুছে বলল, "কী গরম, দেখেছ? এই কাঠফাটা রোদে সাইকেল চালানো যায়!"

অভ্র বলল, "তুমিই তো দুপুরে আসতে বললে। না হলে বিকেলেই আসতাম। আজ বিকেলে আমার টিউশন ছিল না।"

নীলা বলল, "আজ বিকেলে বেরোতে পারব না। কাল তো তোমার ইন্টারভিউ, তাই একটা জিনিস দিতে এলাম।"

"কী জিনিস?"

নীলা তার হ্যান্ডব্যাগ থেকে একটা ছোট প্যাকেট বের করল। অভ্র দেখল, তার ভিতরে রয়েছে কয়েকটা সন্দেশ আর নেতিয়ে যাওয়া একটা জবাফুল। প্যাকেট থেকে সন্দেশের টুকরো বের করে, সেটা অভ্রর মাথায় ঠেকিয়ে তার মুখের কাছে ধরে নীলা বলল, "নাও, খাও। সকালে সুবর্ণপুর কালীমন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম তোমার জন্য," তারপর জবাফুলটা অভ্রর হাতে দিয়ে বলল, "কাল ইন্টারভিউয়ে যাওয়ার সময় ফুলটা পকেটে নিয়ে যেয়ো।"

অভ্রর বলতে উচ্ছে করছিল, এই ফুলে কোনও কাজ হয় কি? বাবার মৃত্যুর আগে, আমার মা, আমার দু'বোন এরকম বহু ফুল কুড়িয়ে আনত মন্দির থেকে। কিন্তু বাবাকে ধরে রাখা যায়নি। এরকম বহু ফুল মাথায় ছুঁইয়ে আমাদের বাড়িতে পুজো করতে আসা ঠাকুরমশাই বলতেন, আমি বড় হব, আমার নাম হবে, যশ হবে। কিছুই তো হয়নি আমার।

ইচ্ছে হলেও কথাগুলো বলল না অভ্র। বললে নীলা কষ্ট পাবে। ফুলের

BanglaBook.org

ক্ষমতা সত্যি-মিথ্যে যাই হোক, নীলার ভালবাসা ষোলোআনা সত্যি। অভ্র সন্দেশটা খেয়ে নিল। কাগজের মোড়কে ঢেকে ফুলটাও পকেটে রাখল। তারপর বলল, "বিকেলে বেরোতে পারতে না কেন? নার্সিংহোমে ডিউটি আছে?"

একটু চুপ করে থেকে নীলা জবাব দিল, "না, ডিউটি নয়। আমাকে আজ দেখতে আসবে পাত্রপক্ষ। বউদি কোথা থেকে যেন সম্বন্ধটা এনেছে। পাত্রর বাড়ি এখানেই, পল্টনবাজারের ওদিকে। দাবিহীন পাত্র। শুনেছি, বেশ পয়সাকড়িও আছে।"

"তুমি না করে দিলে না কেন?" অভ্র জানতে চাইল।

"বউদি সম্বন্ধটা এনেছে। না বললে বাড়িতে তুমুল অশান্তি হত। এমনিতেই কাল রাতে বউদি দাদাকে বলছিল, 'নার্সিংহোমে রিসেপশনিস্ট, নার্স, আয়াদের সঙ্গে ডাক্তারদের ঢলাঢলি থাকে। ওই জন্যই হয়তো তোমার বোনের বিয়ের ব্যাপারে কোনও গা নেই। নিজের মেয়েরাও বড় হচ্ছে কিন্তু। যা দেখবে তাই শিখবে।' বউদির কথা শুনে দাদা বলল, 'আর কয়েকটা মাস দেখি। এভাবে চললে ওকে নিজের রাস্তা দেখে নিতে বলব। বাড়িটা বাবা আমাকে কাগজে-কলমে বেচে দিয়ে গিয়েছে। ওর আর অধিকার নেই এবাড়িতে,'" বিপন্নতার সুর স্পষ্ট ধরা দিল নীলার গলায়।

অভ্র বলল, "উপায় থাকলে আমি এখনই একটা ব্যবস্থা করে ফেলতাম। কিন্তু আমাদের বাড়িতে দুটো মাত্র ঘর, তাও আবার সত্তরবছরের পুরনো! ভালভাবে থাকার জায়গা নেই। নূপুর টুপুরের বিয়েরও যে কী হবে, কে যানে। দাদাও হাত তুলে নিয়েছে। আমার আর মায়ের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, বোনদুটোর যদি একটু দায়িত্ব নিত," একটু দম নিয়ে সে ফের বলল, "বাবা তখন প্রায় মৃত্যুশয্যায়। টাকাপয়সা একদম শেষ। আমি এমএসসি-তে ভরতি হতে পারলাম না, বাবার শেষ ডায়ালিসিসটাও পয়সার অভাবে করা যায়নি। সেসময় নূপুর একদিন ক্ষুব্ধ হয়ে বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি রিটায়ারমেন্টের সব টাকা বড়দার পিছনে ঢেলে দিয়েছিলে কেন? তোমার নিজের কথা, আমাদের কথা একবারও চিন্তা করলে না?'"

"উনি কী বলেছিলেন?" নীলা জানতে চাইল।

অভ্র বলল, "মায়ের মুখে পরে শুনেছি, বাবা বলেছিলেন, 'অভ্রটা ব্রিলিয়ান্ট, ও নিজের পায়ে একদিন ঠিক দাঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু অভিজিৎটা

BanglaBook.org

সাদামাঠা। তাই যখন শুনলাম, টাকা দিলে হোটেল ম্যানেজমেন্টটা পড়ানো যাবে, ভাল মাইনের চাকরি পাবে, টাকাটা দিয়ে দিলাম। ভেবেছিলাম, আমার পেনশন না থাকলেও, যে নতুন কোম্পানিতে ঢুকছি, তাতে অন্তত বছরপাঁচেক চাকরি করতে পারব। ততদিনে অভিজিৎ মোটা টাকার চাকরি পাবে, অভ্রও দাঁড়িয়ে যাবে। ওরা দু'ভাই আমাদের সকলের ভার নেবে। অভিজিৎ বড় চাকরি পেল ঠিকই। কিন্তু..' আসলে যে সুন্দর সংসারের ছবি বাবা মনে মনে এঁকেছিলেন, সেটা আধখানা হয়েই থেমে গেল। অসুখটা মাঝপথে সবকিছু থামিয়ে দিল। পরদিনই বাবার কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারপর আর দিনদশেক বেঁচে ছিলেন। জীবনে টাকা একটা বড় নির্দেশকের ভূমিকা পালন করে। বাবার টাকা ছিল বলেই দাদা আজ সিঙ্গাপুরে অতবড় চাকরি করছে। আবার বাবার টাকা ছিল না বলেই তাঁর চিকিৎসা শেষপর্যন্ত ভাল করে করা গেল না, আমি ইউনিভার্সিটিতে ভরতি না হয়ে সংসার চালাতে খাতালেখার কাজ আর টিউশন ধরলাম। যারা আজ তোমাকে দেখতে আসছে, সে লোকটার টাকা আছে বলেই সে পাত্রী দেখতে আসছে আর তোমার টাকা নেই বলেই ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে," একটানা কথাগুলো বলে চুপ করে গেল অভ্র।

নীলাও চুপ করে রইল।

নিঝুম দুপুর। মাঝে মাঝে কোথা থেকে একটা তক্ষক ডেকে উঠছে। চারপাশে শব্দ বলতে শুধু ওটুকুই।

বেশ কিছুক্ষণ পর নীলা বলল, "ছাড়ো এসব। ইন্টারভিউয়ের কোনও খবরটবর পেলে? নীহারবাবু কিছু বলেছেন?"

অভ্র জবাব দিল, "উনি টেলিফোনে টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি রসময়বাবুকে আমার সামনেই বললেন। তাঁর সঙ্গে নাকি স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারির কথা হয়েছে। উনি নাকি রসময়বাবুকে বলেছেন যে, নীহার চৌধুরী যখন আমার কথা বলেছেন, তখন তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। এক্সপার্ট হিসেবে যিনি ইন্টারভিউ নিতে আসছেন, তিনিও পার্টিরই লোক। তাঁকে নিয়ে সমস্যা নেই। তবে একটাই আশঙ্কা, প্রেসিডেন্ট কোনও গন্ডগোল পাকাতে পারে।"

"কেন, সে গন্ডগোল পাকাবে কেন?"

"প্রেসিডেন্ট নাকি পার্টিরই আর-এক নেতা অসীম রুদ্রর লোক। সে

BanglaBook.org

নীহারবাবুর বিরোধী গোষ্ঠীর। তাই সে চেষ্টা করবে আমার যাতে না হয়। গ্রুপবাজি সব জায়গায় রয়েছে!"

"কিন্তু তুমি তো কোনও রাজনীতি করো না বা গোষ্ঠীর সদস্য নও, তা হলে অসীম রুদ্র লোকটা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে কেন? তার কি নিজের কোনও ক্যান্ডিডেট আছে?"

অভ্র বলল, "নিজের ক্যান্ডিডেট আছে কি না, জানি না। সুবীর বলছিল, পার্টিতে এটাই নাকি এখন দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে। কে ক্যান্ডিডেট সেটা বড় কথা নয়, কার ক্যান্ডিডেট সেটাই বড় কথা। পছন্দমাফিক স্বতঃস্ফূর্ত এবং নিঃশর্ত সমর্থন বা বিরোধিতা! তবে সুবীর বলেছে, হয়তো শেষপর্যন্ত আমার কপালেই শিকে ছিঁড়ে যাবে। কিন্তু..."

"কিন্তু কী?"

অভ্র বলল, "ধরে নিলাম, কাজটা শেষপর্যন্ত পেলাম। শুনেছি, মোট তিরিশজন প্রার্থী রয়েছে। আমার অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার যতই ভাল হোক, আমার চেয়েও ভাল কেউ থাকতে পারে। আমার হওয়া মানে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও একজন সুযোগ পাবে না। শুধু আমি নীহার চৌধুরীর কাছে পৌঁছোতে পেরেছি, আর সে পারেনি বলে। আমার জন্য অন্যজন কি বঞ্চিত হল না?"

নীলা বলল, "চারপাশে এখন এই নিয়মই চলছে। সারভাইভ্যাল অফ দ্য ফিটেস্ট থিয়োরিতে বিশ্বাসী হলে তোমার এতটা খারাপ লাগবে না।"

অভ্র বলল, "সারভাইভ্যাল অফ দ্য ফিটেস্ট, না মাৎসন্যায়? যার শক্তি বেশি, সে অন্যকে গিলে খাচ্ছে।"

নীলা অস্পষ্টভাবে বলল, "জানি না," তারপর হয়তো এই প্রসঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসার জন্যই বলল, "জানো, তোমার শরদিন্দুস্যার কাল সন্ধেবেলা নার্সিংহোমে স্যারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। স্যার তখন পেশেন্ট দেখে উপরে উঠে গিয়েছেন। আমিই ইনিশিয়েটিভ নিয়ে ওঁকে স্যারের কাছে পৌঁছে দিলাম।"

"কেন, স্যারের কিছু হয়েছে কি?"

নীলা প্রথমে জবাব দিল, "হাতে কিছু হয়েছে মনে হয়। কাল সকালে আসবেন এক্স রে, আর কয়েকটা টেস্ট করাতে," তারপর মৃদু হেসে যোগ করল, "জানো, স্যারের মেয়ে তিতাস কী বলছিল? বলছিল, তোমাদের শরদিন্দুস্যার নাকি ওর বাবার কাছে জ্যামিতি শিখতে এসেছিলেন!

BanglaBook.org

শরদিন্দুস্যার বৃত্ত আঁকতে পারছেন না, তিতাসের বাবা নাকি ওর কম্পাস দিয়ে তাঁর হাত ধরে বৃত্ত আঁকা শিখিয়েছেন! বোঝো একবার, ওইটুকু মেয়ে কী সুন্দর গল্প বানিয়ে ফেলল!"

অভ্রও গল্পটা শুনে হেসে বলল, "স্যার শুধু চক দিয়ে এত সুন্দর বৃত্ত আঁকতেন যে, দেখে মনে হত, কম্পাস ফেলে আঁকা হয়েছে। স্যার একদিন বৃত্ত নিয়ে একটা সম্পাদ্য করাতে গিয়ে বলেছিলেন, 'বৃত্ত পূর্ণতার প্রতীক, যা প্রতিটি মানুষের জীবনে প্রয়োজন।' কথাটা আমার আজও মনে আছে।"

নীলা বলল, "আচ্ছা, আমি স্যারকে দিয়ে তোমার ব্যাপারটা শরদিন্দুবাবুকে বলিয়ে দেখব?"

"কী বলবে? আমি তোমার কে হই? সত্যি কথা বলতে পারবে?"

নীলা অভ্রর চোখে চোখ রেখে বলল, "সত্যি কথা বললে যদি তোমার কাজ হয়, তা হলে তাই বলব।"

একটু ভেবে অভ্র বলল, "না, শরদিন্দুস্যারকে এই ব্যাপারে জড়িয়ো না। ইদানীং চারপাশে যা ঘটছে, তাতে মাস্টারদের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ক্রমশ কমে আসছে। একটা মানুষ অন্তত থাক..." চুপ করে গেল অভ্র।

নীলা সালোয়ারের কামিজটা একটু তুলে মুখের ঘাম মুছল। ক্ষণিকের জন্য তার ফরসা পেটের উপর চোখ পড়ল অভ্রর। গভীর নাভি, কোমরের একটু উপরে একটা কালো সুতো বাঁধা। পৃথিবীকে ছেদ করে চলে যাওয়া বিষুবরেখার মতো তার নাভির ঠিক মাঝখান দিয়ে চলে গিয়েছে সুতোটা। একটা পিঁপড়ে থাই বেয়ে উঠে এগোচ্ছে সেদিকে। নীলা বুঝতে পারল, অভ্রর দৃষ্টি কোথায় নিবদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে সে কামিজটা নামিয়ে বলল, "কী দেখছ?"

অভ্র বলল, "ওই যে ওখানে... একটা পিঁপড়ে..."

নীলা পিঁপড়েটাকে একটা টোকায় ফেলে দিয়ে বলল, "পিঁপড়ে না ছাই! তুমি অন্য জিনিস দেখছিলে!"

"কী জিনিস?"

"তা তুমিই জানো। নজর ঠিক করো, তুমি না মাস্টার হতে চলেছ?" নীলা মুখ টিপে বলল।

অভ্র বলল, "কেন, মাস্টার হলে কি অন্য প্রবৃত্তিগুলো মুছে যায়?"

নীলা বলল, "একটু আগেই তো তুমি বললে, 'ইদানীং চারপাশে যা ঘটছে, তাতে মাস্টারদের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ক্রমশ ক্ষয়ে আসছে।'"

BanglaBook.org

অভ্র বলল, "সেটা এসবের জন্য নয়। প্রফেশন্যাল এথিক্সের ক্ষয়ই এর জন্য দায়ী। ব্যক্তিগত ব্যাপারে কার কী বলার আছে?"

নীলা বলল, "তবে যে যাই বলুক, বাচ্চাদের মারধর করাটা কিন্তু খুব বাজে ব্যাপার। তিতাসকে দেখে এক-একসময় খুব কষ্ট হয়।"

"কেন?"

নীলা একটু চুপ করে থেকে বলল, "তিতাস স্কুলে যায় না। স্যার একটা স্কুলে ভরতি করিয়ে রেখেছেন ঠিকই, কিন্তু ও যেতে চায় না। ও আগে যে স্কুলে পড়ত, সেখানে কী একটা দুষ্টুমি করায় এক দিদিমণি তিতাসের আঙুলের ফাঁকে পেনসিল ঢুকিয়ে এমন চাপ দিয়েছিল যে, একটা আঙুল ভেঙে গিয়েছিল। আঙুলটা ঠিক হয়ে গিয়েছে ঠিকই। কিন্তু ভয়টা এখনও ওকে তাড়া করে বেড়ায়। এখন একজন মিস বাড়িতে আসেন, তাঁর কাছেই ও পড়াশোনা করে।"

"ডাক্তারবাবু ওই দিদিমণির বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেননি?"

নীলা বলল, "না, নেননি। আসলে উনি শিক্ষকদের খুব রেসপেক্ট করেন। স্যার একসময় খুব গরিব ছিলেন। ঠিকভাবে লেখাপড়া করারও সামর্থ্য ছিল না। সেসময় তোমাদের শরদিন্দুস্যার ও স্কুলের আরও কয়েকজন স্যার ওঁকে বইপত্র কিনে দিতেন, নানাভাবে সাহায্য করতেন। স্যার নিজেই একদিন এসব গল্প নার্সিংহোমের স্টাফদের কাছে করছিলেন। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি শ্রদ্ধাবশতই সম্ভবত তিনি সেই দিদিমণির বিরুদ্ধে কোনও স্টেপ নেননি। তিতাসকে শুধু ওই স্কুল ছাড়িয়ে নতুন স্কুলে ভরতি করেছিলেন।"

আরও কিছুক্ষণ এলোমেলো কথাবার্তার পর নীলা জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, যদি তোমার কাজটা হয়, তা হলে জয়েন করতে কতদিন লাগবে?"

অভ্র জবাব দিল, "ইন্টারভিউ হওয়ার পর আরও মাসখানেক। স্কুলে যেদিন অ্যাপ্লিকেশন জমা দিতে গিয়েছিলাম, সেদিনই শুনেছিলাম, চট করে কিছু হবে না। ইন্টারভিউ হবে, তারপর ম্যানেজিং কমিটির মিটিং ডেকে প্যানেল পাশ করিয়ে, সেটা পাঠিয়ে দিতে হবে ডিস্ট্রিক্ট ইনস্পেক্টরের অফিসে। তিনি কাগজপত্র, ইন্টারভিউ প্রসিডিয়োর, সব ঠিক আছে কি না দেখে নিয়ে নির্দেশ দিলে, তারপর লোক নেওয়া যাবে।"

নীলা কোনও উত্তর না দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। অভ্রও

BanglaBook.org

অভ্র বলল, "সেটা এসবের জন্য নয়। প্রফেশন্যাল এথিক্সের ক্ষয়ই এর জন্য দায়ী। ব্যক্তিগত ব্যাপারে কার কী বলার আছে?"

নীলা বলল, "তবে যে যাই বলুক, বাচ্চাদের মারধর করাটা কিন্তু খুব বাজে ব্যাপার। তিতাসকে দেখে এক-একসময় খুব কষ্ট হয়।"

"কেন?"

নীলা একটু চুপ করে থেকে বলল, "তিতাস স্কুলে যায় না। স্যার একটা স্কুলে ভরতি করিয়ে রেখেছেন ঠিকই, কিন্তু ও যেতে চায় না। ও আগে যে স্কুলে পড়ত, সেখানে কী একটা দুষ্টুমি করায় এক দিদিমণি তিতাসের আঙুলের ফাঁকে পেনসিল ঢুকিয়ে এমন চাপ দিয়েছিল যে, একটা আঙুল ভেঙে গিয়েছিল। আঙুলটা ঠিক হয়ে গিয়েছে ঠিকই। কিন্তু ভয়টা এখনও ওকে তাড়া করে বেড়ায়। এখন একজন মিস বাড়িতে আসেন, তাঁর কাছেই ও পড়াশোনা করে।"

"ডাক্তারবাবু ওই দিদিমণির বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেননি?"

নীলা বলল, "না, নেননি। আসলে উনি শিক্ষকদের খুব রেসপেক্ট করেন। স্যার একসময় খুব গরিব ছিলেন। ঠিকভাবে লেখাপড়া করারও সামর্থ্য ছিল না। সেসময় তোমাদের শরদিন্দুস্যার ও স্কুলের আরও কয়েকজন স্যার ওঁকে বইপত্র কিনে দিতেন, নানাভাবে সাহায্য করতেন। স্যার নিজেই একদিন এসব গল্প নার্সিংহোমের স্টাফদের কাছে করছিলেন। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি শ্রদ্ধাবশতই সম্ভবত তিনি সেই দিদিমণির বিরুদ্ধে কোনও স্টেপ নেননি। তিতাসকে শুধু ওই স্কুল ছাড়িয়ে নতুন স্কুলে ভরতি করেছিলেন।"

আরও কিছুক্ষণ এলোমেলো কথাবার্তার পর নীলা জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, যদি তোমার কাজটা হয়, তা হলে জয়েন করতে কতদিন লাগবে?"

অভ্র জবাব দিল, "ইন্টারভিউ হওয়ার পর আরও মাসখানেক। স্কুলে যেদিন অ্যাপ্লিকেশন জমা দিতে গিয়েছিলাম, সেদিনই শুনেছিলাম, চট করে কিছু হবে না। ইন্টারভিউ হবে, তারপর ম্যানেজিং কমিটির মিটিং ডেকে প্যানেল পাশ করিয়ে, সেটা পাঠিয়ে দিতে হবে ডিস্ট্রিক্ট ইনস্পেক্টরের অফিসে। তিনি কাগজপত্র, ইন্টারভিউ প্রসিডিয়োর, সব ঠিক আছে কি না দেখে নিয়ে নির্দেশ দিলে, তারপর লোক নেওয়া যাবে।"

নীলা কোনও উত্তর না দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। অভ্রও

BanglaBook.org

তাকাল সেদিকে। অর্ধবৃত্তাকার ধূসর আকাশে একটা ঘুড়ি উড়ছে। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে নীলা বলল, "চারটে বেজে গিয়েছে। চলো, এবার উঠতে হবে। ইন্টারভিউটা ভাল করে দিয়ো।"

॥ ৮ ॥

"বারো নম্বর, অনির্বাণ মজুমদার?"

রিসেপশনে বসা মেয়েটার গলা কানে যেতেই তিথি উঠে দাঁড়াল।

মেয়েটা তিথির দিকে তাকিয়ে বলল, "ম্যাডাম, এবার আপনার পেশেন্ট নিয়ে যান।"

অনির্বাণ এতক্ষণ তিথির পাশে বসে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সিলিং-এর দিকে। তিথি তার হাতে মৃদু টান দিয়ে 'ওঠো' বলতেই, সে যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো উঠে দাঁড়াল।

রিসেপশনিস্ট মেয়েটা তাদের উদ্দেশে বলল, "ধরতে হবে?"

তিথি মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল, প্রয়োজন নেই। একহাতে প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগে অনির চিকিৎসার কাগজপত্র, আর অন্য হাতে তাকে ধরে তিথি এগিয়ে গেল ডাক্তারবাবুর চেম্বারের দিকে।

টেব্‌লের ওপাশে বসে আলোর দিকে ফিরে একটা এক্স রে প্লেট দেখছিল প্রশান্ত। তিথিদের ঘরে ঢোকার শব্দ শুনে প্লেটের দিকে চোখ রেখেই সে বলল, "বসুন।"

টেব্‌লের এপাশে রাখা দুটো চেয়ারের একটায় অনির্বাণকে বসাল তিথি। ঘরটা ছোট, টেব্‌লের একপাশে পেশেন্ট দেখার জন্য একটা উঁচু বেড। ঘরের কোণে বেসিন, দেওয়ালে ঝুলছে মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ডায়াগ্রাম, ওষুধের বিজ্ঞাপন। ঘরটা আর পাঁচটা ডাক্তারের চেম্বারের মতোই। তিথি একবার চোখ বুলিয়ে নিল ঘরটার চারদিকে।

প্রায় আধমিনিট কেটে গেল। তিথিদের উপস্থিতি সম্পর্কে প্রশান্তর কোনও খেয়ালই যেন নেই। হাতে ধরা এক্স রে প্লেটটা তন্ময় হয়ে দেখে চলেছে সে। তিথি ক্যারিব্যাগ থেকে অনির্বাণের কাগজগুলো বের করে টেব্‌লের উপর রাখল। ক্যারিব্যাগ-কাগজের খসখস শব্দ হল নিঃস্তব্ধ ঘরে। তবু প্রশান্তর

BanglaBook.org

ভ্রূক্ষেপ নেই। কবজি-সহ একটা হাতের এক্স রে প্লেটের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে সে।

হঠাৎ অনির্বাণ বলে উঠল, "মিলবে না, মিলবে না। কিছুতেই মিলবে না!"

কথাটা কানে যেতেই প্রশান্ত চমকে পিছনে ফিরল।

অনির্বাণের দিকে তাকাতেই তার মুখে ফুটে উঠল অপার বিস্ময়। অস্পষ্টস্বরে প্রশান্ত বলে উঠল, "অনি, তুই..."

অনির্বাণ কোনও উত্তর দিল না। ঘাড়টা একটু বেঁকিয়ে টেব্‌লের উপর রাখা একটা পেপারওয়েটের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। প্রশান্তও একইভাবে তাকিয়ে রইল তার দিকে। তিথি বেশ অবাক হয়ে গেল, ডাক্তারবাবু অনিকে চিনলেন কীভাবে?

বেশ কয়েকমুহূর্ত পর প্রশান্ত তিথির দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি কি ওর স্ত্রী?"

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল তিথি। তারপর শান্ত গলায় পালটা প্রশ্ন করল, "আপনি ওকে চেনেন?"

মুহূর্তখানেক চুপ করে থেকে প্রশান্ত বলল, "ও আমার ক্লাসমেট ছিল। বন্ধু ছিলাম আমরা। ও ক্লাসে ফার্স্ট হত, আমি সেকেন্ড। কী হয়েছে ওর? কবে থেকে?"

তিথি জবাব দিল, "মাথাটা কেমন গোলমাল করছে... প্রায় একবছর হতে চলল। একদিন বিকেলে অফিস থেকে ফিরে হঠাৎ কাগজপত্র নিয়ে লিখতে বসল আর তারপরই হঠাৎ বলতে শুরু করল, 'মিলবে না, মিলবে না। কিছুতেই মিলবে না।' প্রথমে আমি তেমন আমল দিইনি। কিন্তু দু'দিন পরই অফিস যাওয়া বন্ধ করে দিল। সারাদিন কাগজ-পেন নিয়ে বসে নানা হিসেব কষে আর একই কথা বলে। কোনও কথার জবাব দেয় না। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড জোরে মাথা ঝাঁকায়। ইদানীং ওর ঘাড়টাও কেমন বেঁকে যাচ্ছে। সরকারি হাসপাতালের এক সাইকায়াট্রিস্ট ওকে দেখেন। উনি ঘাড়ের জন্য কোনও নিউরোলজিস্টকে দেখানোর কথা বলেন। সরকারি হাসপাতালে নিউরোলজিস্ট নেই, তাই আপনার কাছে এলাম," একটানা কথাগুলো বলে অনির প্রেসক্রিপশনগুলো এগিয়ে দিল তিথি।

প্রশান্ত কাগজগুলো নিয়ে প্রশ্ন করল, "কোথায় চাকরি করত ও?"

BanglaBook.org

তিথি জবাব দিল, "একটা ব্যাঙ্কে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, ওখানে কিছু হয়নি। সব হিসেব মিলিয়েই বাড়ি ফিরেছিল ও। ব্যাঙ্কেরও কোনও অভিযোগ নেই। ইচ্ছে করলে আপনি খোঁজ নিতে পারেন।, 'মিলছে না, মিলবে না' কথাগুলো আমি আগে ওর মুখে কোনওদিন শুনিনি। দশবছর হল আমাদের বিয়ে হয়েছে।"

ব্যাঙ্কে যে কিছু হয়নি, তা ইচ্ছে করেই জানাল তিথি। কারণ, ব্যাঙ্কে চাকরি করতে করতে মাথাখারাপ হয়ে গিয়েছে শুনলে অনেকেরই ধারণা হয় যে, সংশ্লিষ্ট লোকটি নিশ্চয়ই টাকাপয়সা সংক্রান্ত কোনও গোলমেলে ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিল। এর আগে কয়েকজন ডাক্তার তিথির কাছে একই কথা ঘুরিয়েফিরিয়ে জানতে চেয়েছেন। ব্যাপারটা নিয়ে আত্মীয়স্বজনের ফিসফাসও তিথির কানে এসেছে। কারও কারও ধারণা, ব্যাঙ্কের ক্যাশ মেলাতে না পেরে অনি চাকরি আর তার ফলে মানসিক ভারসাম্য খুইয়েছে!

তিথির কথা শুনে অনির্বাণের মুখের দিকে ফের তাকাল প্রশান্ত। তার চোখের সামনে অনির মুখটা। ঘরটা ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। একটা ক্লাসরুম, মুখোমুখি দুটো বেঞ্চে বসে আছে প্রশান্ত আর অনির্বাণ। ঘাড় গুঁজে একটা খাতায় অঙ্ক কষছে অনি। পাশে টেস্ট পরীক্ষার অঙ্কখাতার বান্ডিল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন শরদিন্দুস্যার। তিনি অনিকে বলছেন, "আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, এই অঙ্কটা তুমি ভুল করবে! ফেল করা ছেলেরা পর্যন্ত এই অঙ্কটা ঠিক করেছে! এখনও দু'বার কষতে দিলাম, তুমি দু'বারই ভুল করলে। তুমি অঙ্কে দুশোতে একশো পঁচানব্বই পাচ্ছ, আর এই সাধারণ অঙ্কটা পারছ না! দুটো ব্যাপার একসঙ্গে সত্যি হতে পারে না!"

একটু আগে হায়ার সেকেন্ডারির টেস্ট পরীক্ষার অঙ্কখাতা দেখাচ্ছিলেন স্যার। খাতা দেখাবার পর অন্য ছাত্রদের বেরিয়ে যেতে বলে, তাদের দু'জনকে ঘরে বসিয়ে রেখেছেন তিনি, তাঁর দুই প্রিয় ছাত্রকে। প্রশান্তকে শরদিন্দুস্যার নিয়ে যাবেন হেডমাস্টারের ঘরে। অঙ্কে দুশোয় দুশো পেয়েছে সে। অঙ্কে হায়েস্ট মার্কস পাওয়া ছাত্রকে দুশো টাকা পুরস্কার দেবেন হেডমাস্টার। তার আগে শরদিন্দুস্যার, অনিকে সেই সহজ অঙ্কটা আবার কষতে দিয়েছেন। তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছেন না, কেন অঙ্কটা সে ভুল করল! তৃতীয়বারের জন্য খাতাটা স্যারের দিকে এগিয়ে দিল অনি। এবারও ভুল! স্যারের মুখ ক্রমশ লাল হয়ে উঠছে। শরদিন্দুস্যারকে এর আগে রাগতে দেখেনি ক্লাসের

BanglaBook.org

কেউ। অথচ অঙ্কটা ভুল করার জন্য কোনও অনুতাপও নেই অনির। তার মুখে স্পষ্ট একটা হাসির ছাপ। স্কুলের সকলকে শরদিন্দু বলেছিলেন, "প্রশান্ত হয়তো পারে, কিন্তু অনির্বাণ অঙ্কে দুশোয় দুশো পাবেই। না পেলে বুঝব, এতদিন মাস্টারি করেও ছাত্র চিনতে পারিনি আমি।"

কাগজটা দেখে, বেঞ্চে ছুড়ে ফেলে শরদিন্দুস্যার উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন, "এবারও মেলাতে পারলে না? আবার করো। যতক্ষণ না মেলাতে পারছ, ততক্ষণ তোমাকে ছাড়ব না!"

স্যার উত্তেজিত হয়ে উঠছেন দেখেও অনির কোনও হেলদোল নেই। বরং তার মুখে একটা হাসি খেলা করছে। সে কাগজটা হাতে নিয়ে স্যারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, "মিলবে না। অঙ্কটা আবার করলেও এখন মিলবে না স্যার।"

"মিলবে না মানে?"

অনির চাঁছাছোলা জবাব, "মিলবে না মানে, মিলবে না। আমি এখন যাচ্ছি স্যার।"

"কোথায় যাচ্ছ তুমি? কেন মিলবে না?" চিৎকার করে উঠলেন শরদিন্দুস্যার। তাঁর শরীর থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে। প্রশান্তর মনে হচ্ছে, এবার কিছু একটা ঘটতে চলেছে! সে বলতে চাইল, অঙ্কটা ও জানে, স্যার। যাতে আমি অঙ্কে হায়েস্ট পাই, টাকা পাই, সেই জন্যই ও... কথাটা বলতে গিয়েও প্রশান্ত বলেনি। পরদিনই হায়ার সেকেন্ডারির ফর্ম ফিলআপ। ওই টাকাটা পেলে...

অনি এবার বেশ জেদের সঙ্গেই বলল, "বললাম তো, মিলবে না। আমি মেলাব না। আপনি হাজারবার বললেও না!"

হতাশা-বেদনা-অপমান সইতে না পেরে শরদিন্দু পরমুহূর্তেই চড় কষিয়ে দিলেন অনির গালে। ছেলেটার মাথাটা দেওয়ালে সজোরে বাড়ি খেয়ে বীভৎস একটা শব্দ হল!

হঠাৎ টেব্‌লের উপর হাত দিয়ে হালকা চাপড় মারতে শুরু করল অনির্বাণ। সেই শব্দে হুঁশ ফিরল প্রশান্তর। এতক্ষণ তার চোখের সামনে অতীতের এক চিত্রনাট্য মঞ্চস্থ হচ্ছিল। সংবিৎ ফিরে পেয়ে সে লজ্জিত স্বরে তিথিকে বলল, "ও কোথায় কাজ করে, আমি কৌতূহলবশত জানতে চেয়েছিলাম। ও যে ওসব করতে পারে না, তা আমি জানি।"

BanglaBook.org

তিথি একটা বিষণ্ণ হাসি হেসে বলল, "করে নয়, করত। ওর চাকরিটা আর নেই।"

"ওর বাবা-মা কোথায় আছেন? কোথায় থাকেন আপনারা? আপনি কি চাকরিবাকরি কিছু করেন? কিছু মনে করবেন না, অনেকবছর পর ওকে দেখলাম তো, তাই জিজ্ঞেস করছি।"

তিথি জবাব দিল, "ওর বাবা-মা মারা গিয়েছেন। আমি কিছুই করি না। সুভাষনগরে একটা ভাড়াবাড়িতে ক'দিন হল আছি। আমাদের এক ছেলে আছে, ফাইভে পড়ে।"

প্রশান্ত এবার তাকাল অনির দিকে। বলল, "অনি, অ্যাই অনি... তাকা, আমার দিকে তাকা! দ্যাখ, আমি প্রশান্ত। চিনতে পারছিস?"

অনির্বাণ কোনও জবাব দিল না। ঘাড় ঝুঁকিয়ে টেব্‌লের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলে চলল, "মিলবে না, মিলবে না।"

তিথি পাশ থেকে বলল, "বললাম না, ও কোনও কথারই জবাব দেয় না। তবে চিৎকার-চেঁচামেচি, ভাঙচুরও করে না। স্নান করিয়ে বা খাইয়ে দিতে গেলে বাধাও দেয় না।"

প্রশান্ত এবার অনির মেডিক্যাল রিপোর্টগুলো দেখতে শুরু করল। স্ক্যানের কয়েকটা রিপোর্ট আছে তার মধ্যে। তাদের মধ্যে একটা দেখতে দেখতে প্রশান্তর হঠাৎ চোখ পড়ল, টেব্‌লের উপর পড়ে থাকা এক্স রে প্লেটের উপর। তার মনে হল, হাতে ধরা অনির মস্তিষ্কের ছবি আর টেব্‌লের উপর রাখা শরদিন্দুস্যারের হাতের এক্স রে প্লেট, অদৃশ্য হলেও দুটোর মধ্যে কী অদ্ভুত সম্পর্ক!

বেশ কিছুক্ষণ ধরে রিপোর্টগুলো খুঁটিয়ে পড়ল প্রশান্ত। তারপর অনির কাছে এসে হাত দিয়ে তার ঘাড়-মাথা ভালভাবে পরীক্ষা করল। বিশেষত, মাথার পিছনদিকে চুল ফাঁক করে কী যেন দেখার চেষ্টা করল। অনি কোনওরকম বাধা দিল না, বাধ্য ছেলের মতো চুপচাপ বসে রইল।

তাকে দেখে প্রশান্ত আবার চেয়ারে গিয়ে বসল। তিথি জিজ্ঞেস করল, "কী দেখলেন, ডাক্তারবাবু?"

প্রশান্ত তার প্যাডটা টেনে নিয়ে বলল, "এই রিপোর্টগুলো আমি ক'দিনের জন্য রাখতে পারি? ওর আরও কয়েকটা স্ক্যান করাতে হবে। সম্ভব হলে কাল-পরশুর মধ্যেই।"

BanglaBook.org

কাগজ রেখে যেতে অসুবিধে নেই তিথির। কিন্তু স্ক্যান করানো মানেই অনেক টাকার ধাক্কা। এই মুহূর্তে তার হাতে যা টাকা আছে তাতে কুলোবে না। তাই সে বলল, "কাগজ রেখে যাচ্ছি। কিন্তু স্ক্যান এক তারিখের পর করালে খুব অসুবিধা হবে কি?"

প্রশান্ত, তার সংসারের অভাব-অনটন বুঝতে পারল। প্রেসক্রিপশন লেখা শেষ করে বলল, "টেলিফোন এক্সচেঞ্জের পাশে যে ডায়াগনোসিস সেন্টার আছে, ওখানে ওকে নিয়ে যাবেন। আমি চিঠি করে দিচ্ছি। কালই যাবেন, টাকাপয়সা লাগবে না। আমি ফোন করে দেব," প্যাডের কাগজটা ছিঁড়ে তিথির দিকে এগিয়ে দিয়ে জুড়ল, "কাল ওর স্ক্যান হয়ে গেলে পরশু সকালে রিপোর্টটা পেয়ে যাবেন। প্যাডে আমার মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে। আমাকে ফোন করলে বলে দেব কখন ওকে আনবেন।"

তিথি বলল, "ঠিক আছে।"

ডাক্তারবাবু এরপর বললেন, "আপনাদের কোনও কনট্যাক্ট নাম্বার আছে? কিছু যদি মনে না করেন, নাম্বারটা দেবেন আমাকে?"

তিথি বলল, "না, না, মনে করার কী আছে?"

মোবাইল নম্বরটা টুকে প্রশান্ত আবার তাকাল অনির মুখের দিকে। ভাবলেশহীন সেই মুখ, কোনও অভিব্যক্তিই নেই। তিথি তার ব্যাগ থেকে একশো টাকার দুটো নোট বের করে প্রশান্তর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "ডাক্তারবাবু, আপনার ফিজ়..."

প্রশান্ত বলল, "ওটা লাগবে না, রেখে দিন।"

তিথি এবার কিছুটা বিব্রত হয়ে বলল, "প্লিজ়, এটা করবেন না। চিঠিটা করে দিয়ে আপনি অনেক উপকার করলেন আমার। কিন্তু ফিজ় আপনাকে নিতে হবে, না নিলে আমার ভীষণ খারাপ লাগবে।"

প্রশান্ত শান্ত গলায় বলল, "আমি দয়া বা করুণা করছি না। সে ক্ষমতা আমার নেই," কয়েক সেকেন্ড থেমে সে আবার বলল, "আপনি হয়তো জানেন না, জানার কথাও নয়, ও আমাকে একবার দুশো টাকা দিয়েছিল। তখন আমরা একসঙ্গে পড়ি। টাকাটা ওকে ফেরত দেওয়া হয়নি। গত কুড়িবছরে সে টাকা সুদে-আসলে অনেকটাই বেড়েছে। ধরুন, তার থেকেই আমি ফিজ়ের টাকাটা নিয়ে নিলাম।"

তিথি তাঁর কথা বুঝতে না পেরে বলল, "মানে?"

BanglaBook.org

প্রশান্ত স্মিত হেসে বলল, "মানেটা আপনার এখন না বুঝলেও চলবে। আপনারা এখন আসুন। বাইরে অনেক পেশেন্ট অপেক্ষা করছে। কাগজপত্রগুলো আমি রেখে দিলাম।"

নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে অনির্বাণকে নিয়ে একটা রিকশায় উঠল তিথি। বাইরে বেশ রোদ। দেড়টা বাজে। রিকশা কিছুটা এগোতেই তিথির ব্যাগের ভিতরে থাকা মোবাইল ফোন বেজে উঠল। ফোন হাতে নিয়ে সে দেখল, অচেনা নম্বর। কলটা রিসিভ করে ওপাশে কোনও শব্দ শুনতে না পেয়ে, তিথি বারদুয়েক বলল, "হ্যালো? হ্যালো?"

একটা পুরুষকণ্ঠ ভেসে এল, "হ্যালো, হ্যাঁ, আমি বয়েজ স্কুল থেকে বলছি..."

বয়েজ স্কুলের নাম শুনেই বুকটা ধক করে উঠল তিথির। বাবলু স্কুলে গিয়েছে। ওর কিছু হল না তো?

তিথি কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "হ্যাঁ, কী হয়েছে?

ওপাশের কণ্ঠস্বর বলল, "আপনি এর আগেরদিন স্কুলে আমাকে বই দিতে এসেছিলেন, না?"

তিথি এবার গলাটা চিনতে পারল, বিকাশস্যার। তিনি নম্বরটা নিয়েছিলেন। সে একটু উৎফুল্ল হয়ে বলল, "হ্যাঁ, আমিই গিয়েছিলাম! বইয়ের কী হয়েছে, স্যার?"

"এখনও হয়নি। তবে হয়ে যাবে। চিন্তার কিছু নেই।"

"বইটা হলে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব, স্যার," গদগদ স্বরে কথাটা বলল তিথি।

বিকাশস্যার বললেন, "কাল একবার আসতে পারবেন? ওই বইয়ের ব্যাপারেই কিছু কথাটথা বলতাম।"

সকালের দিকে অনিকে ডায়াগনোসিস সেন্টারে নিয়ে যেতে হবে। দুপুরের দিকে নিশ্চয়ই সে ফাঁকা হয়ে যাবে। এই ভেবে সে উত্তর দিল, "হ্যাঁ স্যার। আমি যদি সেকেন্ড হাফে, মানে দুটো-আড়াইটে নাগাদ যাই, তা হলে আপনার অসুবিধা হবে?"

ওপাশ থেকে শোনা গেল, "না, হবে না। ওটাই বেস্ট টাইম। তবে স্কুলে নয়। জানেনই তো, এখন সব স্কুলেই বইটই করানো নিয়ে রেষারেষি হয়। আসলে কমিশনের ব্যাপার থাকে তো। সকলেই চোখকান খোলা রাখে।

BanglaBook.org

আপনার সঙ্গে কথা বলছি দেখতে পেলেই পিছনে লোক লেগে যাবে, যাতে আপনার বইটা না হয়।"

বিকাশস্যারের কথায় বিস্মিত হয়ে তিথি জিজ্ঞেস করল, "তাই নাকি? তা হলে কোথায় দেখা করব, স্যার?"

বিকাশস্যার বললেন, "এক কাজ করুন, স্টেশন থেকে রিকশা নিয়ে চলে আসুন কুইন্‌স ক্যাফে রেস্তরাঁয়। ওর কাছাকাছি একটা বাড়িতে আমি পড়াতে যাই। রেস্তরাঁর সামনে আমি দুটো নাগাদ অপেক্ষা করব। দুপুরবেলায় ওখানেই টিফিন করতে যাই..."

তিথি কী বলবে বুঝতে পারছিল না। হঠাৎ পাশ থেকে অনির্বাণ আবার বলতে শুরু করল, "মিলছে না... মিলছে না। কিছুতেই মিলবে না..."

অনির কথার কিছুটা কানে গেল বিকাশস্যারের। তিনি বললেন, "কেউ কিছু বলল কি?"

তিথি তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা চাপা দেওয়ার জন্য বলল, "না স্যার, আমি রাস্তায় তো, তাই কথা আসছে। ঠিক আছে, আমি কাল ওই সময় পৌঁছে যাচ্ছি। এখন রাখছি," ফোনের লাইন কেটে তাড়াতাড়ি অনির্বাণকে জড়িয়ে ধরল সে। অনি মাথা ঝাঁকাতে শুরু করেছে।

॥ ৯ ॥

বসুধরার যখন ঘুম ভাঙল, তখন ভোরের আলো খোলা জানালা দিয়ে এসে তার গা ছুঁয়েছে। বালিশের পাশে রাখা রিস্টওয়াচটা তুলে নিয়ে দেখলেন, ছ'টা বাজে। মুম্বইয়ে তাঁর আর-একটু দেরি হয়। আটটা নাগাদ কাজের লোক এসে ডোরবেল বাজালে তিনি বিছানা ছাড়েন। যতদিন ছেলে পার্থ, ছেলের বউ অনসূয়া আর নাতি প্রিতম তাঁর সঙ্গে ছিল, ততদিন অবশ্য বেশ ভোরেই উঠতে হত তাঁকে, পাঁচটার মধ্যেই। অনসূয়ার হাতে হাতে নাতি প্রিতমকে স্কুলের জন্য তৈরি করতে হত। তার স্কুলবাস আসত ঠিক সাতটায়। পার্থ অফিস বেরিয়ে যেত আটটা নাগাদ। তার কিছুক্ষণ পর পুত্রবধূ অনসূয়াও। তারা অন্যত্র চলে যাওয়ার পর অবশ্য ঘুম থেকে ওঠার কোনও তাড়া থাকে না বসুধরার। অনেকসময় কাজের মেয়েটিকে দরজা খুলে দিয়ে আবার শুয়ে পড়েন।

BanglaBook.org

এখানেও অবশ্য ওঠার কোনও তাড়া নেই বসুধরার। দুটো রাত কাটিয়ে দিলেন পরিবাড়িতে। প্রথমদিনের ধকলের জন্য গতকাল উঠতে দেরি হয়েছিল তাঁর। পল্টুর ডাকে ন'টা নাগাদ ঘুম ভেঙেছিল।

আজ ঘুম ভাঙার পরই বসুধরার মনে হল, বাইরের আলো তাঁকে ডাকছে। বিছানা ছেড়ে উঠে ব্রাশ-পেস্ট নিয়ে জানালার সামনে দাঁড়ালেন তিনি। কাছেই একটা গাছের ডালে ছাইরঙের কয়েকটা পাখি লাফালাফি করছে, আর মাঝে মাঝে পিকপিক করে ডাকছে। কী যেন নাম ওদের? একটু ভাবার পর বসুধরা মনে পড়ল, সাতভাই পাখি! স্মৃতি থেকে এখনও সবকিছু মুছে যায়নি। ব্যাপারটা ভেবেই মনে মনে হাসলেন বসুধরা।

দাঁত মাজতে মাজতে বেশ কিছুক্ষণ পাখিগুলোর লাফালাফি দেখলেন তিনি। একসময় এরকম পাখি খুব দেখা যেত মনসার টিপিতে। সে জায়গা কি এখনও আছে? বসুধরা ঠিক করে রেখেছেন, আগামী ক'দিনে পরিচিত জায়গাগুলো একটু দেখে আসবেন। মুখ-হাত ধুয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন তিনি। চিলেকোঠায় ওঠার সিঁড়ির দিকে তাকালেন। কাল পল্টু সিঁড়ির আবর্জনা পরিষ্কার করেছে, ছাদেও উঠেছিল। বসুধরার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, তখনই ছাদে উঠতে। কিন্তু ওঠেননি। এতবছর পর, তৃতীয় কোনও ব্যক্তির উপস্থিতিতে পরিটার সামনে দাঁড়াতে চাইছিলেন না তিনি। পল্টু যেতে যেতেই অন্ধকার নেমে এসেছিল। তারপর আর একা উপরে উঠতে ভরসা হয়নি তাঁর। তিনি যে আর সেই ছোট্ট বসু নেই! বয়স বেড়েছে, শরীর ভারী হয়ে গিয়েছে। তারউপর ভাঙাচোরা বাড়ি। কোথায় পা ফেলতে গিয়ে কোথায় পা ফেলবেন! পল্টু অবশ্য বলে গিয়েছে, উপরে উঠতে কোনও অসুবিধে নেই, মোটামুটি ঠিক আছে সিঁড়িটা।

কয়েকমুহূর্ত সিঁড়ির মুখের দিকে তাকিয়ে বসুধরা ধীরপায়ে এগোলেন সেদিকে। তিনি অনুভব করলেন, তাঁর পা মৃদু মৃদু কাঁপছে, বুকের ভিতর স্পষ্ট একটা রোমাঞ্চ অনুভব করছেন। কতবছর পর? কতবছর পর আবার? মাথার উপর কড়িকাঠের ফোকর থেকে পায়রার দল ঘাড় বেঁকিয়ে কৌতূহলী ভঙ্গিতে দেখছে তাঁকে। তাদের বাসা থেকে খসে পড়া খড়কুটো উড়ে যাচ্ছে দমকা বাতাসে। বসুধরা পায়ে পায়ে এগোচ্ছেন সিঁড়ির দিকে। উড়ে যাওয়া ওই খড়কুটোর মতোই এক এক করে তাঁর চোখের সামনে খসে পড়ছে সময়ের পরত। যেন সেই ছোট্ট বসু পড়া ফেলে, বাড়ির লোকজনের চোখ

BanglaBook.org

এড়িয়ে চুপিসারে সাতসকালে পরির কাছে যাচ্ছে গল্প করতে। এখনই হয়তো পাশের ঘর থেকে বাবার গলা শোনা যাবে, "বসু, কোথায় যাচ্ছ?"

বসুও তখনই জবাব দেবে, "কোথাও যাচ্ছি না তো। এমনি বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। কে যেন নীচ থেকে ডাকল মনে হয়।"

বাবা বলবেন, "বুঝেছি। যাও, ঘরে গিয়ে পড়তে বসো। আমি গিয়ে পড়া ধরব।"

সেদিনগুলোর মতো আজও উজ্জ্বল রোদ এসে পড়েছে বারান্দায়, বাইরে থেকে ভেসে আসছে পাখির ডাক। কিন্তু, 'বসু, কোথায় যাচ্ছ' জিজ্ঞেস করে কেউ আজ আর থামাল না তাঁকে। বর্তমান ঘেরা অতীতের অলিন্দ ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন তিনি।

সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ালেন বসুধরা। সিঁড়ির মুখটা ঝলমল করছে। সম্ভবত চিলেকোঠার দরজাটা খোলা। পল্টু ধুলো পরিষ্কার করে, জল দিয়ে ধুয়ে সাফ করেছে সিঁড়িটা। তাতে পা রাখলেন তিনি। সিঁড়ির ধাপে জমাট বেঁধে থাকা মমতা অনুভব করলেন বসুধরা। বেশ কয়েকধাপ ওঠার পর থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সূর্যের আলো এসে পড়েছে সিঁড়ির কয়েকটা ধাপে। তার মধ্যে ফুটে আছে কয়েকটা ছোট্ট ছোট্ট পায়ের ছাপ। সেগুলো যেন খোদাই করা হয়েছে সিঁড়ির ধাপে। ডান পা, বাঁ পা করতে করতে উপর দিকে উঠে গিয়েছে পায়ের ছাপগুলো! ও কার পায়ের ছাপ?

BanglaBook.org

পরক্ষণেই ব্যাপারটা মনে পড়ে গেল তাঁর। এ তো তাঁরই পায়ের ছাপ। তাঁর, মানে, সেই বসুর, তখন তার বয়স বছরআটেক। দুর্গাপুজোর আগে কোনও একটা সময় হবে। বাড়িতে মিস্ত্রি লেগেছিল টুকটাক মেরামতির জন্য। সিঁড়ির প্লাস্টার চটিয়ে নতুন করে প্লাস্টার করা হচ্ছিল। বসু পরির সঙ্গে কথা বলতে যাওয়ার ঝোঁকে সেই কাঁচা সিমেন্টে পা ফেলেছিল। বাবা অবশ্য বসুকে বেশ বকাবকি করেছিলেন তার জন্য। কিন্তু ম্যানেজার হরিপদকাকাকে ডেকে বলেছিলেন, "মিস্ত্রিদের বলো, পায়ের ওই ছাপগুলো আর মোছার দরকার নেই। বাড়িটা তো ওরই। শৈশবের স্মৃতি হয়ে থাকবে।" আড়াল থেকে কথাটা শুনেছিল বসু। বাবা অনেকযুগ হল নেই, কিন্তু ওই ছোট পায়ের ছাপগুলো স্মৃতি হয়ে রয়ে গিয়েছে। বসুধরা ঝুঁকে পড়ে একবার হাত বোলালেন একটা ছাপের উপর। তারপর তার পাশে পায়ের পাতাটা বসিয়ে আবার উঠিয়ে নিলেন। সিঁড়িটা গতকাল বিকেলে ধোয়া হয়েছে। ঈষৎ

ভিজে ধুলোর একটা মিহি আস্তরণ জমেছে সিঁড়ির ধাপে। তার উপর পায়ের অস্পষ্ট একটা ছাপ পড়ল। সিঁড়ির ধাপে পাশাপাশি আঁকা ছাপদুটো দেখলেন বসুধরা। না, সেই ছোট্ট সুন্দর ছাপের সঙ্গে এই ভারী পায়ের ছাপের কোনও মিলই নেই। ভাগ্যিস এই ছাপটা আঁকা হয়ে থাকবে না! আর না দাঁড়িয়ে বসুধরা উঠতে লাগলেন সিঁড়ি বেয়ে।

সকালের আলোয় উদ্ভাসিত ছাদে এসে দাঁড়ালেন বসুধরা। কিছুটা তফাতে, চিলেকোঠার ঘরের গা ঘেঁষে একটা বেদির উপর দাঁড়িয়ে আছে শ্বেতপাথরের পরিটা! পরিবাড়ির পরি! মানুষের মতোই অবয়ব তার। আবরণহীন, উন্মুক্ত বক্ষ, নিটোল শঙ্খের মতো স্তন, মুখটা সামান্য পিছনে ফেরানো, সে যেন তাকিয়ে দেখছে নিজের অতীতকে। তার ডানাদুটো পিঠের কাছে উন্মুক্ত হয়েও যেন আবদ্ধ। যেন উড়তে গিয়েও হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছে সে। বসুধরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সেই নারীমূর্তির দিকে। তিনি অনুভব করলেন, একটা কম্পন তাঁর সারা শরীরেই ছড়িয়ে পড়ছে। আরবসাগরের তীরে ঘুমে-জাগরণে কতবার তিনি তাকে দেখেছেন। তবে ভাবেননি, শেষপর্যন্ত কোনও একদিন তার সামনে আবার এসে দাঁড়াতে পারবেন! বাবার মৃত্যু, স্বামীর মৃত্যু, প্রিতমকে নিয়ে পার্থ-অনসূয়ার চলে যাওয়া, একের পর-এক কত ঝড় বয়ে গিয়েছে বসুধরার উপর দিয়ে। কিন্তু যখনই নিঃসঙ্গতা তাঁকে গ্রাস করতে চেয়েছে, তখনই যেন সকলের অলক্ষ্যে এসে দাঁড়িয়েছে পরিটা। ভরসা জুগিয়েছে বসুধরাকে।

তিনি এগিয়ে গিয়ে বেদির উপর উঠলেন। স্পর্শ করলেন তাকে। মনে হল, রক্তমাংসর কোনও মানুষকে বহুদিন পর স্পর্শ করছেন। পরির কপাল, গাল, মসৃণ কাঁধ ছুঁয়ে ডান বাহু বেয়ে ধীরে ধীরে নীচে নেমে স্পর্শ করলেন তার হাতের পাতা। পরির আঙুলগুলো নিয়ে খেলা করতে গিয়ে হঠাৎ অন্য কিছুর একটা অস্তিত্ব টের পেলেন তিনি। চমকে উঠে ভাল করে তাকালেন আঙুলটার দিকে। এটা এখনও আছে! একটা সাদা পাথরের আংটি। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, ওটা পরির দেহেরই অলঙ্কার। কিন্তু ওটা আসলে একটা আংটিই। বসুধরা এবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার আগের রাতে পরির আঙুলে পরিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন আংটিটা। পরিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, না তার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন নিজের গোপন প্রেমের ক্ষুদ্র স্মারককে? পরি আজও আগলে রেখেছে আংটিটা।

BanglaBook.org

বসুধরা সাবধানে সেটা খোলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। বহুবছর থাকতে থাকতে পাথরের আঙুলের সঙ্গে এঁটে গিয়েছে আংটিটা। কিন্তু জিনিসটা খুলে নিতেই হবে। না হলে পরির সঙ্গে সঙ্গে আংটিটাও ওরা নিয়ে যাবে।

বসুধরা ভাবলেন, শেষবারের মতো এই শহর ছেড়ে যাওয়ার আগে এই আংটিটা তাকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় কি? কিন্তু তাকে কোথায় পাবেন তিনি? দেখা হলে, সে যদি প্রশ্ন করে, কেন ওভাবে সবকিছু ছেড়ে সেদিন চলে গিয়েছিলেন, তবে কী জবাব দেবেন তিনি? পরপর প্রশ্নগুলো মাথায় এল বসুধরার। পরক্ষণেই তাঁর মনে হল, এই আংটি কি তাকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত ছিল? আজ যদি বসুধরা সেই সুযোগ পান, তাঁর বুকের ভার কিছুটা হলেও লাঘব হবে। কিছুক্ষণ পর বেদি থেকে নামলেন বসুধরা। পাল্লাহীন দরজা-জানালা নিয়ে চিলেকোঠার ঘরটা দাঁড়িয়ে আছে। সূর্যের উলটোদিকে মুখ বলে আলো সেখানে ভাল করে প্রবেশ করছে না। ভিতরে অন্ধকার বিরাজ করছে। ও কীসের অন্ধকার? বসুধরার মনের, না সময়ই জমাট বেঁধে অন্ধকারের রূপ নিয়ে রয়েছে? ছোটবেলায় যে বুড়ি সরলামাসি বসুকে দেখাশোনা করত, সে একবার আক্ষেপ করে বলেছিল, "চিলেকোঠার ঘরটাই হল পাপের ঘর!" বসুধরা কথাটার অর্থ বুঝেছিলেন আরও অনেকবছর পর। এই ঘরটাই তো তাঁর জীবনকে অন্য খাতে বইয়ে দিল। বসুধরা রেলিং-এর ধারে এসে দাঁড়ালেন, তাকালেন পুকুরের দিকে। তার সবুজাভ জলের উপরিভাগ সূর্যের আলোয় চিকচিক করছে। একটা মাছরাঙা জল ছুঁয়ে উড়ে গেল। পুকুরের ওপাশের গাছগুলো সূর্যের আলো মেখে দাঁড়িয়ে আছে। একদল পায়রা নীচ থেকে ছাদে উড়ে এল। তারপর বসুধরাকে ঘিরে, তার পায়ের কাছে গলা ফুলিয়ে ডাকতে ডাকতে ঘুরতে লাগল। গতকাল পল্টুকে দিয়ে ওদের জন্য কেজিখানেক গম আনিয়েছেন বসুধরা। দু'বেলা খেতেও দিয়েছেন। খাবারের আশাতেই ওরা সম্ভবত এসেছে তাঁর কাছে। বসুধরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তাদের উদ্দেশে বললেন, "চল, নেমে তোদের খাবার দিচ্ছি।"

এবার নামতে হবে তাঁকে। সাতটার সময় পল্টু আসবে। তাঁকে নিয়ে বাজারের দিকে যাবে সে। কিছু কেনাকাটা আছে। এটিএম থেকে কিছু টাকাও তুলতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, যারা পরিটা নিতে

BanglaBook.org

আসবে, তাদের ফোন করে নিজের আগমনের খবরটা জানাতে হবে বসুধরাকে। বেশ অদ্ভুতভাবেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হয় তাদের। বছর সাত-আট আগে বসুধরা কলকাতার যে কনস্ট্রাকশন কোম্পানিকে দিয়ে ঘরদুটো মেরামত করিয়েছিলেন, তাদেরই এক ইঞ্জিনিয়ার কাজটার তদারকি করতে এসে পরিটার ছবি তুলে নিয়ে যান। একই কোম্পানি কোথায় যেন একটা বিলাসবহুল রিসর্ট বানিয়েছে। রিসর্টের লবি সাজানোর জন্য পরিটার কথা মাথায় আসে সেই ইঞ্জিনিয়ারের। কিছুদিন আগে সেই কোম্পানির কয়েকজন এসে দেখেও যায় পরিটাকে। যে ভদ্রলোকের মাধ্যমে বসুধরা কাজটা করিয়েছিলেন, তাঁর সাহায্যেই তারা বসুধরার সঙ্গে যোগাযোগ করে। পরির জন্য মোটা অঙ্কের চুক্তি হয়েছে সেই সংস্থার সঙ্গে। টাকাটা অবশ্য বড় ব্যাপার নয়। প্রথমে বসুধরা তাদের প্রস্তাবে না বলে দিয়েছিলেন। কাছে থাকুক আর দূরে থাকুক, যেখানে আছে সেখানেই থাক পরিটা, ভেবেছিলেন বসুধরা। কিন্তু লোকগুলো যখন বলল যে, "দেখুন ম্যাডাম, ওখানে কেউ আর থাকে না। একদিন হয়তো কেউ ওকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে নিয়ে যাবে। অথবা বাড়িটার যা অবস্থা, তাতে হয়তো একদিন ওকে নিয়েই ধসে পড়বে। এত বড় একটা ওয়র্ক অফ আর্ট নষ্ট হয়ে যাবে। সেটা কি আপনি চান? তার চেয়ে আমাদের দিলে ওটা যত্নে থাকবে।"

শেষপর্যন্ত তাদের যুক্তি ফেলতে পারেননি বসুধরা। তাঁর শৈশবে মায়ের কাছে খবর পাঠানোর দূত, কৈশোরের খেলার সাথী এবং যৌবনের সহচরী, পরিবাড়ির পরি ওভাবে নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে, তা কখনওই চাননি তিনি। হয়তো অন্য কোথাও গেলে তার একাকিত্বও কাটবে। এসব ভেবে শেষপর্যন্ত মত দিয়েছেন। আর কিছু না হোক, ওরা পরিটা নিতে আসবে বলেই তো এখানে আসা হল, শেষবারের মতো দেখা হল তার সঙ্গে। তবে ওদের হাতে পরিকে তুলে দেওয়ার আগে আংটিটা খুলে নিতে হবে।

বসুধরা ছাদে আরও বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলেন পরিটার দিকে। তার মসৃণ গা বেয়ে সকালের রোদ চুঁইয়ে নামছে। তাঁর দিকে তাকিয়ে সে যেন হাসছে। একটা পায়রা উড়ে এসে পরির কাঁধে বসল। ঠিক তখনই নীচ থেকে পল্টুর গলা শোনা গেল, "ঠাকুমা, কোথায় গো তুমি!"

BanglaBook.org

॥ ১০ ॥

তিরিশজন অ্যাপ্লিক্যান্ট থাকলেও মাত্র চোদ্দজন এসেছে ইন্টারভিউ দিতে। যে অ্যাটেন্ড্যান্স পেপার ক্যান্ডিডেটদের কাছে সই করার জন্য দেওয়া হয়েছিল, সেই ক্রমানুসারে বারোজনকে ডাকা হলেও অভ্রকে ডাকা হয়নি। শুধু চতুর্দশ সাক্ষরকারী এখন হেডমাস্টারের ঘরের বাইরে, অভ্রর পাশে বেঞ্চে বসে আছে। অভ্র সই করেছে দশনম্বরে। তাকে টপকে তিনজনকে ডাকা হল, অথচ তাকে ডাকা হল না কেন? তার বেজায় অস্বস্তি লাগল।

ত্রয়োদশ অ্যাপ্লিক্যান্ট সদ্য ভিতরে ঢুকেছে। পাশের লোকটার দরকচামারা চেহারা। দেখে মনে হয় মধ্যবয়সি। সে পাশ থেকে চাপাস্বরে বলল, "ভাইয়ের কি সঙ্গে চিঠিপত্র আছে?"

"মানে?" জানতে চাইল অভ্র।

"মানে পার্টিফার্টির চিঠি? না হলে কাজ হবে না। দেখছ না, লোকে কেমন ঢুকছে আর বেরোচ্ছে। আগে থেকেই সব ঠিক করা আছে। এসব ইন্টারভিউ আসলে হল আইওয়াশ!"

লোকটার কথার জবাব না দিয়ে অভ্র পালটা প্রশ্ন করল, "তা হলে আপনি এসেছেন কেন?"

লোকটা ফিসফিস করে বলল, "হবে না জেনেও এসেছি। সময়টা অন্তত কাটল। মুফতে চা-বিস্কুটও জুটে গেল। বাইরে পাঁচটাকা লাগত! তা ছাড়া, ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি শুনলে বুড়ো বাপ-মায়ের মনে একটা ক্ষীণ আশা বেঁচে থাকে," বলে বিষণ্ণ হাসি হাসল। তারপর বলল, "তোমার বয়স অল্প, কমিশনের পরীক্ষা দাও। কিন্তু আজকাল সেখানেও শুনছি..."

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই, ত্রয়োদশ অ্যাপ্লিক্যান্ট বেরিয়ে এল। দরজার আড়ালে দাঁড়ানো পিয়ন ডাক ছাড়ল, "এবার চোদ্দ নম্বর আসুন।"

পাশের লোকটা উঠে ঘরে ঢুকে গেল ইন্টারভিউ দিতে, অথবা সময় কাটাতে। এবারও তাকে ডাকল না! অ্যাপ্লিকেশনটা কোনও কারণে রিজেক্টেড হয়ে যায়নি তো? অস্বস্তিটা বাড়ছে। সেটা কাটাতে অভ্র বাইরে ফাঁকা মাঠটার দিকে তাকাল। একসময় টিফিন পিরিয়ডে এখানে কত হুটোপুটি করেছে অভ্র, বর্ষাকালে কাদা মেখে ফুটবল খেলেছে। মাঠের দিকে তাকিয়ে পুরনোদিনের কথা ভাবছিল অভ্র।

BanglaBook.org

শেষপর্যন্ত ডাক এল তার। হেডমাস্টারের ঘরে ঢুকল অভ্র। ঘরে হেডমাস্টারসহ পাঁচজন বসে আছেন। হেডমাস্টার ইশারায় তাঁর সামনের চেয়ারটা অভ্রকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, "অ্যাকাডেমিক কেরিয়ারের কাগজপত্রগুলো দিন।"

অভ্র চেয়ারে বসে ফাইলটা খুলে এগিয়ে দিল টেব্‌লের ওপাশে বসে থাকা হেডমাস্টারের দিকে। ঘরে যাঁরা বসে আছেন, তাঁদের কাউকেই চেনে না অভ্র। হেডমাস্টারের পাশেই বসা এক টাকমাথা মাঝবয়সি ভদ্রলোক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করছিলেন তাকে। অন্যরাও যেন অভ্রর দিকে না তাকিয়ে তাঁকেই দেখে চলেছেন।

হেডমাস্টার, সেই ভদ্রলোককে বললেন, "নিন, শুরু করুন।"

চশমাপরা ভদ্রলোক, হেডমাস্টারকে বললেন, "ও তো আপনার স্কুলেরই ছাত্র ছিল। আগে খেয়াল করেছেন?"

কাগজপত্রে চোখ রেখেই তিনি জবাব দিলেন, "আমি তো পাঁচবছর আগে এসেছি। ইনি তার আগেই পাশ করে বেরিয়ে গিয়েছেন।"

ভদ্রলোক অভ্রর দিকে তাকিয়ে প্রথমে হেডমাস্টারের উদ্দেশে বললেন, "ঠিক আছে, স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারি হিসেবে আমিই শুরু করছি," তারপর অভ্রর দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, কৃষি ও শিল্পের মধ্যে কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে তোমার মনে হয়?"

অভ্রর ধারণা ছিল, তার অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার বা সাবজেক্টের উপর প্রশ্ন আসবে। এমন একটা প্রশ্নে সে হকচকিয়ে গেল। তবে পরক্ষণেই সে স্মার্টলি জবাব দিল, "দুটোরই প্রয়োজন আছে।"

"শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ, আর রেললাইনের জন্য জমি অধিগ্রহণের মধ্যে কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ?"

অভ্র উত্তর দিল, "ক্ষেত্রবিশেষে দুটোই গুরুত্বপূর্ণ।

এবার শেষ বাউন্সার ছাড়লেন ভদ্রলোক, "তোমার কী মনে হয়, শিল্পক্ষেত্রে এই রাজ্য পিছিয়ে যাচ্ছে কেন? সরকারি সিদ্ধান্তের ভুলে, না রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব এর জন্য দায়ী?"

আপাদমস্তক রাজনৈতিক প্রশ্ন। অভ্র কী জবাব দেবে, বুঝতে পারল না। কিন্তু পাশ থেকে একজন তাকে বাঁচিয়ে দিলেন। তিনি সেই ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, "বিভূতিদা, কেন মিছিমিছি ছেলেটাকে ল্যাজে

BanglaBook.org

খেলাচ্ছেন? ওকে যখন আমরা নেবই, তখন কাজের কথা সেরে নেওয়াই ভাল। একটা বাজতে চলল, দুটো নাগাদ আবার একটা কনভেনশন আছে। ঠিক সময় না গেলে রসময়দা খেপে যাবেন!"

ম্যানেজিং কমিটির ক্রেক্রেটারি বিভূতিবাবুও এবার হেসে ফেলে বললেন, "সুনীলবাবু, আপনাদের এই লোক, ঠিক কতখানি আপনাদের, তা বোঝার চেষ্টা করছিলাম। পরে আবার দেখব যে..." কথাটা শেষ না করে অভ্রকে বললেন, "ঠিক আছে, ঝেড়ে কাশাই ভাল। তুমি তো ভাই এই স্কুলেরই এক্স স্টুডেন্ট, অ্যাকাডেমিক স্কোরও ভাল, তা ছাড়া লোকাল ছেলে। সবচেয়ে বড় কথা, তুমি নীহারবাবুর রেকমেন্ডেড ক্যান্ডিডেট। অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি রসময়বাবু সব কথা বলেছেন আমাকে। আমরা তোমাকেই নেব ঠিক করেছি, তাই শেষে ডাকলাম। কাজটা হলে মন দিয়ে করবে তো?"

অভ্র জবাব দিল, "হ্যাঁ স্যার, করব।"

পাশ থেকে আর-একজন বললেন, "কাজটা পার্মানেন্ট না হলেও বেশ কিছু সুপারিশ এসছিল। দু'জনের অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার আপনার চেয়েও ভাল ছিল, তবু আমরা আপনাকে নেব ঠিক করেছি। আশা করি, ভবিষ্যতে ব্যাপারটা আপনি মাথায় রাখবেন। বড় স্কুল, নানারকম ব্যাপার থাকেই। ওসবের সঙ্গে জড়াবেন না। মনে রাখবেন, ভবিষ্যতে আপনার সার্ভিস রিনিউয়ালের সুযোগ আসতে পারে, আর সেটা কিন্তু আমাদের হাত দিয়েই হবে।"

অভ্র বলল, "মনে থাকবে, স্যার।"

এতক্ষণ পর হেডমাস্টার মুখ খুললেন। তিনি এবার অভ্রকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করে জানালেন, "তোমার কাগজপত্র ডিআই অফিস ঘুরে আসতে প্রায় একমাস লাগবে। অর্থাৎ, অফিশিয়ালি জয়েন করতে আরও একমাস। কিন্তু আমাদের চারটে পোস্ট এমনিতেই খালি। কমিশন এখনও টিচার পাঠায়নি। একজন লিয়েন লিভে গেল, আর-একজন মেডিক্যাল লিভে। তোমাকে কিন্তু এই একমাস ভলান্টারি সার্ভিস দিতে হবে। স্কুল ফান্ড থেকে সামান্য কিছু হাতখরচা দেব। কী, করবে তো?"

অভ্র কিছু বলার আগেই বিভূতিবাবু বলে উঠলেন, "নিশ্চয়ই করবে! কত ছেলে তিনমাস ভলান্টারি সার্ভিস দিতে রাজি! কী ভাই, তাই তো?"

অভ্র মৃদু হেসে বলল, "ঠিক আছে, স্যার। আমি তৈরি। কবে থেকে আসতে হবে?"

BanglaBook.org

হেডমাস্টার বললেন, "কাল থেকেই এসো, ঠিক দশটায়।"

বিভূতিবাবু এবার হেডমাস্টারকে বললেন, "তা হলে ওই কাজটা করিয়ে নিন।"

হেডমাস্টার একটু ইতস্তত করে একটা সাদা কাগজ অভ্রর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "কাগজটার নীচের দিকে একটা সই করে দাও। তারিখ দেওয়ার দরকার নেই।"

সাদা কাগজ! অভ্র তাকাল হেডমাস্টারের মুখের দিকে।

বিভূতিবাবু বললেন, "সাদা কাগজে সই করতে ঘাবড়াচ্ছ নাকি? এতে কোনও ক্ষতি হবে না। আসলে নানারকম কাগজ ডিআই অফিসে পাঠাতে হবে তো, এটা তারই একটা। হেডমাস্টারমশাই বয়ানটা বসিয়ে দেবেন।"

অভ্র আর কোনও কথা না বলে সই করে দিল।

ইন্টারভিউ শেষ হওয়ার পর স্কুলের বাইরে এসে দাঁড়াল অভ্র। ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। এত সহজে কাজটা হয়ে গেল! হোক টেম্পোরারি, চাকরি তো! অনেকদিন পর সে আজ আনন্দিত। খবরটা সুবীর আর নীলাকে এখনই জানাতে হবে। এতক্ষণ মোবাইল ফোনটা অফ ছিল। সেটটা অন করতে করতে চারপাশটা একবার দেখে নিল অভ্র। গরমের দুপুর, স্কুলের সামনের রাস্তা শুনশান। পিচের রাস্তা থেকে ভাপ উঠছে। একজন আইসক্রিম বিক্রেতা গাছের তলায় বসে ঢুলছে।

অভ্র প্রথম ফোন করল সুবীরকে। সবকথা শুনে সুবীর বলল, "আমি তোকে বলেইছিলাম, নীহারদার কথা কেউ ফেলতে পারে না। যাই হোক, দু'মাস পর মাইনে পেলে একটা হুইস্কির পাঁইট চাই। তবে পাড়ায় ব্যাপারটা এখনই গাবাবার দরকার নেই। তুই তো মিছিল-মিটিং করিস না। যারা করে, তাদের মধ্যে রিঅ্যাকশন হতে পারে। সবাই তো কাজের ধান্দাতেই ঘোরে। যা বলার, আমি বলব। এর মধ্যে একদিন তোকে নীহারদার কাছে নিয়ে যাব, ধন্যবাদ জানিয়ে আসবি। রাতে কথা বলছি।"

সুবীর লাইন ছেড়ে দেওয়ার পর নীলার নম্বর ডায়াল করল অভ্র।

দু'বার রিং হওয়ার পরই সে কলটা রিসিভ করে প্রবল উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, "ইন্টারভিউ কেমন হল? কিছু বুঝলে? সম্ভাবনা আছে?"

কয়েকমুহূর্ত চুপ করে থেকে অভ্র বলল, "আমাকে আগামীকাল থেকে আসতে বলেছে স্কুলে।"

BanglaBook.org

কথাটা শেষ হতে না-হতেই ওপাশ থেকে উচ্ছ্বাস ভেসে এল, "সত্যি বলছ? সত্যি? জানো, আমি সকাল থেকে শুধু ঠাকুরকে ডাকছি। সত্যি বলছ তো?"

অভ্র বলল, "একদম সত্যি! আমিও যেন এখনও ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না। অফিশিয়ালি জয়েন করতে একমাস লাগবে। কিন্তু হেডমাস্টার কালই আনঅফিশিয়ালি জয়েন করতে বললেন।"

"কী হল, সব খুলে বলো," নীলা উৎসাহিত হয়ে বলল।

অভ্র জবাব দিল, "আমি এখন স্কুল গেটের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। এত কথা এখান থেকে কীভাবে বলব?"

হঠাৎ নীলা জিজ্ঞেস করল, "অ্যাই, তুমি এখন আমাদের বাড়ি আসতে পারবে?"

কথাটা শুনে অভ্র বেশ অবাক হল। নীলার বাড়ির পাশ দিয়ে যাতায়াত করলেও, সে কোনওদিন সেখানে পা রাখেনি। নীলাও কোনওদিন যেতে বলেনি। বলা সম্ভবও নয়। বাড়িতে দাদা-বউদি-ভাইঝিরা আছে। অভ্র কী পরিচয় নিয়ে যাবে সেখানে?

বিস্মিত গলায় অভ্র জিজ্ঞেস করল, "তার মানে?"

নীলা বলল, "দাদা, বউ-বাচ্চা নিয়ে শান্তিপুরে গিয়েছে, বউদির ভাইপোর জন্মদিনে। বাড়িতে আমি একা। তাই আসতে বলছি।"

অভ্র কিছু না বলে চুপ করে রইল। নীলা মৃদু খোঁচা মেরে বলল, "তুমি তো এখন মাস্টার! আসতে অসুবিধে হবে না তো?"

অভ্র এবার হেসে ফেলল। বলল, "ঠিক আছে, আমি আসছি। তারপর সুবিধে-অসুবিধের ব্যাপারটা দেখছি! এখন ছাড়ো।"

রাস্তায় বিশেষ লোকজন নেই। গরমের হাত থেকে বাঁচার জন্য আশপাশের বাড়ির দরজা-জানালা বন্ধ। ফোনটা পকেটে পুরে, ফাইলটা সাইকেলের ক্যারিয়ারে রেখে প্যাডেলে চাপ দিল অভ্র।

বেড়া দিয়ে ঘেরা বাড়িটার সামনে সাইকেল থেকে নামতেই অভ্র দেখতে পেল, সদর দরজার সামনে নীলা দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ইশারায় ভিতরে আসতে বলল সে। বাগানের গেট ঠেলে ঢুকে সাইকেল নিয়ে বারান্দার সামনে গিয়ে দাঁড়াল অভ্র। নীলা দরজা থেকে সরে দাঁড়িয়ে বলল, "সাইকেলটা ভিতরে উঠিয়ে নাও।"

BanglaBook.org

অভ্রর অপ্রতিভ গলায় বলল, "কেউ দেখলে কী বলবে?"

নীলা হেসে বলল, "চারপাশে কাউকে দেখতে পাচ্ছ? আর যদি কেউ দেখেও থাকে, বলব, নার্সিংহোম থেকে লোক এসেছিল একটা ফাইল নিয়ে। ফাইল তো তোমার সঙ্গে আছেই।"

সাইকেলটা বারান্দায় তুলে দেওয়ার পর দরজা বন্ধ করে নীলা বলল, "এসো, ভিতরে এসো।"

পুরনোদিনের তিনকামরার বাড়ি। লাল সিমেন্টে পালিশ করা মেঝে জায়গায় জায়গায় ফেটে গেছে। সিলিং-এর চটলা খসে লোহার শিক বেরিয়ে এসেছে। একটা ঘর পেরিয়ে পাশের ঘরে ঢুকে নীলা বলল, "এটা আমার ঘর।"

ঘরে ঢুকে চারপাশে তাকাল অভ্র। একটা খাট, আলনা, কাঠের ছোট আলমারি। আসবাবপত্র নেহাতই মামুলি। তবে অভাবের মধ্যেও রুচিবোধের ছাপ রয়েছে ঘরে। বিছানায় টানটান করে পাতা রয়েছে বেডকভার, আলনা পরিপাটি করে গোছানো, ড্রেসিং টেব্‌লের সামনে রাখা গুছিয়ে রাখা আছে প্রসাধনসামগ্রী। দেওয়ালে একটা ক্যালেন্ডার, আর একটা ল্যামিনেটেড ছবি, চন্দ্রালোকে নির্জন প্রান্তরে একদল ঘোড়া।

খাটে মুখোমুখি বসল দু'জন। অভ্র হাঁপাচ্ছে। খুব জোরে সাইকেল চালিয়ে এসেছে। খাটের পাশে অর্ধেক ভেজানো জানালার পাল্লার ফাঁক গলে আলো ঢুকছে ঘরে। নীলা খাটে রাখা বোতলটা এগিয়ে দিলে বলল, "জল খাবে?"

অভ্রর জল খাওয়া শেষ হলে নীলা গুছিয়ে বসে বলল, "বলো এবার, কী হল?"

"তোমার কথা শুনে নীহারদার কাছে গিয়েছিলাম বলেই কাজটা হল। চোদ্দজন এসেছিল ইন্টারভিউ দিতে। সুপারিশও নাকি এসেছিল। ইন্টারভিউ বোর্ডের সদস্যরাই আমাকে বললেন, অ্যাপ্লিক্যান্টদের মধ্যে দু'জনের কোয়ালিফিকেশন নাকি আমার চেয়েও বেশি ছিল। তবু আমাকেই নিল। সকলের শেষে আমার ডাক পড়েছিল।"

"কী কী জিজ্ঞেস করল? সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছ?"

অভ্র হেসে বলল, "আশ্চর্য ব্যাপার! কীভাবে পড়াব বা আদৌ পড়াতে পারব কি না, সেসব কিছুই জিজ্ঞেস করল না, এমনকী, আমার সাবজেক্ট বা জেনারেল নলেজেরও কোনও প্রশ্ন করল না। কৃষি-শিল্পের মধ্যে কোনটা

BanglaBook.org

বেশি প্রয়োজন, শিল্পক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে আছি কেন, শুধু এসব প্রশ্নই করল।"

নীলা শুনে বলল, "যাই হোক, আল্টিমেটলি কাজটা যে হল, এটাই বিরাট ব্যাপার। জানো, কাল রাতে টেনশনে আমার ঘুম হয়নি। প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে আছি আমি। এবার যদি..." কথাটা শেষ করল না সে।

অভ্র ভুরু কোঁচকাল, "কীসের চাপ?"

নীলা মুখ নিচু করে বলল, "কাল যারা দেখতে এসেছিল, তাদের আমাকে পছন্দ হয়েছে। পাত্রপক্ষের কোনও দাবি নেই। ছেলেটার ভালই বয়স, বছর পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ হবে। তবে পয়সাওয়ালা। গুজরাতে একটা সোনার দোকান আছে। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই রেজিস্ট্রি সেরে নিয়ে গুজরাতে ফিরে যেতে চায়। তিনমাস পর ফিরে আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করবে।"

"এল, দেখল আর বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেল?"

"ওরা সম্পর্কে বউদির আত্মীয় হয়। এর আগে একটা ফ্যামিলি ফাংশনে লোকটা নাকি আমাকে দেখেছে। আজ যে দাদারা শান্তিপুর গেল, তার আসল উদ্দেশ্যই হল, বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা।"

"তোমার দাদা একবারও তোমার মতামত জিজ্ঞেস করলেন না?"

নীলা ম্লান হেসে বলল, "আমাদের মতো নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে অন্যের ঘাড়ে বসে থাকা অবিবাহিত মেয়েদের মতামতের খুব একটা দাম আছে কি? এসব সিনেমা-উপন্যাসে হয়!"

জানলার ফাঁক গলে আলোর ফালি এসে পড়েছে নীলার মুখে। বিষণ্ণ এক নারীর প্রতিকৃতি প্রকট হয়ে উঠছে। ছলছল চোখে সে তাকিয়ে আছে অভ্রর দিকে। মুখে কোনও প্রশ্ন না করলেও, নীলার দু'চোখেই জেগে আছে এক জিজ্ঞাসা। নিজের প্রেমাস্পদের চোখের দিকে তাকিয়ে এক বিপন্ন নারী উত্তর খুঁজছে। অভ্র বুঝতে পারল ব্যাপারটা। বলল, "ঠিক আছে, আমি পরশুদিন এসে তোমার দাদার সঙ্গে কথা বলব। আমার বাড়িতে তোমার কথা জানে। রেজিস্ট্রির উপর দিয়েই কাজটা সারব আপাতত। হয়তো তোমার কিছুটা অসুবিধে হবে তাতে..."

নীলা তার কথা শেষ করতে না দিয়ে বলল, "সত্যি বলছ! সত্যি বলছ তুমি! আমার কিচ্ছু অসুবিধে হবে না, শুধু একটা আশ্রয় চাই। আমি সবকিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারব।"

BanglaBook.org

অভ্র হেসে ফেলে বলল, "বলছি তো, কথা বলতে আসব।"

নীলার মুখটা মুহূর্তের মধ্যে ঝলমলিয়ে উঠল। ঝিলিক দিয়ে উঠল তার নাকছাবির ছোট্ট পাথরটা। অভ্রর সামান্য কয়েকটা কথা তাকে, তার জগৎকে আমূল বদলে দিল।

খাটে মুখোমুখি বসে আছে দু'জন। দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসেছিল নীলা। তার লাল নেলপালিশে রাঙা বুড়ো আঙুলের তীক্ষ্ণ প্রান্ত স্পর্শ করছে অভ্রর পায়ের আঙুল। নীলার ঠোঁটে দুষ্টুমির হাসি। নিজের অজান্তেই অভ্রর ডান পায়ের বুড়ো আঙুল খেলা করতে লাগল নীলার পায়ের পাতার সঙ্গে এবং একসময় পায়ের পাতা, নূপুরের বেষ্টনী, পায়ের গোছ অতিক্রম করে অতি সন্তর্পণে উঠতে লাগল উপরের দিকে। বিদ্যুতের শিহরন জাগছে শরীরে! নীলার চোখের পাতা বুজে আসতে চাইছে। তার বুকের আঁচল সামান্য সরে গিয়েছে। বিভাজিকা আবছা দৃশ্যমান। গভীর নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তার স্তনদ্বয় উঠছে-নামছে, তার দুই হাঁটু ক্রমশ শিথিল হয়ে আসছে। অভ্র হাত দিয়ে জানলার পাল্লা বন্ধ করে তাকে হ্যাঁচকা টানে কাছে নিয়ে নিল। নীলা কোনও বাধা দিল না। এভাবে পরস্পরকে কোনওদিন কাছে পায়নি তারা। পরিবাড়িতে বা মনসার টিপিতে এভাবে কাছে পাওয়া সম্ভবও নয়। মধ্যরাতের ঘড়ির কাঁটার মতো দু'জন মিশে যাচ্ছে। মাথার উপর সিলিংফ্যানটা বেশ শব্দ করে ঘুরছে। নীলার শিথিল, উন্মুক্ত স্পর্শে, ঘর্ষণে অভ্র হারিয়ে গেল এক অপার্থিব জগতে।

BanglaBook.org

॥ ১১ ॥

ডায়াগনোসিস সেন্টার থেকে বাড়ি ফিরতে প্রায় একটা বেজে গেল তিথির। বেশ ভিড় ছিল সেখানে। ডাক্তার চক্রবর্তী ফোন করে দিয়েছিলেন, তাই কিছুটা তাড়াতাড়ি হয়েছে, না হলে আরও দেরি হত। বাবলুকে একসেট চাবি দিয়ে দিয়েছে তিথি। সে ভাত খেয়ে, ঘরে তালা দিয়ে স্কুলের জন্য বেরিয়ে গিয়েছে।

অনিকে খাইয়ে তিথির নিজের খাওয়া শেষ করতে করতে দেড়টা বাজল। খাওয়ার পর ওষুধ খাইয়ে শুইয়ে দিল অনিকে। সাধারণত দুপুরে ঘণ্টাতিনেক ঘুমোয় সে, সম্ভবত ওষুধের প্রভাবেই।

কুইন্‌স ক্যাফেতে আজ দুটোর সময় যাওয়ার কথা তিথির। যেতে-আসতে, কথা বলতে নিশ্চয়ই একঘণ্টা মতো লাগবে। বাবলুর ফিরতে ফিরতে অন্তত সাড়ে চারটে বাজবে। দুপুরের দিকে গেলে যে অনির্বাণকে বাড়িতে একলা রেখে যেতে হবে, তা বিকাশস্যারের সঙ্গে কথা বলার সময় খেয়াল ছিল না তিথির। অনিকে একা ফেলে যাওয়াটা ঠিক হবে? বেশ ধন্দে পড়ে গেল সে। একবার মনে হল, বিকাশস্যারকে ফোন করে বলে দেয়, অন্যদিন যাবে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, স্যার যদি ভাবেন, ব্যাপারটায় তিথির তেমন গা নেই! আজ না যেতে পারলে সকালেই ফোন করে খবরটা দেওয়া উচিত ছিল। এখন দেড়টা বাজে, বিকাশস্যার হয়তো এতক্ষণে সেখানে পৌঁছেও গিয়েছেন। এখন 'যেতে পারব না' বললে, তিনি হয়তো রেগে গিয়ে বইটা করবেন না। এখন টাকার খুব প্রয়োজন তিথির।

কিছুক্ষণ দোটানায় থাকার পর, শেষপর্যন্ত অনির্বাণকে ঘরে রেখেই বাড়িতে তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল তিথি। বাইরে প্রচণ্ড রোদ। রাস্তায় কোনও রিকশা নেই। থাকলেও তাতে চড়ত না তিথি। দশটাকা ভাড়া। ফেরার পথে স্টেশনবাজার থেকে ওই পয়সায় সবজি কিনতে পারবে। কুইন্‌স ক্যাফে রেস্তরাঁর পাশ দিয়ে কয়েকবার গিয়েছে তিথি। ভিতরে ঢোকেনি অবশ্য। হেঁটে পৌঁছোতে মিনিটকুড়ি লাগবে। বইদুটোর ব্যাপারে সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে ছাতা মাথায় রাস্তা ধরে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল সে।

একসময় কুইন্‌স ক্যাফের কাছাকাছি পৌঁছে গেল তিথি। বড়রাস্তার উপরেই দাঁড়িয়ে আছে সাদারঙের রেস্তরাঁ। এই শহর ক্রমশ সাবালক হয়ে উঠছে। নতুন নতুন দোকান, বার-রেস্তরাঁ গজিয়ে উঠছে। কুইন্‌স ক্যাফেও হালে তৈরি হয়েছে। বাবলু একদিন বলছিল, "মা, আমাকে একদিন কুইন্‌স ক্যাফের ফিশ ফিঙ্গার খাওয়াবে?"

তিথি জবাবে বলেছিল, "ঠিক আছে, এবার পুজোর সময় তোকে একদিন নিয়ে যাব।"

রেস্তরাঁর সামনেই একটা বকুলগাছ। তার নীচে বিকাশবাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিথি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, "স্টেশন থেকে হেঁটেই এলেন নাকি? রিকশা পাননি?"

তিথি ছাতা বন্ধ করে বলল, "না স্যার। দুপুরবেলা তো, তাই রিকশা পাইনি। হ্যাঁ, এবার বলুন, স্যার?"

BanglaBook.org

বিকাশবাবু রেস্তরাঁর কাচের দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বললেন, "চলুন, ভিতরে বসে কথা বলি। যা গরম, বাইরে আর দাঁড়ানো যাচ্ছে না!"

তিথি একটু ইতস্তত করে কাচের দরজা ঠেলে বিকাশবাবুর পিছন পিছন ভিতরে ঢুকল। এসি চলছে। ঠান্ডা বাতাস ছড়িয়ে পড়ছে রেস্তরাঁর আনাচেকানাচে। কাউন্টারে সাদা উর্দিধারী কয়েকজন ওয়েটার দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে দু'জন বিকাশবাবুকে দেখে হাসল। ভদ্রলোক বোধহয় এখানে প্রায়ই আসেন।

দু'পাশে সার সার পরদা টানা কেবিন। ভিতর থেকে প্লেট-চামচের টুংটাং শব্দ আর চাপাস্বরে কথাবার্তা ভেসে আসছে। একদম শেষমাথার একটা কেবিনে বেয়ারা তাদের নিয়ে গেল। ছোট কেবিন, পাশাপাশি দুটো চেয়ার আর একটা কাচের টেব্‌ল। টেব্‌লে সুদৃশ্য কাচের গ্লাস, টিসুপেপার পরিপাটিভাবে সাজানো। বিকাশবাবু কেবিনের একটা চেয়ারে বসে, পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে বললেন, "নিন, বসুন।"

তিথি বসল। পরদা ধরে অর্ডারের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে বেয়ারা।

তিথির বেশ অস্বস্তি হচ্ছে। এভাবে কোনওদিন অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে রেস্তরাঁয় সে বসেনি। তাও আবার পরদা টানা কেবিনে, পাশাপাশি চেয়ারে। বিয়ের পরপর অনির সঙ্গে কয়েকবার এরকম পাশাপাশি বসে রেস্তরাঁয় খেয়েছিল তিথি। একটু জড়সড় হয়েই সে বসল।

বিকাশবাবু বললেন, "কী খাবেন, বলুন?"

তিথি তাড়াতাড়ি জবাব দিল, "না, না, আমি কিছু খাব না। বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি।"

"রিল্যাক্স! লজ্জা করবেন না। এতটা পথ এসেছেন, নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। তা ছাড়া আমিও তো খাব।"

তিথি লাজুক হাসি হেসে বলল, "আপনি খান, স্যার। বললাম তো, আমি খেয়ে এসেছি। আমার খিদে পায়নি।"

বিকাশবাবু পালটা হেসে বললেন, "আরে, সামান্য স্ন্যাক্স নিলে কোনও অসুবিধে হবে না," তারপর ওয়েটারকে অর্ডার দিলেন, "একপ্লেট ফিশ ফিঙ্গার আর দু'কাপ কফি দিয়ে যাও।"

লোকটা চলে গেল। ধপ করে কেবিনের পরদাটাও পড়ে গেল। ভারী পরদার আড়ালে কেবিনের ভিতরের আলোটাও বেশ কমে এল। তিথি

BanglaBook.org

উৎসুক হয়ে বলল, "হ্যাঁ স্যার, এবার বলুন, কী হল?"

উনি বললেন, "হয়নি, তবে হয়ে যাবে। দুটো বই-ই হবে। আগামীকাল অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের মিটিং আছে, তাতে পাশ করিয়ে নেব।"

কথাটা শুনে তিথি বেশ উৎফুল্ল হয়ে বলল, "দুটো বই-ই হবে! আপনি সত্যি বলছেন, স্যার?"

বিকাশবাবু আত্মম্ভরী গলায় বললেন, "হবে। আমি কিছু বললে সেকথা ফেলে দেওয়ার ক্ষমতা হেডমাস্টার বা অন্য কোনও মেম্বরের নেই। এসব ব্যাপারে আমিই স্কুলে শেষ কথা," তারপর চেয়ারটা টেরচা করে তিথির দিকে ফিরে বসে বললেন, "আপনার বাড়িতে কে কে আছেন? স্বামী কী করেন?"

তিথি জবাব দিল, "বাড়িতে স্বামী আর ছেলে আছে। ছেলে ক্লাস ফাইভে পড়ে। তবে স্বামী..." কথাটা বলতে গিয়েও থমকে গেল সে।

"হ্যাঁ, স্বামী কী?"

"উনি অসুস্থ। আপাতত কিছু করেন না," সামান্য ইতস্তত করে জবাব দিল তিথি।

বিকাশবাবু কয়েকমুহূর্ত তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "প্রথমদিন আপনাকে দেখেই অনুমান করেছিলাম, কিছু একটা ব্যাপার আছে। ক্যানভ্যাসিং-এর কাজে সাধারণত অল্পবয়সি আনম্যারেড মেয়েরাই আসে। আপনার মতো সুন্দরী গৃহবধূ হঠাৎ এ কাজে আসবে কেন?"

তিথি বিষণ্ণ গলায় জবাব দিল, "কী করব, স্যার? উনি বহুদিন যাবৎ অসুস্থ। ওষুধপত্রের খরচ, ছেলের পড়াশোনা, সব মিলিয়ে আমার টাকার খুব দরকার। বাধ্য হয়েই কাজটা নিয়েছি। বইদুটো হলে আমার সত্যিই খুব উপকার হবে, স্যার।"

চেয়ারটা ঘুরিয়ে বসার পর থেকেই বিকাশবাবুর পা, তিথির পায়ে মৃদু স্পর্শ করছিল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই নিজের পা একটু সরিয়ে নিল সে। "আপনার বাড়ি তো কলকাতায়? ছেলে কি ওখানেই পড়ে?" উনি জানতে চাইলেন।

তিথির একবার মনে হল, এই সুযোগে তাঁর ভুল ভাঙিয়ে বাবলুর কথাটা জানিয়ে দেয়। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল, সত্যি কথা বললে বাবলুকে স্কুলে করুণার চোখে দেখবে সকলে। অনি যে মানসিক ভারসাম্যহীন, সেকথাও

BanglaBook.org

হয়তো সকলে জেনে যাবে। স্কুলের অন্য ছেলেরা তাকে খ্যাপাবে! এসব কথা ভাবতে ভাবতেই সে অস্পষ্টভাবে জবাব দিল, "হুঁ।"

ওয়েটার এসে কফি আর খাবার টেব্‌লের উপর রেখে গেল। বিকাশবাবু প্লেট থেকে দুটো ফিশ ফিঙ্গার নিয়ে, আরও কাছে সরে এসে তিথির প্লেটে সেগুলো দিয়ে বললেন, "নিন, খান।"

বিকাশস্যারের হাঁটু আবার স্পর্শ করল তিথির শরীর। মুহূর্তের জন্য তার মনে হল, এবারের স্পর্শটা ইচ্ছাকৃত। তবে পরমুহূর্তেই সে ভাবল, ব্যাপারটা হতে পারে না। উনি শিক্ষক, বাবলুর মতো কত ছাত্রকেই না পড়ান, লোকে কত সম্মান করে। তা ছাড়া, বইদুটো করে তার কত উপকার করছেন ভদ্রলোক। নিজের চিন্তার জন্য নিজেকেই মনে মনে তিরস্কার করে কফির কাপে একটা ছোট্ট চুমুক দিল সে।

বিকাশবাবু একটা ফিশ ফিঙ্গার মুখে দিয়ে বললেন, "আপনার অ্যাপিয়ারেন্স, কথাবার্তা ভাল লেগেছে বলেই দুটো বই করছি। এই লাইনে যখন কাজ করছেন, তখন বই করা যে কত ঝামেলার ব্যাপার, তা নিশ্চয়ই জানেন? বই করার জন্য ইউনিয়নের নেতাদেরও সুপারিশ আসে। সেগুলো করতে হয়। ডিআই অফিসের লোকরাও স্বনামে-বেনামে বইয়ের ব্যবসা করে। অনেক পাবলিশারের সঙ্গেও ওদের যোগাযোগ থাকে। ডিআই অফিসের বই যত অখাদ্যই হোক না কেন, করতেই হবে। না হলে, স্কুলের কোনও ফাইল নড়বে না, রিটায়ার্ড টিচারদের প্রভিডেন্ট ফান্ড সই না হয়ে পড়ে থাকবে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, স্কুলে টাকা দেরিতে আসবে, টিচারদের মাইনে পরে হবে। তারউপর বইপিছু কমিশন পাওয়া যায় বলে অন্য বই করাবার জন্য অন্য টিচারদের ঝুলোঝুলি তো আছেই। আমি বলেই এসব চাপ সামলে আপনার বই করছি। নিন, ফিশফিঙ্গার তো পড়েই রইল!"

"স্যার, আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আপনি না থাকলে সত্যিই বইগুলো হত না। পাশের দুটো স্কুলেও গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে হবে না মনে হয়," প্লেটের দিকে হাত বাড়াতে গিয়েও থমকে গেল তিথি। বাবলুর মুখটা হঠাৎ ভেসে উঠেছে তার মনে। কুইন্‌স ক্যাফের ফিশ ফিঙ্গার খেতে চেয়েছিল ছেলেটা। তিথি বলেছিল, পুজোর সময় নিয়ে আসবে। কিন্তু পুজো আসতে এখনও অনেক দেরি। সে হাতটা গুটিয়ে নিল।

বিকাশসবাবুর হাঁটু এবার আলগোছে তিথির থাই স্পর্শ করল। এবার

BanglaBook.org

আর তার সরার উপায় নেই। পিঠ ছুঁয়ে রয়েছে কেবিনের পরদা। সরতে হলে টেব্‌লের বাইরে বেরিয়ে যেতে হবে তাকে।

কফিতে চুমুক দিয়ে তিনি পুরনো কথার খেই ধরে বললেন, "হ্যাঁ, যা বলছিলাম। এসব কাজ আমার দ্বারাই সম্ভব। আপনার সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেল। সামনের বছর আমাদের স্কুলে আপনার আরও গোটাদশেক বই করিয়ে দেব আর আশপাশের স্কুলগুলোকে বলে আরও গোটাদশেক। এক সিজনেই হাজারপঁচিশ আয়ের ব্যবস্থা হবে। আপনি শুধু আমার সঙ্গে একটু যোগাযোগ রেখে, কোঅপারেট করে চলবেন। কী, চলবেন তো? নিন, খান এবার। খাবারটা যে জুড়িয়ে গেল।"

তিথি টেব্‌লের দিকে চোখ রেখেই অস্পষ্টভাবে জবাব দিল, "হ্যাঁ স্যার, করব। আপনি এত করছেন আমার জন্য..."

উনি বলতে থাকলেন, "আপনি যদি চান, আমি অন্য একটা ব্যাপারও দেখতে পারি। স্কুলে তো সারাবছরই চক-খাতা-পেন ইত্যাদি স্টেশনারি লাগে। আমি হেডমাস্টারকে বলতে পারি। আপনি যদি কলেজ স্ট্রিট থেকে ওগুলো কিনে এনে..."

তাঁর কথাগুলো আর কানে ঢুকছে না তিথির। প্লেটে রাখা ফিশ ফিঙ্গারের দিকে তাকিয়ে কফির কাপ আলতো করে ঠোঁটে ছুঁইয়ে সে ভাবছিল বাবলুর কথা। সামান্য ক'টা খাবার। কতই বা দাম হবে? একশো টাকা? এর জন্যই বাবলুকে পুজো পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হচ্ছে! বাবলু স্কুল থেকে ফিরে ওর বন্ধুদের কথা গল্প করে। তারা কত জায়গায় বেড়াতে যায়, কতকিছু খায়, কতরকমের জামা-জুতো পরে, ব্যাগ-খাতা-পেন কেনে। কিন্তু তাকে তো কিছুই কিনে দেওয়া যায় না। ক'দিন ধরে জ্যামিতি বক্স কিনে দেওয়ার কথা বলছে ছেলেটা। সেটাও কিনে দেওয়া হল না এখনও। অথচ এরকম তো হওয়ার কথা ছিল না!

হঠাৎই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠল তিথি। কেউ যেন চাবুক চালাল তার দেহে। তিথির বাহুমূলের তলা দিয়ে বিকাশবাবু নিজের সন্ধানী হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তার ব্লাউজের ভিতর! সাপে কামড়ালেও বোধহয় এতটা চমকে উঠত না সে। ব্যাপারটা বোঝার পরের মুহূর্তেই একঝটকায় লোকটার হাত সরিয়ে দিয়ে আর্তনাদ করে লাফিয়ে উঠল সে। তার ধাক্কায় টেব্‌ল থেকে কাপ-প্লেট মাটিতে পড়ে ঝনঝন করে উঠল। সেই শব্দে একজন ওয়েটার ছুটে

BanglaBook.org

এল। কেবিন থেকে বেরিয়ে একধাক্কায় তাকে সরিয়ে তিথি ছুটল দরজার দিকে। ছুটতে ছুটতে সে শুনল, বিকাশবাবু ওয়েটারকে বলছেন, "সাহায্য চাইতে এসে জড়িয়ে ধরেছিল। আমি স্কুলমাস্টার, সঙ্গে সঙ্গে মেরেছি এক চড়। ভদ্রমহিলার বেশে বেশ্যাগিরি করতে এসেছিল!"

তিথির মনে হল, তার পায়ের তলার মাটি, বিশ্বচরাচর, সবকিছুই যেন টলছে! শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে বাড়ির দিকে দ্রুত পায়ে হাঁটতে থাকল সে। বাড়ির দরজায় পৌঁছে তার মনে হল, তার হৃৎপিণ্ড যেন ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বুকের উপরিভাগে অসম্ভব জ্বলুনি, একইরকম জ্বালা মনের ভিতরেও। বিকাশবাবুর শেষের কথাগুলো চরম আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল তার মনে। লোকটা স্কুলমাস্টার, সে যখন তাকে বলছে 'বেশ্যা', অন্য কেউ কি তখন তার কথা বিশ্বাস করত? হোটেলের লোকগুলো যদি তাকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিত? পুলিশকে কি বিশ্বাস করানো যেত যে, ভরদুপুরে বিকাশবাবুই তাকে হোটেলে ডেকে এনেছিলেন? মাঝে মাঝেই শোনা যায়, হোটেলে চলা মধুচক্র থেকে পুলিশ মহিলাদের গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ কি তাকে সেরকমই কেউ ভাবত না? ভাবত না কি যে, সংসার চালাবার জন্য মেয়েটা বেশ্যাবৃত্তির পথ বেছে নিয়েছে? কী হত তা হলে। গ্রিলের তালা কোনওরকম খুলে বাড়ির ভিতর ঢুকল তিথি। বাবলু ফেরেনি, অনি তখনও ঘুমোচ্ছে। ঘরের আলো জ্বালিয়ে তিথি ড্রেসিং টেব্‌লের সামনে দাঁড়িয়ে ব্লাউজটা ফুলে ফেলল, তারপর একটানে খসিয়ে ফেলল ব্রা। তার ডানস্তনের উপর লাল একটা ক্ষতচিহ্ন। যেন নরমাংসলোভী কোনও শ্বাপদের নখের স্বাক্ষর! বিকাশবাবুর হাতটা সরিয়ে দেওয়ার সময় এটা হয়েছে। চিহ্নটা একই সঙ্গে প্রচণ্ড জ্বালা ধরাচ্ছে তিথির শরীরে আর মনে। শাড়িটা কোনওক্রমে জড়িয়ে, আলোটা নিভিয়ে, খাটে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘুমন্ত অনির শরীরটা জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল সে। তার দু'চোখে আস্তে আস্তে নেমে এল ঘুম।

তিথির যখন ঘুম ভাঙল, তখন ঘর অন্ধকার, বাইরেও অন্ধকার নেমেছে। অনি পাশে নেই। দেওয়ালঘড়ির রেডিয়াম-অঙ্কিত ডায়ালের দিকে তাকিয়ে সে দেখল, প্রায় আটটা বাজে। এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল সে! সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় উঠে বসল তিথি। ঠিক সেই সময় পাশের ঘর থেকে তার কানে এল, "মিলবে না, মিলবে না, কিছুতেই মিলবে না..."

কিন্তু এ তো অনির গলা নয়, বাবলুর গলা!

BanglaBook.org

তিথি পরনের শাড়িটা ঠিকঠাক করে খাট থেকে নেমে, পাশের ঘরে গেল। ঘরে একটা ডিমলাইট জ্বলছে। বালিশ দিয়ে মাথা ঢেকে বিছানায় শুয়ে আছে বাবলু আর মাঝে মাঝে বেশ জোরে বলে উঠছে, "মিলবে না, মিলবে না, কিছুতেই মিলবে না!" তার পায়ের কাছে বিছানায় চুপচাপ বসে আছে অনি। সে তাকিয়ে আছে ছেলের দিকে।

"কী রে, কী ভুলভাল বকছিস তুই! স্কুল থেকে ফিরে আমাকে ডাকিসনি কেন? দ্যাখ তো, আটটা বাজে," বলতে বলতে ঘরের আলো জ্বালিয়ে বাবলুকে ঠেলা দিল তিথি। সে চুপ করে গেল, কিন্তু উঠল না। ছেলেকে ওঠাবার জন্য বালিশটা টেনে নিল তিথি। কিন্তু সেটা উলটোতেই আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠল সে। বালিশের গায়ে চাপচাপ টাটকা রক্ত!

বাবলুকে ঝাঁকিয়ে তিথি চিৎকার করে উঠল, "রক্ত কেন? বাবলু, কী হয়েছে তোর?"

বাবলু তন্দ্রাচ্ছন্ন গলায় অস্পষ্টভাবে শুধু বলল, "স্কুলে, স্কুলে..."

॥ ১২ ॥

পূর্বদিকের ঘুলঘুলি দিয়ে দিনের প্রথম আলো ঘরের মেঝে স্পর্শ করলেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েন শরদিন্দু। তার আগেই অবশ্য তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। খুব সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখছিলেন তিনি। বহুবছর পর আবার পরিবাড়ির ওদিকে যাওয়ার পর থেকেই বাড়িটা ইদানীং তাঁর স্বপ্নে হানা দিতে শুরু করেছে। তার স্বপ্নই দেখছিলেন শরদিন্দু। পরিবাড়ির পুকুরের এপাশে একটা জামরুলগাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। হাতে কাগজ-পেনসিল। বাড়িটার ছাদের দিকে তাকিয়ে আছেন শরদিন্দু। শরদিন্দু, না সরো নামের একটা ছেলে? ছাদের উপর দেখা যাচ্ছে এক কিশোরীকে, পরনে নীলচে পোশাক। সে দানা খাওয়াচ্ছে ছাদের আলসে বসে থাকা পেখমওয়ালা সাদা পায়রার ঝাঁককে। সরো তাকিয়ে দেখছে তাকেই। হঠাৎ সেই কিশোরী ছাদের উপর থেকে দেখতে পেল তাকে। হাতছানি দিয়ে ডাকল। কিন্তু সরো ভয়ে দাঁড়িয়েই রইল। দেউড়িতে দাঁড়িয়ে আছে লালপাগড়ি পরা দারোয়ান। মলিন পোশাকের ছেলেটাকে সে ভিতরে ঢুকতে দেবে কেন? আচমকা সেই

BanglaBook.org

কিশোরী ডানা মেলে উড়ে নেমে এল তার সামনে। বলল, "সরো, তুমি আমার ছবি আঁকছিলে কেন?"

সরো বলল, "কোথায় তোমার ছবি আঁকছিলাম? আমি তো তোমাদের বাড়ি আর পরির ছবি আঁকছিলাম।"

সেই কিশোরী তার হাতের কাগজটা টেনে নিয়ে বলল, "কোথায় পরির ছবি? এই তো তুমি আমার ছবি এঁকেছ!"

সরো তাকিয়ে দেখল, সত্যি তো! একটু আগে আঁকা ছাদের পরির ছবিটা হঠাৎই যেন এই মেয়েটার ছবি হয়ে গিয়েছে! সে আমতা আমতা করল, "কিন্তু আমি যে..."

মেয়েটা তার আগেই বলল, "আমার ছবি তো আঁকলে। এবার কী দেবে আমাকে?"

সরো জবাব দিল, "আমার তো কিছু নেই, কেউ নেই।"

তার পেনসিল-ধরা হাতের দিকে দেখিয়ে সেই কিশোরী বলল, "ওই যে, আংটিটা।"

সরোর আঙুলের লাল চুনি বসানো সাদা পাথরের আংটিটা মেয়েটা চায়। সরো চমকে উঠে বলল, "এটা আমার মা দিয়ে গিয়েছেন আমাকে। বলেছেন..."

মেয়েটা খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, "কী বলেছেন, আমি জানি। বলেছেন, তোমার বউকে দিতে। দাও, ওটা আমাকে দাও!"

সরো আংটিটা খুলে পরিয়ে দিল তার অনমিকায়। মেয়েটা এবার আবদার জুড়ল, "আমাকে কোথাও নিয়ে চলো, যেখানে আমার অনেক ছবি আঁকবে তুমি।"

সরো বলল, "কোথায় নিয়ে যাব তোমাকে? আমার তো তোমার মতো অত বড় বাড়ি নেই। কোথায় যাবে তুমি?"

মেয়েটা হেসে বলল, "তুমি আমাকে মনসার ঢিপিতে নিয়ে চলো। সেখানে অনেক জায়গা, অনেক রোদ, অনেক প্রজাপতি..."

মুহূর্তের মধ্যে তারা পৌঁছে গেল ঢিপির উপর। সত্যি সেখানে তখন উজ্জ্বল রোদে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রজাপতি উড়ছে। সেই কিশোরী তখন যুবতীতে পরিণত হয়েছে। তাকে ঘিরে উড়ে বেড়াচ্ছে লাল-হলুদ প্রজাপতির দল। তার চুলে, গ্রীবায়, বুকে এসে বসছে। সরো তাকে জিজ্ঞেস করল, "এখানে যে

BanglaBook.org

তোমাকে আনলাম, তার বদলে তুমি কী দেবে আমাকে?"

সেই যুবতী তার কথার কোনও জবাব দিল না। শুধু তার মুখটা এগিয়ে আনল সরোর দিকে। প্রজাপতির ডানার লাল রং সেই নারীর ঠোঁটে আঁকা...

ঠিক এই পর্যন্ত দেখেই ঘুমটা ভেঙে গেল শরদিন্দুর। স্বপ্নে দেখা ঘটনাটা হুবহু সত্যি না হলেও সত্যের বেশ কাছাকাছি। সত্যিই তো, সেই আংটিটা একদিন শরদিন্দু পরিয়ে দিয়েছিলেন পরিবাড়ির এক পরির হাতে। সেই আংটি আবার আজ স্বপ্নের মধ্যে ফিরে এল বহুবছর পর। স্বপ্নটা ভেঙে যাওয়ায় আক্ষেপ হল তাঁর। স্বপ্নেই সই, হয়তো সেই আংটির খোঁজ পাওয়া যেত।

আলো ফুটছে। বিছানা ছেড়ে উঠলেন শরদিন্দু। মুখহাত ধুয়ে, রোজকার মতো চা খেয়ে, নিজের রান্না চাপিয়ে বারান্দায় এসে বসলেন। কাকভোরেই গ্রিলের ফাঁকে খবরের কাগজ গুঁজে দিয়ে যায় কাগজওয়ালা। কাগজটা হাতে নেওয়ার সময় হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল, আজ স্কুল যাওয়ার আগে তাঁকে একবার প্রশান্তর নার্সিংহোম হয়ে যেতে হবে। এক্স রে রিপোর্টগুলো এসেছে। জানতে হবে কী হল। প্রশান্ত সকালেই যেতে বলেছে। বিকেলে সে কী যেন একটা কাজে বাইরে যাবে।

কাগজটা নিয়ে বারান্দায় চেয়ারে বসলেন শরদিন্দু। অন্যদিন তিনি ঘণ্টাখানেক ধরে খবরগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন। কিন্তু আজ হেডলাইন দেখার পর ভিতরের খবরগুলোয় মন বসাবার চেষ্টা করেও পারলেন না। শব্দ-অক্ষরগুলো যেন ভেসে ভেসে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে। তার পরিবর্তে তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠছে সদ্য দেখা স্বপ্নটা। সে যেন কড়া নাড়ছে শরদিন্দুর মনের গভীরে সযত্নে লুকিয়ে রাখা এক বন্ধ ঘরের দরজায়।

শরদিন্দু শেষপর্যন্ত বারান্দা ছেড়ে উঠে, প্রবেশ করলেন অন্য একটা ঘরে, খুলে দিলেন ঘরের বন্ধ জানালা। এই ঘরটা সাধারণত ব্যবহার করেন না, প্রয়োজনও হয় না। মাঝে মাঝে সপ্তাহে দু'-একবার ঘরটা খোলেন, ঝাড়পোঁছ করার জন্য। পুরনো কিছু জিনিসপত্র রাখা আছে ঘরটায়। একটা খাট, কয়েকটা বাক্স-প্যাঁটরা, ইজেল আর কিছু বিবর্ণ ক্যানভাস। অনেক পুরনো এই ক্যানভাসগুলো। একসময় ছবি আঁকতেন শরদিন্দু। এসব সেই সময়ের। আরও একটা জিনিস আছে এই ঘরে, তাঁর মায়ের বড় একটা বাঁধানো ফোটোগ্রাফ। ঘরের কোণে একটা নিচু টেব্‌লের উপর রাখা পরপর

BanglaBook.org

দুটো বড় টিনের তোরঙ্গ। প্রথমটা খুলিয়ে ভিতরের [illegible] কাঁচ করে একটা শাড়ির সাথে ন্যাপথলিনের গন্ধ [illegible] কিছু কাপড়চোপড়ের তলায় রাখা কাগজে মোড়া একটা [illegible] জানালার সামনে এসে তার বিবর্ণ মোড়কটা খুললেন তিনি। একটা [illegible] পেন্টিং, শরদিন্দুর নিজের আঁকা। [illegible] সেই [illegible] ছবি। [illegible] বুকের কাছে এখনও আছে সেই প্রজাপতিটা। [illegible] উজ্জ্বল [illegible] পাখা এখন ধূসর হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ দেখলে সেটাকে ছবির অংশ [illegible] মনে হবে। আসলে তা নয়। ছবির মেয়েটার মতো এই প্রজাপতিটাও [illegible] একদিন উড়ে বেড়াত পরিবাড়ির বাগানে। সেই বাগানে বসেই একদিন এই ছবি এঁকেছিলেন শরদিন্দু। হঠাৎ প্রজাপতিটা কোথা থেকে [illegible] এসে আটকে গিয়েছিল কাঁচা রঙে। সরো সরিয়ে দিতে চেয়েছিল প্রজাপতিটাকে বসু বলেছিল, "না, না, ওটা ওখানেই থাক। ও চিরদিন বেঁচে থাকবে তোমার বুকের মধ্যে।"

সেই প্রজাপতিটা কি আজও বেঁচে আছে তার বুকের মধ্যে, [illegible] ভাবলেন শরদিন্দু। ছবিটা আলোয় মেলে ধরে বেশ কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। মনে হল, ছবির মেয়েটা যেন হাসছে তাঁর দিকে চেয়ে।

এরপর তিনি তাকালেন, টেবিলে রাখা সেই ফোটোগ্রাফের দিকে। তাতে রয়েছেন শুভ্রবসনা এক নারী। চিন্তাক্লিষ্ট মুখ, তবে তাতে সৌন্দর্যের ছাপ স্পষ্ট। থুতনিতে একটা কৃষ্ণ তিল। তবে সাদাকালো ছবিতে কোনও রঙের স্পর্শ নেই। শুধু তার অনামিকার সাদা আংটির মাথায় একবিন্দু লাল রং ছিল। খুব ভাল করে খেয়াল না করলে সেটা বোঝাও যায় না। জ্ঞান হওয়ার পর মাকে কোনওদিন রঙিন পোশাকে দেখেননি শরদিন্দু। তাঁর জন্মের পরই অকাল বৈধব্য গ্রাস করেছিল মাকে। তারপর শুরু হয়েছিল ছেলেকে মানুষ করার জন্য তাঁর সংগ্রাম। বাবাকে কোনওদিন দেখেননি শরদিন্দু, বাবার একটা ছবি ছিল মায়ের কাছে। সেটাও কীভাবে যেন জলে ভিজে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। শরদিন্দু ছেলেবেলায় দেখেছিলেন ছবিটা, অস্পষ্ট একটা অবয়ব। তিনি মনে করার চেষ্টা করতেন, কেমন ছিল সেই অবয়ব। কিন্তু তা কোনওদিন ধরা দেয়নি। বরং এই শুভ্রবসনা নারীই ছিলেন তাঁর পৃথিবী।

মায়ের ছবির সামনে এসে দাঁড়ালেন শরদিন্দু। বহুদিন [illegible]

পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল এই ছবির সামনেই আর তারপরই বসু শেষবারের মতো বেরিয়ে গিয়েছিল এই বাড়ি ছেড়ে। সরো পিছন থেকে ডেকেছিল, "বসু, তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

বসু কোনও কথা না বলে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়েছিল সন্ধেবেলার কুয়াশায়। সেই শেষ দেখা। শরদিন্দু পরদিন জানতে পেরেছিলেন, বাবার সঙ্গে এই শহর ছেড়ে চলে গিয়েছে বসু।

আজও একটা প্রশ্ন তাড়া করে বেড়ায় শরদিন্দুকে। সে ওভাবে চলে গেল কেন? সে কি চিনতে পেরেছিল ছবিটাকে? পরিচারিকার সন্তান বলে শরদিন্দুর প্রতি তীব্র ঘৃণায়? একসময় পরিবাড়িতে কাজ নিয়েছিলেন সরোর মা। সরোর তখন বছরসাতেক বয়স। সদ্য প্রসূতি, বসুর রুগ্‌ণ মায়ের দেখাশোনার কাজ। বসুর জন্মের আগে থেকে বসুর জন্মের পর, তার মায়ের মৃত্যু পর্যন্ত কাজটা করেছিলেন তিনি। বসু তখন হাঁটতে চলতে, এমনকী, কথা বলতেও শেখেনি। তার তো তাঁকে চেনার কথা নয় অতবছর বাদে। তা হলে? এই প্রশ্নের উত্তর আজও খুঁজে পাননি শরদিন্দু।

বসুর সঙ্গে শেষ দেখা হওয়ার দিনটা আজও স্পষ্ট মনে করতে পারেন শরদিন্দু। মাঘের সেই বিকেলে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে, দরজা খুলে অবাক হয়ে গিয়েছিল সরো। বসু দাঁড়িয়ে আছে তার দরজায়! এই প্রথম সে এল তার বাড়িতে। সরো এতটাই বিস্মিত হয়েছিল যে, তাকে ভিতরে আসতে বলতেও ভুলে গিয়েছিল। তার বলার অপেক্ষায় না থেকে নিজেই ঘরে ঢুকে পড়েছিল বসু। ঘরে ঢুকেই সে বলেছিল, "কাল বাবা বম্বে যাচ্ছেন। আমি কিন্তু যাচ্ছি না। তিনমাস আমি এখানেই থাকব। সরলামাসি আমার সঙ্গে থাকবে। তা ছাড়া ঠাকুর-দারোয়ান তো রইলই। শেষপর্যন্ত আমার জেদের কাছে হার মানলেন বাবা।"

বসুর বাবা তখন কী একটা ব্যবসায় লগ্নি করার জন্য মাসতিনেকের জন্য বম্বে যাচ্ছিলেন, মেয়েকেও নিয়ে যেতে চাইছিলেন। কিন্তু বেঁকে বসেছিল বসু। কারণটা ছিল সরো। ক'দিন বাপ-মেয়েতে একটা মানসিক যুদ্ধ চলছিল। সেই যুদ্ধ জেতার পর আর তর সয়নি বসুর। খবরটা দিতে সে ছুটে এসেছিল সরোর বাড়িতে। সরো তার কথা শুনে অবাক হয়ে বলেছিল, "অতবড় বাড়িতে ঠাকুর-চাকরদের ভরসায় তুমি একলা থাকবে?"

বসু মৃদু হেসে কিছুদিন আগে তার হাতে সরোর পরিয়ে দেওয়া সেই

BanglaBook.org

আংটিটা দেখিয়ে বলেছিল, "একা কই? এটাও তো আমার সঙ্গে থাকবে।"

বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার পর একসময় সরো বলেছিল, " চলো, একজনের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।"

"কার সঙ্গে?" বিস্মিত বসু জানতে চেয়েছিল।

সূর্য ডুবে বাইরে তখন কুয়াশা নামব নামব করছে। বসুর হাত ধরে সরো তাকে পাশের ঘর থেকে টেনে এনেছিল এই ঘরে। আলো জ্বালিয়ে দু'জনে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছিল ছবিটার সামনে। বসুর চুনির আংটিটা মৃদু স্পর্শ করে সরো বলেছিল, "আমার মা। ওই দ্যাখো, ছবির মধ্যে তোমার হাতের আংটিটা।"

বসু তাকিয়ে ছিল ছবিটার দিকে। আর তারপরই...

মায়ের ছবির পাশে অয়েল পেন্টিংটা রাখলেন শরদিন্দু। পাশাপাশি দুই নারীর ছবি। খোলা জানালা দিয়ে আলো এসে পড়েছে দুটো ছবির উপর। শরদিন্দু চেয়ে রইলেন নিজের অতীতের দিকে।

আজ অন্যদিনের চেয়ে বেশ কিছুটা আগেই বাড়ি থেকে বেরোলেন শরদিন্দু। প্রশান্তর নার্সিংহোম হয়ে স্কুলে যেতে হবে। সাইকেলে নার্সিংহোম পৌঁছোতে মিনিটদশেক লাগল। রিসেপশনে ঢুকে তিনি দেখলেন, গতদিনের সেই মেয়েটাই রয়েছে, আর তার পাশে একটা চেয়ারে বসে আছে প্রশান্তর মেয়ে তিতাস।

BanglaBook.org

রিসেপশনিস্ট মেয়েটা কাউন্টারে দাঁড়িয়ে থাকা এক ভদ্রলোককে বলল, "না, আজ আর ডাক্তারবাবু পেশেন্ট দেখবেন না। আপনি কাল আসবেন।"

শরদিন্দু তাদের কাছে গিয়ে তিতাসের মাথায় হাত রেখে আদর করতে যেতেই সে মাথা সরিয়ে নিল। বিব্রত হলেও তিনি হেসে বললেন, "তোমার বাবা কই?"

তিতাস জবাব দিল না। রিসেপশনিস্ট মেয়েটি বলল, "স্যার চেম্বারেই আছেন। আপনি যান।"

শরদিন্দু দরজা ঠেলে চেম্বারে ঢুকতেই প্রশান্ত তাড়াতাড়ি সিগারেটটা পায়ের তলায় ফেলে উঠে দাঁড়াল। ঘরে মৃদু ধোঁয়ার কুণ্ডলী। তিনি তার বিব্রত ভাবটা কাটিয়ে দেওয়ার জন্য চেয়ারে বসতে বসতে হেসে বললেন, "তুমি আমার সামনে সিগারেট খেলেও আমি কিছু মনে করতাম না। তোমরা এখন

বড় হয়ে গিয়েছ। আমার এসব মিথ্যে সম্মানবোধ নেই। সম্মান-ভালবাসা হল ভিতরের ব্যাপার। তার সঙ্গে এসবের কোনও সম্পর্ক নেই।"

প্রশান্ত কোনও উত্তর দিল না। তাকে বেশ চিন্তিত মনে হল শরদিন্দুর। সে যেন একটু কষ্ট করেই হেসে বলল, "চা খাবেন, স্যার?"

শরদিন্দু বললেন, "না, আমি ভাত খেয়ে বেরিয়েছি। এখনই স্কুলে যেতে হবে।"

"আপনি কাল স্কুলে গিয়েছিলেন, স্যার?" জানতে চাইল প্রশান্ত।

"হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। কেন?"

প্রশান্ত বলল, "কিছু না, এমনি জিজ্ঞেস করলাম," তারপরই সে প্রসঙ্গ পালটে বলল, "আপনার রিপোর্টগুলো আমি দেখেছি। একজন অর্থোপেডিক ডাক্তারকেও দেখিয়েছি। খুবই অদ্ভুত ব্যাপার!"

"কী ব্যাপার?" জানার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন শরদিন্দু।

প্রশান্ত বলল, "আমি যতটুকু বুঝেছি, তাতে হাতে কোনও সমস্যা নেই আপনার।"

"তা হলে?"

প্রশান্ত সামান্য চুপ করে থেকে বলল, "আপনার কি কোনও সাইকায়াট্রিক সমস্যা ছিল? কোনওদিন দেখিয়ে ছিলেন কাউকে?"

শরদিন্দু বিস্মিতভাবে বললেন, "না তো। কেন?"

প্রশান্ত বলল, "ব্যাপারটা আপনি অন্যভাবে নেবেন না, স্যার। যে তিনটে কারণে ব্যাপারটা হতে পারে, তার মধ্যে প্রথম দুটো, অর্থোপেডিক আর নিউরো প্রবলেম আপনার নেই। থার্ড অপশন হল সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম। অনেকসময় মানসিক সমস্যার কারণেও এই ব্যাপার ঘটতে পারে।"

শরদিন্দু বললেন, "তার মানে, তুমি কি বলতে চাইছ যে..."

তাঁকে শেষ করতে না দিয়ে প্রশান্ত বলল, "আপনি ভুল বুঝবেন না। আমি সেরকম কিছু বলছি না। আসলে আমাদের সাবকনশাস মাইন্ডে অনেকসময় এমন কিছু ঘটে, যা আমরা বাইরে থেকে ঠিক ধরতে পারি না। যদিও সাইকোলজির ব্যাপারটা ঠিক আমার এক্তিয়ারভুক্ত নয়, তবে সাইকায়াট্রিস্ট আর নিউরোলজিস্টদের কাজের পরিধিতে কিছু ওভারল্যাপিং আছে, অর্থাৎ, কিছু কমন ফিল্ড আছে। তাই কিছুটা জানি আমি।"

শরদিন্দু বললেন, "তা হলে তোমার সাজেশন কী?"

BanglaBook.org

"একজন সাইকায়াট্রিস্টের সঙ্গে কনসাল্ট করতে পারলে ভাল হয়," তারপর একটু ভেবে জুড়ল, "আপনার ব্যাপারটা খুব একটা আকিউট নয়। এমনিই হয়তো ঠিক হয়ে যাবে। আপনি বরং আমাকে ক'টা দিন ভাবার সময় দিন। তারপর বলব," কথাগুলো বলে টেবিলের দিকে তাকিয়ে চুপ হয়ে গেল প্রশান্ত। শরদিন্দুর মনে হল, অন্য কোনও চিন্তায় ডুবে গেল সে।

শরদিন্দুকে স্কুলে যাওয়ার জন্য এবার উঠতে হবে। তিনি বললেন, "ঠিক আছে, তা হলে ক'দিন দেখি। আচ্ছা, তোমার কি শরীর খারাপ? কেমন যেন শুকনো দেখাচ্ছে!"

প্রশান্ত জবাব দিল, "আসলে এক পেশেন্টের ব্যাপারে চিন্তায় আছি। কাল রাতে ঘুম হয়নি।"

"শুধু পেশেন্টের নয়, নিজের শরীরের প্রতিও যত্ন নিয়ো।"

প্রশান্ত উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি এর মধ্যেই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে নেব, স্যার।"

শরদিন্দু যখন নার্সিংহোমের বাইরে এসে সাইকেলে উঠলেন, ঠিক তখনই একটা রিকশা এসে থামল। যে ভদ্রমহিলা রিকশা থেকে নামল, তাকে একঝলক দেখে শরদিন্দুর মনে হল, তাকে সম্প্রতি তিনি কোথাও যেন দেখেছেন।

॥ ১৩ ॥

হেডস্যার বললেন, "আজ প্রথমদিন, দুটোর বেশি ক্লাস করতে হবে না। নিচু ক্লাসই দিয়েছি। সিক্স বি আর সেভ্‌ন এ। ফার্স্ট আর সেকেন্ড পিরিয়ড। প্রথম ক'দিন নিচু ক্লাসগুলো নাও। ধাতস্থ হওয়ার পর উঁচু ক্লাস দেব। একতলাতেই দুটো ক্লাস। দরজার মাথায় লেখা আছে।"

অভ্র 'ঠিক আছে' বলে ঘরের বাইরে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময় অ্যাটেন্ড্যান্স খাতায় সই করার জন্য ঢুকলেন শরদিন্দু। তাঁকে প্রণাম করে অভ্র জিজ্ঞেস করল, "ভাল আছেন, স্যার?"

শরদিন্দু ঈষৎ বিস্মিত হয়ে বললেন, "তুমি?"

অভ্র জবাব দেওয়ার আগেই হেডস্যার বললেন, "অজিতবাবুর বদলে ওকে

BanglaBook.org

ডেপুটেশনে নিচ্ছি আমরা। অফিশিয়াল প্রসেস কমপ্লিট হতে মাসখানেক সময় লাগবে, কিন্তু আজ থেকেই ও ক্লাস নেবে। জেনারেল ফান্ড থেকে একমাস ওকে কিছু হাতখরচ দেব।"

শরদিন্দু কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন তাঁর প্রাক্তন ছাত্রের দিকে। অভ্রর যেন মনে হল, তাকে এই ঠিকে মাস্টারের চাকরিতে দেখে বেশ অবাকই হয়েছেন তিনি। পরক্ষণেই অবশ্য শরদিন্দু হেসে হেডস্যারকে বললেন, "ও কিন্তু খুব ব্রাইট ছেলে। আমি ওকে পড়িয়েছি। এই স্কুলেরই ছাত্র ছিল।"

হেডস্যারও পালটা হেসে বললেন, "শুনেছি। সেই জন্যই তো ওকে নেওয়া হয়েছে।"

শরদিন্দু এরপর অভ্রকে বললেন, "চলো, তোমাকে স্টাফরুমে নিয়ে যাচ্ছি। একটু দাঁড়াও, সইটা করে নিই।"

সই করে স্টাফরুমের দিকে এগোতে এগোতে শরদিন্দু জিজ্ঞেস করলেন, "আগে কি অন্য কোথাও চাকরি করতে?"

"না স্যার, শুধু টিউশন করি," লজ্জিতভাবেই জবাব দিল অভ্র।

"তোমার টেনশন লাগছে? আরে টেনশনের কোনও কারণ নেই। আমি তো আছিই। তা ছাড়া তুমি টিউশন তো করোই। ক্লাস নিতে অসুবিধে হবে না। তোমার বেসটাও ভাল," কথা বলতে বলতে তাকে নিয়ে স্টাফরুমে ঢুকলেন শরদিন্দু।

BanglaBook.org

লম্বা লম্বা টেব্‌ল ঘিরে বসে আছেন বেশ কয়েকজন। নিজেদের মধ্যে তারা কথা বলছেন বা কাগজ পড়ছেন। শরদিন্দু ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাঁদের উদ্দেশে বললেন, "মাস্টারমশাইরা, এ হল, অভ্র। অজিতবাবুর ডেপুটেশনে আজ থেকে আমাদের সহকর্মী হিসেবে কাজ করবে। ও আমাদের স্কুলেরই ছাত্র ছিল।"

এতবছর পরও তার নামটা স্যারের মনে আছে দেখে অভ্র বেশ অবাক হল।

যাঁরা বসে ছিলেন, তাঁরা শরদিন্দুর কথা শুনে একবার তাকালেন অভ্রর দিকে। একজন জানতে চাইলেন, "ভাইয়ের বাড়ি কোথায়?"

"এখানেই," সংক্ষিপ্ত জবাব দিল অভ্র।

আর-একজন মন্তব্য করলেন, "ভালই হল, আমার একটা ক্লাস কমাবার জন্য হেডস্যারকে এবার বলতে হবে! আপনি বসুন," বলেই পাশে বসে

থাকা এক শিক্ষকের সঙ্গে শেয়ারবাজারের ওঠাপড়া নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন।

এ ছাড়া তাকে নিয়ে কেউ উৎসাহ বোধ করল বলে মনে হল না অভ্রর। হয়তো সে পার্মানেন্ট স্টাফ নয় বলেই। একটু বাধোবাধো ঠেকলেও শরদিন্দুর পাশের চেয়ারে বসল অভ্র। তিনি তাকে বললেন, "অনেকদিন পর দেখা হল তোমার সঙ্গে। তোমাদের মতো পুরনো ছাত্রদের দেখতে খুব ইচ্ছে হয়। কিন্তু স্কুল ছেড়ে দেওয়ার পর কে কোথায় থাকে, তা তো জানা হয় না। মাঝে মাঝে কেউ সার্টিফিকেট তুলতে এলে দেখা হয়ে যায়। তা তুমি কি বরাবর এখানেই ছিলে? সংসার পেতেছ?"

অভ্র লজ্জা পেয়ে বলল, "না, না, ওসব কিছু এখনও হয়নি। আমি এখানেই ছিলাম।"

শরদিন্দু বললেন, "আসলে আমি স্কুল-বাড়ি ছাড়া খুব একটা রাস্তায় বেরোই না। ইদানীং অবশ্য বিকেলের দিকে একটু হাঁটতে যাই। তাও মনসার ঢিপির ওদিকে। তাই দেখা হয়নি। আমি ভাবতাম, তুমি চাকরি নিয়ে অন্য কোথাও..."

অভ্র ম্লান হেসে বলল, "আসলে বাবা মারা গেলেন, দাদাও চাকরি নিয়ে চলে গেল। সংসার আমার কাঁধে এসে পড়ল।"

শরদিন্দু কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "বুঝেছি।"

ওয়ার্নিং বেল বাজল। সকলে উঠে পড়লেন ক্লাসে যাওয়ার জন্য। অভ্রও উঠল। শরদিন্দুর প্রথম দুটো পিরিয়ডে ক্লাস নেই। তিনি অভ্রর পিঠ চাপড়ে বললেন, "যাও! ঘাবড়াবে না। ঠিক ম্যানেজ হয়ে যাবে।"

ক্লাসে ঢোকার আগে অভ্রর একটা চাপা টেনশন ছিল ঠিকই। কিন্তু ক্লাসে ঢোকার পর যেন সব দূর হয়ে গেল। কচি কচি সব মুখ উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। সে এখন তাদের মাস্টারমশাই! বই নিয়ে প্রথম ক্লাসে দশমিকের কয়েকটা অঙ্ক কষতে দিল অভ্র। ছেলেরা খাতা খুলে অঙ্ক কষতে শুরু করল। সেই ফাঁকে সে ক্লাসরুমের চারপাশে তাকাল। এই ক্লাসে বসে একসময় সে নিজে ক্লাস করেছে। সম্ভবত সিক্স অথবা সেভনে আর আজ সেখানে তাকে মাস্টারের ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে! ওই তো জানালার বাইরে সেই আঁশফলগাছের গুঁড়িটা দেখা যাচ্ছে। ঘরের বেঞ্চগুলোও একইরকম আছে। ছেলেরা অঙ্ক কষছে। কেউ কেউ আড়চোখে তাকাচ্ছে

BanglaBook.org

তার দিকে অথবা পাশের খাতার দিকে। ঠিক যেভাবে শরদিন্দুস্যারের ক্লাসে অভ্ররা একসময় তাকাত। ছেলেগুলোর মধ্যে অনেকদিন পর নিজেকে খুঁজে পেল অভ্র। দু'পাশে সার দেওয়া বেঞ্চে বসে আছে ছাত্ররা। মাঝখানে শেষ বেঞ্চ পর্যন্ত যাওয়ার প্যাসেজ। সেই ফাঁকা জায়গা ধরে, বেঞ্চের কোনাগুলো আলতো করে স্পর্শ করতে করতে পায়চারি করতে লাগল অভ্র। আঙুলের ছোঁয়ায় তাদের সঙ্গে যেন সাংকেতিক বাক্য বিনিময় হতে লাগল তার। ছোটবেলার কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই কেঠো বেঞ্চগুলোর সঙ্গে!

ঘণ্টা পড়ার আগে অভ্র নিজেই ব্ল্যাকবোর্ডে অঙ্কগুলো কষে বুঝিয়ে দিল। দ্বিতীয় ক্লাসেও বেগ পেতে হল না তাকে। বইয়ের প্রথমদিকের একটা চ্যাপটার থেকে নতুন কিছু অঙ্ক দেখিয়ে দিল, কয়েকটা কষতেও দিল। যারা পারল না, তাদের বুঝিয়ে দিল। ঘণ্টা পড়ার পর অভ্র যখন ক্লাস ছেড়ে বাইরে বেরোল, তখন নিজেকে বেশ আত্মবিশ্বাসী লাগছিল তার। ক্লাস থেকে বেরিয়ে হেডস্যারের ঘরে ঢুকতেই অভ্র দেখল একজন শিক্ষককে তিনি বলছেন, "শেষ পিরিয়ডের ঘটনা তো কী হয়েছে! ব্যাপারটা যখন আপনারা জানলেন, তখন আমাকেও জানানো উচিত ছিল।"

হেডস্যারের কথার জবাবে ভদ্রলোক কী একটা বলতে গিয়ে অভ্রকে দেখে চুপ করে গেলেন। হেডস্যার অভ্রকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, "ক্লাস করতে অসুবিধে হয়নি নিশ্চয়ই। হলে, আমাকে বা সিনিয়ার টিচারদের বলবে, ঠিক আছে? প্রথমদিন তোমাকে আর আটকে রাখব না। তুমি এখন বাড়ি যেতে পারো। কালও ঠিক সময় চলে আসবে। এসো তা হলে..."

অভ্রর মনে হল, তাঁদের আলোচনা যাতে ব্যাহত না হয়, তার জন্যই তাকে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে সরিয়ে দিলেন তিনি। বাড়ি ফেরার আগে একবার শরদিন্দুস্যারকে জানিয়ে যেতে পারলে ভাল হত। কিন্তু অভ্র তাঁর খোঁজ করে জানতে পারল, তিনি ক্লাসে গিয়েছেন। দুটো ক্লাস করিয়ে একেবারে টিফিনে ফিরবেন। প্রায় দেড়ঘণ্টার ব্যাপার। অপেক্ষা না করে সাইকেল নিয়ে সে স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। সকালে নীলার মোবাইল সুইচড অফ ছিল। কাল নাইটডিউটি ছিল ওর। সকালে ফিরে মনে হয় ঘুমোচ্ছিল। তাই তাকে ফোনে পায়নি সে। বাড়িতে গিয়ে নীলাকে ফোন করতে হবে, এই ভেবে অভ্র তাড়াতাড়ি প্যাডেল করতে শুরু করল।

বাড়ির কাছাকাছি হঠাৎ পিছন থেকে একটানা বাইকের হর্ন শুনে সে

BanglaBook.org

পিছন ফিরে দেখল সুবীর। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল অভ্র। সুবীরও দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, "কী রে, স্কুল যাসনি?"

অভ্র বলল, "গিয়েছিলাম। প্রথমদিন বলে দুটো ক্লাস করিয়ে ছেড়ে দিল। চ', বাড়িতে চ'।"

"কেন? তোর চাকরি উপলক্ষে ভালমন্দ কিছু রান্না হচ্ছে কি?"

অভ্র হেসে বলল, "সেসব কিছুই নয়। বাইরে রোদ, বাড়িতে গেলে বেশ আড্ডা দেওয়া যেত। আমিও যা খেতাম, তুইও খেতিস!"

সুবীর বলল, "ওসব বলে লাভ নেই, চাঁদু। আমার পাঁইটের ব্যাপারটা যেন খেয়াল থাকে," তারপর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে বলল, "দাঁড়ালামই যখন, তখন আয়, সিগারেট ফুঁকে নিই।"

রাস্তার পাশেই একটা গাছের ছায়ার দাঁড়াল দু'জনে। সিগারেট ধরাবার পর সুবীর একটা লম্বা টান মেরে বলল, "তোর কাজটা হয়ে যাওয়ায় আমি সত্যি খুব আনন্দ পেয়েছি। আমার তো শালা ভদ্রসভ্য কোনওকিছুই কোনওদিন হবে না। তোরটা অন্তত করা গেল, এটাই যা সান্তনা।"

অভ্র বলল, "কেন? তুই তোর নিজের জন্য নীহারদাকে কিছু বলতে পারিস না?"

সুবীর জবাব দিল, "আমার বিদ্যে তো তুই জানিসই। মাধ্যমিক ফেল। নীহারদা ভদ্রসভ্য কী চাকরি দেবে আমাকে? ওঁর জন্যই মিউনিসিপ্যালিটির ছোটখাটো কনট্র্যাক্টগুলো পাই। গাড়ির তেলের খরচটা নীহারদাই একজনকে বলে বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। মোটামুটি চলে যাচ্ছে। লোকে অবশ্য আড়ালে আমাকে নীহারদার চামচা বলে গালমন্দ করে, তবে সেসব ব্যাপার আমি গায়ে মাখি না। অনেক ভদ্রলোককে দেখেছি, এমনিতে তারা আমাকে দেখে নাক সিঁটকোয়, কিন্তু ঠেকায় পড়লে তারাই আবার পায়ে তেল মাখাতে আসে," সিগারেটে একটা টান দিয়ে সে যোগ করল, "এমন হবে না তো যে, তুইও এরপর আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিলি? দেখিস ভাই!"

"তার মানে?"

"মানে, তুই তো এখন মাস্টার হয়ে গেলি। হোক না টেম্পোরারি, মাস্টার তো! তোর স্টেটাস আজ থেকে বদলে গেল। তোকে রাস্তায় দেখলে ছাত্ররা, 'যাচ্ছি, স্যার' বলে সাইকেল হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে। গার্জেনরা বলবে, 'ভাল আছেন, স্যার? এরপর আমার সঙ্গে কথা বলতে তোর প্রেস্টিজে লাগবে।

BanglaBook.org

মাস্টার মাস্টার ভড়ং আসবে। ঢ্যামনা হয়ে যাবি।"

অভ্র সিগারেটে টান দিয়ে হেসে বলল, "মাস্টার হলে ভড়ং ধরতে হয়, তোকে শালা কে বলল?"

সুবীর বলল, "পাটি করি তো, এসব আমি অনেক দেখেছি। সবাই শালা নোংরা ঘাঁটে আর দোষ হয় আমাদের মতো লোকদের। ভড়ং অবশ্য সব পেশাতেই আছে, তবে অন্যদের সঙ্গে মাস্টারদের..." কথাটা আর শেষ করল না সুবীর।

অভ্র একটু মজা করে বলল, "থামলি কেন, বল?"

সুবীর তার ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, "আমাকে এখন এক জায়গায় যেতে হবে। তবে তার আগে একটা গল্প বলে যাই। কারও নাম জিজ্ঞেস করবি না। সকলেই তো লোকাল। তাই নাম বলা ঠিক হবে না। তুই এই গল্পটাও কারও কাছে করবিও না," সিগারেটে শেষ টান দিয়ে, সেটা ছুড়ে ফেলে একটু চাপাস্বরে সে বলতে শুরু করল, "বছরদশেক আগের ঘটনা। তখন আমি ড্যাম বেকার। পার্টিটার্টিও করি না। চারজন মিলে ইডেনে খেলা দেখতে গিয়েছি। আমি, একজন ডাক্তার, একজন ব্যাঙ্কের অফিসার আর একজন মাস্টার। আমি ছাড়া সবক'টা মালদার পার্টি। খেলার টিকিটও আমি ওদের পয়সায় দু'দিন আগে কেটে এনেছিলাম। একঅর্থে আমি তখন ওদের চামচা ছিলাম। যাই হোক, খেলা শুরু হওয়ার ঘণ্টাখানেক পরই বুঝলাম ইন্ডিয়া হারছে। বুঝতে পেরেই মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে এলাম আমরা। অন্যরা সকলেই আমার চেয়ে কিছুটা বড়। ভাবছিলাম, খেলা তো গেল, এখন কী করা যায়। ডাক্তার বলল, 'চল জন্নতে গিয়ে নাচ দেখে আসি!' বুঝতেই পারছিস, কোথায় যাওয়ার কথা বলছে!

"সঙ্গে সঙ্গে অন্যরাও রাজি হয়ে গেল। আমারও প্রবল উৎসাহ। প্রচুর গল্প শুনলেও সেখানে কোনওদিন যাইনি। তা ছাড়া আমি অবিবাহিত। নারীসঙ্গের লোভ তো থাকবেই! একটা ট্যাক্সি নিয়ে গেলাম সেখানে। ডাক্তার মনে হয় আগে গিয়েছিল। সে আমাদের নিয়ে সোজা ঢুকল একটা বাড়িতে। ভিতরে খুপরি খুপরি সব ঘর। ভিতরে দিনের বেলাতেও আলো ঢোকে না। একপাশে ঘোলাটে বাল্‌ব জ্বলছে। নানা বয়সের মেয়ে দাঁড়িয়ে বাড়ির উঠোনে। সেখানে যাওয়ার পর ঠিক হল, নাচ দেখব না। বরং লোকে যা করতে যায়, তা-ই করব।

BanglaBook.org

"চারজন চারটে মেয়ে বেছে নিয়ে চারটে ঘরে ঢুকলাম। আমি শালা কিছুই করতে পারলাম না। একে প্রথমবার আসা, তারউপর বাড়িতে ঢোকার আগে, গলির মুখে পুলিশ দেখেছি। যদি ফেঁসে যাই? কিছুক্ষণ পরই ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। আমার পরপরই ডাক্তার আর ব্যাঙ্ক অফিসারও বেরোল। কিন্তু মাস্টার আর আসে না। দরজার ফুটো দিয়ে তার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি, লোকটা তখনও চালাচ্ছে! একসময় সে বেরোল, একদম ফিটফাট হয়ে। ডাক্তার তাকে বলল, 'এতক্ষণ লাগল?' মাস্টার কী বলল, জানিস? বলল, 'আমি তো কিছুই করিনি। মেয়েটা কেন এই পেশায় এল, তার গল্প শুনছিলাম। তাই দেরি হল।' ব্যাপারটা ভাব একবার! বেশ্যার ঘরের বিছানায় শোওয়া মাইক ফুঁকে বলার ব্যাপার নয়! কিন্তু যাদের সঙ্গে তুই গিয়েছিস, বেশ্যাবাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে তাদেরকেই তুই সতীপনার ঢপ দিচ্ছিস! এবার বুঝলি, মাস্টারের পার্থক্য কোথায়?" একটানা কথাগুলো বলে হাসতে হাসতে বাইক স্টার্ট করল সুবীর। অভ্রও হেসে ফেলে উঠে বসল সাইকেলে।

বাড়ির সামনে সাইকেল থেকে নামতেই তার মোবাইল বেজে উঠল। মোবাইলটা বের করে সে দেখল, নীলার ফোন। কলটা রিসিভ করতেই নীলা বলল, "তুমি কোথায়? ক্লাস নিচ্ছ নাকি?"

অভ্র বলল, "না, দুটো ক্লাস করিয়ে ছেড়ে দিল। এখন বাড়ি ঢুকছি। তোমাকে সকালে ফোন করেছিলাম। সুইচড অফ বলল," তারপর জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি সকালে ঘুমোচ্ছিলে?"

নীলা উত্তর দিল, "আমি তো বাড়িই ফিরিনি!"

"তার মানে? তুমি এখন কোথায়? তোমার নাইটডিউটি ছিল না?"

নীলা বলল, "কাল থেকেই নার্সিংহোমে আছি। একটা ঘটনা ঘটেছে। তুমি স্কুলে কিছু শোনোনি?"

"কী শুনব?" বিস্মিত অভ্র জানতে চাইল।

নীলা বলল, "তোমাদের স্কুলেরই ঘটনা। একজন টিচার একটা বাচ্চা ছেলেকে ক্লাসে মেরেছিল। কানে আঘাত পায় ছেলেটা, ব্লিডিং হচ্ছিল। কাল রাত ন'টা নাগাদ আমাদের নার্সিংহোমে অ্যাডমিট করা হয় তাকে। কিন্তু আজ সকাল থেকে ছেলেটাকে পাওয়া যাচ্ছে না। হুলস্থুল কাণ্ড নার্সিংহোমে! পুলিশটুলিশ এসেছে। বাড়ি ফেরা হয়নি। কখন ফিরব, জানি না।"

অভ্র আশ্চর্য হয়ে বলল, "তাই নাকি? আমি স্কুলে বেশিক্ষণ থাকিনি।

BanglaBook.org

যতক্ষণ ছিলাম, ক্লাসেই ছিলাম। তাই হয়তো জানতে পারিনি। তা তোমার কোনও অসুবিধে বা ভয় নেই তো?"

"ভয় তো হচ্ছেই। আমিই ফর্মালিটিজ কমপ্লিট করে ওকে অ্যাডমিট করাই। আমিই তখন ডিউটিতে ছিলাম। পুলিশ আমাকেও জেরা করবে। যেহেতু অ্যাডমিটেড হওয়ার পর থেকেই ও নিখোঁজ, তাই এখন সব দায়িত্ব নার্সিংহোমের," কথাটা বলেই অভ্রকে আর কিছু জানার সুযোগ না দিয়ে নীলা বলল, "স্যার ডাকছেন, পরে ফোন করব।"

নীলা লাইনটা কেটে দিল।

॥ ১৪ ॥

শূন্য চোখে তাকিয়ে ছিল তিথি। তাকে ঘিরে অনেক লোক, কিন্তু তাদের কথাবার্তা কানে ঢুকছে না তার। চারপাশের মুখগুলো সব ঝাপসা মনে হচ্ছে। গলার কাছে বাতাস যেন দলা পাকিয়ে গিয়ে চাপ সৃষ্টি করছে। মাঝে মাঝে চোখের সামনে ভেসে উঠছে বাবলুর মুখটা। তার পাশের চেয়ার বসে, টেব্‌লের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে যাচ্ছে অনি। সে কিছু বুঝতে পারছে কি না, কারও জানা নেই। তিথির আর-একপাশে বসে আছে রিসেপশনের নীলা নামে মেয়েটা। টেব্‌লের অন্যদিকে বসে আছেন একজন পুলিশ অফিসার, ডক্টর প্রশান্ত চক্রবর্তী এবং ডক্টর মৈত্র। শেষোক্ত ব্যক্তিকে বাবলুর চিকিৎসার জন্যই কল দিয়েছিলেন প্রশান্ত। এ ছাড়া নার্সিংহোমের আরও কয়েকজন কর্মী তিথিদের ঘিরে দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

নীলা নামের মেয়েটা একটা জলের গ্লাস তিথির মুখের কাছে ধরে বলল, "জলটা খান, দিদি।"

তিথি কোনও জবাব দিল না।

নীলা এবার তাকে জড়িয়ে ধরে, বাচ্চাদের যেভাবে খাওয়ায়, ঠিক সেভাবেই জলটা ধীরে ধীরে খাইয়ে দিল। জল খাওয়ার পর ক্রমশ গলার কাছের দমচাপা ভাবটা কমে এল তিথির। কিছুটা হলেও তরতাজা লাগল। মুখের ভিতর একটা মিষ্টিভাব, সম্ভবত গ্লুকোজ মেশানো ছিল জলে। সকলে তাকিয়ে আছে তিথির দিকে।

BanglaBook.org

অফিসার ভদ্রলোক গলাখাঁকারি দিয়ে তিথিকে বললেন, "আপনার হাজ়ব্যান্ড তো কোনও স্টেটমেন্ট দিতে পারবেন না। কমপ্লেন আপনাকেই লজ করতে হবে। যা ঘটেছে, আপনি খুলে বলুন। ভয়ের কোনও কারণ নেই। আস্তে আস্তে বলুন, কী হয়েছিল?"

তিথি আরও মিনিটদুয়েক সময় নিয়ে বলতে শুরু করল, "কাল স্কুলে গিয়েছিল বাবলু। ও বয়েজ় স্কুলের ক্লাস ফাইভের ছাত্র। আমি দুপুরে একটা দরকারে বেরিয়েছিলাম। ফিরে এসে চারটে নাগাদ শুয়ে পড়ি। সাড়ে চারটের সময় বাবলুর স্কুল ছুটি হয়। পাঁচটার মধ্যে ও বাড়ি ফেরে। হয়তো সেই সময়ই কাল ফিরেছিল। রাত আটটার সময় ঘুম ভাঙে আমার। পাশের ঘর থেকে ওর গলা শুনতে পাই। গিয়ে দেখি, অন্ধকার ঘরে বালিশে মাথা ঢেকে ও শুয়ে আছে, ভুল বকছে। ওর বাবা বসে আছে পায়ের কাছে। আলো জ্বেলে ওর কাছে গিয়ে বালিশ সরাতেই বুঝতে পারি, বাবলুর কান থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। ছেলেটা ভাল করে কথা বলতে পারছিল না। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করায় ও শুধু বলল, 'ক্লাসে স্যার মেরেছে।' রক্ত দেখে আমি ভয় পেয়ে যাই। ন'টার সময় এখানে ওকে নিয়ে আসি। ডাক্তারবাবু ওকে ভরতি করে নিলেন," একটানা কথাগুলো বলে হাঁপ ধরে গেল তিথির। একটু দম নিয়ে সে বলল, "বাবলুকে ভরতি করে নেওয়ার পর ডাক্তারবাবু ওষুধ দিলেন। ও ঘুমিয়ে পড়ার পর উনি বললেন, আমার আর এখানে থাকার দরকার নেই। স্বামী অসুস্থ, বাড়িতে তালাবন্ধ করে রেখে এসেছি। আমি তাই বাড়ি ফিরে গেলাম। আজ সকাল সাড়ে ন'টার সময় যখন এখানে আসবার জন্য তৈরি হচ্ছি, তখনই ডাক্তারবাবু ফোন করে তাড়াতাড়ি আসতে বললেন। এখানে এসে শুনি..." কথাটা শেষ না করে অনির্বাণকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল তিথি।

অফিসার প্রশান্তকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কখন বুঝতে পারলেন যে, ছেলেটা বেড়ে নেই? তা ছাড়া এই ধরনের কেস হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে এলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেওয়ার কথা। কাল রাতে খবরটা দেননি কেন?"

"আমি সকাল সাড়ে সাতটার সময় ওর কেবিনে গিয়েছিলাম। তখন ও সদ্য ঘুম থেকে উঠেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম 'কেমন আছ?' ও জবাব দিল, 'ভাল'। তবে বাচ্চাটার মুখ দেখে মনে হল, ওর ভয় তখনও কাটেনি।

BanglaBook.org

ও জিজ্ঞেস করল 'মা কোথায়?' আমি বললাম, 'ভয় পেয়ো না। তোমার মা একটু পরেই আসবেন।' ও মোটামুটি ঠিক আছে দেখে, আমি ওর কেবিন থেকে বেরিয়ে আসি। এরপর আটটার সময় নার্সিংহোমের একজন স্টাফ খাবার নিয়ে কেবিনে ঢুকে দেখে ও নেই। তারপরই ধরা পরে ব্যাপারটা," একটু থেমে অফিসারের দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে প্রশান্ত বলল, "এটা ঠিকই যে, এই ধরনের কেসে পুলিশকে ইন্টিমেশন দেওয়া উচিত। ব্যাপারটা নিয়ে আমি আর ডাক্তার মৈত্র আলোচনাও করেছি। যেহেতু ঘটনাটা স্কুলকেন্দ্রিক, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের স্পর্শকাতর বিষয়, সেজন্য আমরা অন দ্য স্পট ডিসিশন নিতে পারিনি। তা ছাড়া কাল রাতে ও স্টেটমেন্ট দেওয়ার অবস্থাতেও ছিল না। আমরা শেষপর্যন্ত আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিই যে, আজ সকালে ছেলেটা ও তার অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা নেব।"

ডাক্তার মৈত্রও এবার প্রশান্তর বক্তব্য সমর্থন করে বললেন, "হ্যাঁ, কেসটায় স্কুলের ব্যাপার না থাকলে আমরা হেজিটেট করতাম না।"

অফিসার বললেন, "ওর স্কুলে কোনও খোঁজখবর নেওয়া হয়েছিল? ঘটনাটা কী ঘটেছিল, জানতে পেরেছেন?" প্রশ্নগুলো তিথির উদ্দেশেই করলেন তিনি।

তিথি জবাব দিল, "না, আমি স্কুলে যাইনি। ও কোনও নাম বলেনি। শুধু বলছিল, 'স্যার মেরেছে।'"

অফিসার বললেন, "স্কুলে খোঁজ নেওয়াটা জরুরি। আপনাদের কারও কাছে স্কুলের টেলিফোন নাম্বার আছে?"

ঘাড় নাড়ল তিথি। প্রশান্তও বলল, "না, নেই।"

"আপনি আমাদের খবর দিয়েছেন ঠিকই। কিন্তু এই ভদ্রমহিলার স্টেটমেন্টই আসল। আপনার নার্সিংহোম থেকেই ছেলেটা হারিয়েছে। উনি যদি আপনার বিরুদ্ধে কমপ্লেন করেন, সেটাও আমাকে নিতে হবে," প্রশান্তকে কথাটা বলে তিনি তিথির দিকে ফিরে বললেন, "আপনি কার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে চান? নার্সিংহোম, না স্কুল কর্তৃপক্ষ?"

তিথি শুধু বলল, "ওকে আপনি খুঁজে দিন।"

অফিসার বললেন, "তার জন্য আমাকে মিসিং ডায়েরি নিতে হবে। আপনাকেও বলতে হবে, মিসিং হওয়ার পিছনে আপনার অ্যাপ্রিহেনশন কী? একটা ছেলে তো হুট করে চলে যেতে পারে না! আচ্ছা, আপনার

BanglaBook.org

কোনও আত্মীয়স্বজন বা ওর নিজের কোনও বন্ধুবান্ধবের বাড়ি চলে যায়নি তো?"

তিথি মৃদু স্বরে জবাব দিল, "আমার কোনও আত্মীয়স্বজন নেই। ওর কোনও বন্ধুবান্ধবও নেই।"

প্রশান্ত বলল, "আমরা চারপাশে খুঁজেছি ওকে। রাস্তা, রেলস্টেশন, বাসস্টপ, সব জায়গায় দেখেছি।"

অফিসার ঘড়ি দেখে বললেন, "এখন বিকেল পাঁচটা। সারাদিন কেটে গেল। আজ আপনাদের একবার স্কুলে যাওয়া উচিত ছিল। তাতে হয়তো কোনও সূত্র মিলতে পারত। যাই হোক, আমাকে এবার উঠতে হবে। কী করবেন, বলুন?"

প্রশান্ত বলল, "হ্যাঁ, আমাদের সেখানে একবার যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু স্কুল বলেই..."

অফিসার কয়েকমুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর বললেন, "আপনারা 'স্কুল-স্কুল' করছেন। আমিও স্কুলে পড়াশোনা করেছি, আমার ছেলেমেয়েও করে। মাস্টারদের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলি, সংখ্যায় অল্প হলেও, কিছু মাস্টারমশাই স্কুলের চাকরি না নিয়ে আমাদের মতো পুলিশের চাকরি নিলে ভালো করতেন! চোর-ছ্যাঁচোড়, ক্রিমিনাল নিয়েই আমাদের কাজ। পেশার খাতিরে, আইনি-বেআইনি যাই হোক, আমাদের মারধর করতে হয়। কিন্তু মাস্টাররাই যদি পুলিশের ভূমিকা নেন, তা হলে কিছু বলার থাকে না! গত একবছরের খবরের কাগজ খুললে স্কুল নিয়ে এরকম অন্তত পঞ্চাশটা কেস দেখতে পাবেন।"

কেউই এই কথার কোনও জবাব দিল না।

পুলিশ অফিসারটি ফের বললেন, "আমাদের ডিপার্টমেন্টের নানা দুর্নাম। পুলিশ ঘুষ নেয়, পলিটিক্যালি মোটিভেটেড হয়, এসব কথা আমি সরাসরি অস্বীকারও করি না। কিন্তু আমাদের মুশকিল অন্য জায়গায়। এই ভদ্রমহিলার কমপ্লেনের ভিত্তিতে, ঘটনার সত্যতা বুঝে আমরা কোনও শিক্ষককে অ্যারেস্ট করলেই কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে! শিক্ষাক্ষেত্রে পুলিশের আক্রমণকে ধিক্কার জানিয়ে শিক্ষকরা মিছিল-মিটিং করবেন। নানা পলিটিক্যাল কর্নার থেকে চাপ আসবে। আর যদি কোনও স্টেপ না নিই, তবে মিডিয়া বলবে, পুলিশ নোট খেয়েছে! শাঁখের করাতের নীচে আমরা দাঁড়িয়ে। আপনারা আর-একটু

BanglaBook.org

খোঁজখবর করুন। আমিও খেয়াল রাখছি। আজ রাতের মধ্যে যদি বাচ্চাটাকে না পাওয়া যায়, কাল সকালে থানায় আসবেন," এই বলে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

প্রশান্ত, তিথিকে বলল, "আপনার যদি নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাকে, তা হলে এখনই করতে পারেন। আমি বাধা দেব না।"

তিথি অস্পষ্টভাবে জবাব দিল, "আমি কিছু করতে চাই না। আপনারা বাবলুকে ফিরিয়ে দিন।"

প্রশান্ত, পুলিশ অফিসারের উদ্দেশে বলল, "আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি ওকে খোঁজার। স্কুলের টেলিফোন নাম্বারটা জোগাড় করে হেডমাস্টারমশাইকেও ধরার চেষ্টা করছি।"

তার কথা শেষ হতে না-হতেই দেওয়ালের কাছে দাঁড়ানো নার্সিংহোমেরই এক কর্মী বলল, "আমার কাছে ওঁর মোবাইল নম্বর আছে। উনি আমার বাড়ির কাছেই থাকেন।"

পুলিশ অফিসার যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালেন। বললেন, "দেখুন তো, ভদ্রলোককে ফোনে পান কি না?"

পকেট থেকে সেলফোন বের করে নার্সিংহোমের লোকটা নম্বর ডায়াল করে, "এই নিন স্যার, রিং হচ্ছে," বলে ফোনটা এগিয়ে দিল প্রশান্তর দিকে। ফোনটা হেডমাস্টারই রিসিভ করলেন। প্রশান্ত নিজের পরিচয় দেওয়ার পর তাঁকে বলল, "কিছু মনে করবেন না, একটা বিশেষ কারণে আপনাকে বিরক্ত করছি। গতকাল রাতে আমার নার্সিংহোমে কানে ইন্‌জুরি নিয়ে একটা বাচ্চা ছেলে অ্যাডমিট হয়। আপনার স্কুলেরই ক্লাস ফাইভের ছাত্র। নাম কিংশুক মজুমদার। ও বলেছে, স্কুলের কোনও স্যার নাকি ওকে মেরেছেন। ছেলেটির পরিবার আমার বিশেষ পরিচিত। এ ব্যাপারে আপনি কি কিছু বলতে পারবেন?"

এরপর মিনিটখানেক কথা চলল। কী কথা হল, তা জানার জন্য অপেক্ষা করছিলেন ঘরের সকলেই। কথা শেষ হলে প্রশান্ত, অফিসারকে বলল, "হেডস্যার বললেন, গতকাল শেষ পিরিয়ডে এরকম একটা কিছু ঘটেছে বলে শুনেছেন। ঘটনার ডিটেলস তিনি জানেন না। তিনিও খোঁজ নিয়ে দেখছেন। যার ক্লাসে ঘটনাটা হয়েছে, সেই বিকাশস্যারের সঙ্গে এখনই কথা বলবেন বললেন।"

BanglaBook.org

বিকাশস্যার! নামটা যেন গরম সিসে ঢেলে দিল তিথির কানে! ঘৃণায় কুঁকড়ে উঠল তার চেতনা। লোকটা কি জানতে পেরেছিল, কিংশুক তিথিরই ছেলে? তাই কি রেস্তরাঁ থেকে স্কুলে ফিরে গিয়েই তার উপর প্রতিশোধ নিল?

তিথি নিজেকে সামলাতে না পেরে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার উঠল, "আমি এখনই কমপ্লেন লেখাব বিকাশস্যারের নামে। আমার ছেলেকে ও মেরেছে। ওর জন্যই আমার ছেলেকে পাওয়া যাচ্ছে না। আপনি পুলিশের খাতায় ওর নাম লিখে নিন, স্যার। আমি ওকে ছাড়ব না..." কথাটা শেষ করতে না পেরে হাউহাউ করে কেঁদে উঠল সে।

তিথি কাঁদতে কাঁদতে নীলার হাতদুটো ধরে বলতে লাগল, "আমার একটাই ছেলে। তুমি জানো না, কত কষ্ট করে আমি ওকে মানুষ করছি। ওর যদি কিছু হয় আমরা বাঁচব না!"

অফিসার আবার বসে পড়লেন চেয়ারে। বললেন, "ঠিক আছে, আমি কমপ্লেন নিচ্ছি।"

তিনজনের এজাহার লিপিবদ্ধ করলেন তিনি। তিথি, প্রশান্ত এবং কেসটা সে-ই প্রথম হ্যান্ডল করেছে বলে নীলারও স্টেটমেন্ট নেওয়া হল। সইসাবুদ হওয়ার পর তিনি বললেন, "আশা করি আপনারা কেউ স্টেটমেন্ট পালটাবেন না।"

ঠিক এই সময় এতক্ষণ নিশ্চুপ থাকার পর অনির্বাণ হঠাৎ বলতে শুরু করল, "মিলবে না, মিলবে না... কিছুতেই মিলবে না।"

অফিসার একবার তার দিকে তাকিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

তিনি বেরিয়ে যাওয়ার পর তিথি ক্ষুব্ধ হয়ে প্রশান্তকে জিজ্ঞেস করল, "কেন আমার জীবনেই এসব ঘটে, বলুন তো? আপনার বন্ধুর মাথাটা কেন হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল? কেন আমার ছেলেটার সঙ্গে এই ঘটনা ঘটল?"

প্রথম এবং তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরটা জানা না থাকলেও, দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটা অনিকে পরীক্ষার পর জানা হয়ে গিয়েছে প্রশান্তর। মুহূর্তের জন্য তার চোখের সামনে ভেসে উঠল শরদিন্দুস্যারের মুখ।

BanglaBook.org

॥ ১৫ ॥

আগেরদিন বাজার যাওয়ার পথে, স্টেশনের পাশে একটা সাইবার ক্যাফের বাইরে ট্রেন-ফ্লাইটের টিকিট বুকিং-এর বিজ্ঞাপন দেখেছিলেন বসুধরা। পরিটা নিতে পরশু আসবে লোকগুলো। তার পরদিন ফিরে যাবেন তিনি। তাই আজ পল্টুকে নিয়ে এসেছিলেন সাইবার ক্যাফেতে। ফ্লাইটের টিকিট হয়ে গেল। সাইবার ক্যাফে থেকে বেরিয়ে রিকশায় উঠতেই, পল্টু জানতে চাইল, "তুমি কবে চলে যাচ্ছ, ঠাকুমা?"

বসুধরা জবাব দিলেন, "পরশুর পরদিন।"

"আবার কবে আসবে ঠাকুমা?"

বসুধরা হেসে জবাব দিলেন, "আমি অনেকদূরে থাকি। আর হয়তো আসা হবে না।"

পল্টু বিষণ্ণভাবে বলল, "তুমি প্লেনে ঘুরে বেড়াও, এই রিশকাঅলা পল্টুকে তোমার মনে থাকবে তো?"

বসুধরা বুঝতে পারলেন, এই ক'দিনে তাঁর উপর একটা মানসিক টান তৈরি হয়েছে ছেলেটার।

বসুধরা জবাব দিলেন, "মনে থাকবে না কেন, নিশ্চয়ই মনে থাকবে," তারপর একটু ভেবে বললেন, "আচ্ছা, যাওয়ার আগে তোকে কী দিয়ে যাই, বল তো? আমার জিনিসগুলো তো তোকে দেবই। তা ছাড়া?"

পল্টু বলল, "আর কী দেবে? রোজকার ভাড়া দিচ্ছ, অতগুলি জিনিস দিচ্ছ। আর কিছু দিতে হবে না।"

বসুধরা হেসে বললেন, "কেন, তোর কিছুর দরকার নেই?"

পল্টু রিকশা টানতে টানতে বেশ দার্শনিকের মতো জবাব দিল, "দরকার মনে করলেই দরকার, না দরকার মনে করলে নেই! চাওয়ার কোনও শেষ নেই। চাইতে শুরু করলে চাওয়া বেড়ে যায়। তখন না পেলে দুঃখ বাড়ে। তাই আমি বেশি কিছু চাই না।"

"এত জ্ঞানের কথা তুই শিখলি কার কাছে?" বসুধরা অবাক হলেন।

পল্টু বলল, "এখানে সনাতন বাউল বলে একটা লোক আছে। একতারা বাজিয়ে পথে পথে ঘোরে। মনসার ঢিপির ওধারে একটা কুঁড়েতে থাকে। লোকটা বলে, তার কিছু নেই বলে সে শান্তিতে আছে। আমি মাঝে মাঝে

BanglaBook.org

তার কাছে যাই। কিছুটা দেখেও শিখেছি। সকলে শুধু চাই চাই করে। তাই কেউ শান্তিতে নেই।"

বসুধরা এবার বললেন, "আচ্ছা, আমার কাছে তোর চাহিদার কথা ছেড়েই দে। ভগবানের কাছ থেকে তোর কিছু চাওয়ার নেই?"

সে বলল, "একটাই জিনিস চাওয়ার ছিল। সেটাও পেয়ে যাচ্ছি।"

"কী জিনিস?" জানতে চাইলেন বসুধরা।

পল্টু লাজুকস্বরে বলল, "একটা বাচ্চা। আজকালের মধ্যেই মনে হয় হবে। বউকে সকালে হাসপাতালে ভরতি করে এসেছি। আজ আর অন্য ভাড়া টানব না। তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আমি হাসপাতালে যাব।"

বসুধরা বললেন, "বাহ্, এ যে দারুণ খুশির খবর! ছেলে, না মেয়ে, কী হলে খুশি হবি তুই?"

পল্টু উত্তর দিল, "যা-ই হোক, আমি খুশি হব। আমি সুখী।"

তার কণ্ঠস্বরে এক প্রকৃত সুখী মানুষের খোঁজ পেলেন বসুধরা। তাঁর মনে হল, এই মানুষগুলোর তেমন কোনও চাওয়াপাওয়া নেই বলেই এরা হয়তো সুখী। কিন্তু তিনি নিজেও তো জীবনে খুব বেশি কিছু চাননি। তা হলে তিনি সুখী হলেন না কেন? তবে কি তাঁর অবচেতনে কোনও চাহিদা ছিল? নিজের ভাবনার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করতে লাগলেন বসুধরা। রিকশা এগিয়ে চলল।

সাড়ে চারটে বাজে। স্কুল ভেঙেছে। ছাত্ররা হইহই করতে করতে স্কুল থেকে বেরচ্ছে। ধুলো উড়ছে রাস্তায়। রিকশার গতি একটু কমল। গেটের সামনে ছাত্রদের জটলা। স্কুলগেটের সামনে জটলা করে থাকা রিকশার হর্নের প্যাঁকপ্যাঁক শব্দে চিন্তাজাল ছিন্ন হল বসুধরার। পল্টু বলল, "এখানে একটু দাঁড়াবে, ঠাকুমা?"

"কেন রে?"

"একজন স্যার আমাকে একটা বই দেবেন বলেছিলেন। দেখি, পাওয়া যায় কি না। আমার পাশের ঝুপড়িতে একটা মেয়ে থাকে। তার জন্য আমি ওই স্যারের কাছ থেকে মাঝেমধ্যে বই নিয়ে যাই। স্যাররা বিনে পয়সার বই পান। তার থেকে আমাকে দেন।"

বসুধরা এবার হেসে বললেন, "তবে যে তুই সেদিন স্যারদের নামে নিন্দে করছিলি? ভাল স্যারও তো আছেন তা হলে। ঠিক আছে, তুই যা।"

রিকশাটা স্কুলগেটের উলটোদিকের রাস্তার একপাশে থামিয়ে, রিকশা

থেকে নামতে নামতে পল্টু বলল, "ভাল স্যারও আছেন। তাঁরা গরিবদের বইখাতা দেন, ছাত্তরদের পড়ান, পয়সা নেন না। অমন কয়েকটা মানুষের জন্যই তো স্কুলটা টিকে আছে।"

পল্টু রাস্তা পেরিয়ে স্কুলের গেটের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। রিকশায় বসে গেটের ভিতরে তাকালেন বসুধরা। বড় স্কুলবাড়ি দেখা যাচ্ছে। তাঁর পরিচিত বলতে, গেটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সেই বুড়ো বটগাছটাই আছে। আরও বুড়িয়ে গিয়েছে সে। তাঁর মনে পড়ল, ছোটবেলায় একবার সরস্বতীপুজোর দিন হরিপদকাকার সঙ্গে এই স্কুলে ঠাকুর দেখতে এসেছিলেন। কত যুগ আগের কথা সেসব!

স্কুলের সামনের ভিড়টা ফাঁকা হয়ে আসছে। মিনিটপাঁচেক পর পল্টুকে বেরিয়ে আসতে দেখলেন বসুধরা। সঙ্গে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক। সম্ভবত কোনও মাস্টারমশাই, তাঁর সঙ্গে সাইকেল। মাথা ঝুঁকিয়ে পল্টুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে আসছেন তিনি। পল্টুর হাতে একটা বই। গেটের সামনে এসে, কথা শেষ করে সাইকেলে চাপার সময় মুখটা উপরে তুললেন তিনি। বটের ঝুরির ফাঁক গলে সূর্যের রশ্মি এসে পড়ল তাঁর মুখে। রিকশায় বসা বসুধরার সঙ্গে যেন চোখাচোখিও হল মুহূর্তের জন্য। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলেন বসুধরা। এ কাকে দেখলেন তিনি! ভাল করে দেখার আগেই সেই মাস্টারমশাই সাইকেল নিয়ে রাস্তার ভিড়ে মিশে গেলেন। বসুধরা আপ্রাণ চেষ্টা করলেন তাঁকে দেখার।

BanglaBook.org

"ও ঠাকুমা, ওদিকে কী দেখছ? বইটা ধরো একটু," রাস্তা পেরিয়ে রিকশার কাছে এসে পল্টু যখন বসুধরাকে ডাকল, তখনও তিনি খোঁজার চেষ্টা করছেন কয়েকমুহূর্ত আগে দেখা মানুষটাকে।

পল্টুর ডাকে হুঁশ ফিরল তাঁর। তিনি একটু ইতস্তত করে জানতে চাইলেন, "তুই যাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে এলি, উনি কে? ওই ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা লোকটা?"

পল্টু বলল, "উনি তো শরদিন্দুস্যার। উনিই তো বই দিলেন আমাকে। নাও, বইটা ধরো।"

হাত বাড়ালেন বসুধরা।

পল্টু বইটা হাতে দিতে গিয়ে বলল, "ও ঠাকুমা, তোমার হাত কাঁপছে যে! শরীর খারাপ করছে কি?"

"কই, না তো," বলে নিজেকে সামলে নিয়ে, তাড়াতাড়ি বইটা তার হাত থেকে নিলেন বসুধরা। পল্টু আবার তার সিটে বসে পা দুলিয়ে চুপ দিল।

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে আরও কিছুক্ষণ সময় লাগল বসুধরার। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোদের এই শরদিন্দুস্যার কেমন রে?"

পল্টু জবাব দিল, "খুব ভাল লোক। ওনাকে সবাই খুব মানে। টিউশন করেন না।"

"টিউশন করেন না বলেই ভাল লোক?"

"তা নয়। উনি খুব ভাল পড়ান। গরিব ছেলেদের খাতা-পেন কিনে দেন। প্রাণে দয়াধম্ম আছে। আমি শুনেছি, অনেক বড় বড় লোক ওনার ইস্টুডেন্ট। ব্যবহারও খুব ভাল। আমি বই আনতে স্যারের বাড়ি কয়েকবার গিয়েছি।"

বসুধরা বললেন, "ওঁর বাড়ি গিয়েছিস! তুই জানিস, কে-কে আছেন ওঁর বাড়িতে?"

পল্টু জবাব দিল, "কেউ নেই, ঠাকুমা। উনি সংসার করেননি। লোকে বলে, ছাত্তরদের নিয়েই নাকি উনি জীবন কাটিয়ে দিলেন।"

বসুধরা বললেন, "তুই আমাকে ওঁর বাড়ি নিয়ে যেতে পারবি?"

পল্টু জবাব দিল, "হ্যাঁ, পারব। কবে যাবে, বলো?"

বসুধরা চুপ করে রইলেন। কীভাবে তিনি তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন? সে যদি সেই প্রশ্নটা করে, তবে কী জবাব দেবেন বসুধরা? তিনি পল্টুর দেওয়া বইটা দু'হাতে বুকের কাছে চেপে ধরলেন। সমোর ছোঁয়া লেগে আছে বইটায়। সারা শরীরে শিহরন অনুভব করলেন বসুধরা। অনেকদিন পর সমো যেন আবার স্পর্শ করল তাঁকে। তবুও তাঁর বিশ্বাস হল না। তাকেই দেখেছেন তো? না গোটা ব্যাপারটাই তাঁর কল্পনা?

বসুধরা আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য পল্টুকে প্রশ্ন করলেন, "শরদিন্দুস্যারের বাড়িটা কোথায় রে?"

পল্টু জবাব দিল, "ইস্টিশনের ওধারে। বাদামতলায়।"

বাদামতলা! পাড়ার নামটা মনে পড়ে গেল বসুধরার। তিনি ঠিকই দেখেছেন! আর কিছু না বলে, বইটা কোলের কাছে রেখে তার পাতাগুলো উলটোতে থাকলেন। বইটার প্রতিটা পাতা যেন কোনও মানুষের হাত। বারবার তারা ছুঁয়ে যেতে লাগল বসুধরার আঙুল। এক অনির্বচনীয় মাদকতা অনুভব করলেন তিনি।

পরিবাড়ির সামনে রিকশা থেকে নেমে বসুধরা বললেন, "শোন, এই বইটা আমি আমার কাছে রাখছি।"

পল্টু অবাক হয়ে বলল, "ও মা, এটা তো ইস্কুলের বই! তুমি নিয়ে কী করবে? পড়াশোনা করবে নাকি?"

"যাই হোক, বই তো! আমি একা থাকি, একটু নেড়েচেড়ে দেখব না হয়। সময় কাটবে। তুই পরে নিয়ে যাস বা আমি এর বদলে অন্য একটা বই কিনে দেব'খন।"

"ঠিক আছে, তুমিই রাখো বইটা," রিকশার সিটটা একবার ঝেড়ে পল্টু জুড়ল, "কাল যদি আমি না আসতে পারি, চিন্তা কোরো না। যদি তোমাকে কোথায় যেতে হয়, তবে অন্য রিকশা ধরে তুমি বলবে, 'ইস্টিশনের পল্টু আমার ডেরাইভার।' আমার কথা বললে ঠিক ভাড়া নেবে।"

বসুধরা হেসে বললেন, "ঠিক আছে, তুই যা।"

পল্টু চলে গেল। পরিবাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলেন বসুধরা। উপরে উঠে তিনি আজ আর ঘরে ঢুকলেন না। সোজা ছাদে উঠে গেলেন। বিকেলের আলোয় একলা দাঁড়িয়ে আছে পরি। আর মাত্র দুটো দিন। তারপর দু'জনকেই এই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। বসুধরা বেদির উপর উঠে দাঁড়ালেন। পরম মমতায় পরির গায়ে হাত রাখলেন। শেষ বিকেলের আলো ছুঁয়ে যাচ্ছে দুই নারীকে। সত্যি দুই নারী, না দু'জনে মিলেমিশে এক বিষণ্ণ সত্তায় পরিণত হয়েছেন? বসুধরার হাত এসে হাত থামল পরির হাতে। আংটির ধাতব স্পর্শ অনুভব করলেন তিনি। আজ সকালেও তিনি এসেছিলেন এখানে। জল দিয়ে পরিষ্কার করেছেন পরির হাতদুটো, মুছিয়ে দিয়েছেন জমাট হয়ে যাওয়া ধুলোর স্তর। সেই কারণেই হয়তো, সাবধানে একটু চেষ্টা করতেই ধীরে ধীরে তার আঙুল থেকে খুলে এল সেই আংটিটা। পরিবাড়ির পরি বহুযুগ ধরে নিজের কাছে গচ্ছিত রাখা জিনিসটা আবার ফিরিয়ে দিল বসুধরাকে। তিনি বই আর আংটিটা নিয়ে পরির পায়ের কাছে বসলেন। কিছুক্ষণ ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখলেন আংটিটা। তাতে বসানো বিন্দুর মতো লাল পাথরটা মৃদু ঝিলিক দিচ্ছে। বসুধরা কোনওদিন আংটি পরতেন না। সরোই প্রথম তার ডানহাতের অনামিকায় পরিয়ে দিয়েছিল আংটিটা। এই আংটি খুলে রাখার পর আর-একটা আংটি অবশ্য তিনি পরেছিলেন। তাঁর এনগেজমেন্ট রিং। স্বামী প্রদীপ্ত আংটিটা পরাতে চেয়েছিলেন ওই অনামিকায়। বসুধরা বলেছিলেন, "না, এই

BanglaBook.org

আঙুলে নয়, পাশের আঙুলে।"

কারণ জানতে চাওয়ায় বসুধরা জবাব দিয়েছিলেন, "এই আঙুলে ব্যথা আছে।" নতুন আংটিটা শেষপর্যন্ত মধ্যমায় ধারণ করেছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর সেটা খুলেও ফেলেছিলেন। পাথরের আংটিটা আঙুলে পরবেন কি না, ভাবলেন বসুধরা। তারপর মনে হল, এতদিন পর এই আংটি পরে কী লাভ? বরং এ আংটি যাঁর, তাকে কি এটা ফিরিয়ে দেওয়া যায়?

বই আর আংটিটা বহুমূল্য সম্পদের মতো আগলে ধরে বসে রইলেন তিনি। দিনের শেষ আলোকবিন্দুও মুছে গেল একসময়। অন্ধকারে ডুবে গেল বিশ্বচরাচর। সেই অন্ধকারে একলা বসে অতীতে ডুব দিলেন বসুধরা। তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল অতীতের সেই পরিবাড়ি, মনসার ঢিপির জঙ্গল, আর একটা মুখ!

বসুধরা যখন নীচে নামার জন্য উঠে দাঁড়ালেন, তখন চাঁদের আলো ফুটতে শুরু করেছে। নীচে নেমে নিজের ঘরের দরজা খুলতে যাচ্ছিলেন বসুধরা, এমন সময় নীচ থেকে একটা ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কানে এল তাঁর। কেউ যেন কিছু বলছে! সেই ছেলেটা আর মেয়েটা কি আবার এসেছে? ঘরে আর ঢোকা হল না তাঁর। কৌতূহলবশত তিনি বারান্দা ধরে এগিয়ে সিঁড়ির বাঁকে দাঁড়িয়ে সাবধানে উঁকি দিলেন নীচে। না, কোনও যুবক যুবতী নয়, সিঁড়ির শেষ ধাপে, শুয়ে আছে একটা বাচ্চা ছেলে। মাঝে মাঝে সুর করে কী যেন বলছে। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে সিঁড়ি বেয়ে তাঁর কাছে নেমে এলেন বসুধরা। ছেলেটা কিন্তু উঠল না। তিনি তার গায়ে হাত দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে যেন ছ্যাঁকা লাগল তাঁর হাতে। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে ছেলেটার গা। বসুধরা শুনলেন, ছেলেটা বলছে, "মিলছে না, মিলছে না..."

BanglaBook.org

॥ ১৬ ॥

কাল বিকেল থেকেই একটা ধোঁয়াশার মধ্যে আছেন শরদিন্দু। বিকেলে স্কুল থেকে বেরোনোর সময় কী দেখলেন তিনি! সকালবেলায় ছবিটা দেখার ফলেই কি ওরকম একটা মুখ ধরা দিল তাঁর চোখে? যা বহুদিন যাবৎ লুকিয়ে ছিল শরদিন্দুর অবচেতন মনে। ব্যাপারটা কি নিছক দৃষ্টিবিভ্রম? না পড়ন্তবেলার

সত্যি তার দেখা পেলেন? তিনি এতটাই বিস্মিত হয়েছিলেন যে, কী করবেন ভাবতে ভাবতেই সাইকেল নিয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিলেন। যখন ফিরে এলেন, তখন রিকশাটা চলে গিয়েছে। আজ স্কুলে আসার পথেও ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিলেন তিনি।

স্কুলে ঢোকার সময় তাঁর মনে পড়ল, আজ আবার শেষ পিরিয়ডে ফাইভ বি-র ক্লাসটা আছে। ছেলেটা যদি আজ তাঁকে খাতায় বৃত্ত এঁকে দিতে বলে, তবে কী করবেন তিনি? সে যদি নাও বলে, তাকে শিখিয়ে দেওয়াই তো শরদিন্দুর কর্তব্য। সেই চিন্তাটাই তাঁর মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল।

হেডমাস্টারের ঘর থেকে অ্যাটেন্ড্যান্স খাতাটা নিতে গিয়ে শরদিন্দু দেখলেন, সেখানে ম্যানেজিং কমিটির টিচার্স রিপ্রেজেন্টেটিভ সুনীল বসে আছেন। টেব্‌লের উপর ঝুঁকে চাপাস্বরে কী যেন আলোচনা করছিল তাঁরা। শরদিন্দু খাতাটা নিয়ে সই করার সময় হেডমাস্টার তাঁকে বললেন, "শরদিন্দুবাবু, আপনি কি কিছু শুনেছেন?"

শরদিন্দু জিজ্ঞেস করলেন, "কোন ব্যাপারে?"

হেডমাস্টার তাঁর কথার সরাসরি উত্তর না দিয়ে বললেন, "ক্লাসের ফাঁকে একবার আমার ঘরে আসবেন। কিছু কথা আছে।"

শরদিন্দু মনে কৌতূহল নিয়ে বললেন, "ঠিক আছে।" কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেল তাঁর কাছে।

BanglaBook.org

স্টাফরুমে ঢুকতেই তিনি দেখলেন, ভূগোলের বিকাশকে ঘিরে সকলে দাঁড়িয়ে আছে। বিকাশবাবু উত্তেজিতভাবে বলছেন, "মেরেছি তো কী হয়েছে? ফালতু তিল থেকে তাল করা হচ্ছে! এই স্কুলে কেউ যেন কোনওদিন কাউকে মারেনি! চারমাস আগেই তো নিখিলেশ এইটের একটা ছেলের চোখে ঘুসি মেরে কালসিটে ফেলে দিল! তখন তো থানা-পুলিশ হয়নি? তার আগে কাঞ্চনদাও একবার একটা ছেলের দাঁত ফেলে দিয়েছিলেন একবার। সেবারও তো কিছু হয়নি! এসব আমার বিরুদ্ধে গভীর চক্রান্ত। স্কুলেরই কেউ বা কারা আছে এর পিছনে। এসব আমার টিউশন খাওয়ার জন্য করা হচ্ছে!"

ভূগোলেরই প্রশান্তবাবু বললেন, "ব্যাপারটা কী হয়েছিল, বলো তো?"

বিকাশবাবু আবার উত্তেজিত স্বরে বলতে শুরু করলেন, "পরশুদিন টিফিনে বাইরে গিয়েছিলাম একটা কাজে। যখন স্কুলে ফিরলাম, তখন শেষ পিরিয়ড শুরু হয়েছে। করিডরে হেডমাস্টারের সঙ্গে দেখা। তিনি আমাকে

দেখে বললেন, 'ফাইভ বি-র ক্লাসে টিচার নেই। ছেলেরা চেঁচামেচি করছে পাশের ঘরে সুজয়বাবু ক্লাস নিতে পারছেন না। আপনি ক্লাসটা নিয়ে নিন। আপনি আবার অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল মেম্বার। না নিলে আবার স্টাফরুমে কথা হবে!' তাই ক্লাসে গেলাম। আমি ভূগোলের টিচার, কী অঙ্ক করাব? বললাম, জ্যামিতি করাব। ক্লাসেই শুনলাম, আগেরদিনই শরদিন্দুদা বৃত্ত আঁকিয়েছেন। আমিও বৃত্ত সম্বন্ধে তাদের বলব বলে প্রথমেই ছেলেদের বৃত্ত আঁকতে বললাম। হঠাৎ দেখি, লাস্ট বেঞ্চে একটা ছেলে হাঁ করে বসে আছে। ভ্যাগাবন্ড টাইপের দেখতে, লাস্ট বেঞ্চার্সরা যেমন হয়! তাকে বললাম, 'তুই আঁকছিস না কেন? কম্পাস নেই?' ছেলেটা বলল, 'না, নেই।'

"আমি পাশের একজনের কাছ থেকে কম্পাস দিলাম তাকে। সে একটা খাতা খুলল। তার মধ্যে সব অর্ধবৃত্ত-বৃত্তচাপ আঁকা। সেও ওরকম একটা অর্ধবৃত্ত আঁকল। আমি বললাম 'মেলাচ্ছিস না কেন?' সে বলল, 'আমাকে এরকমই এঁকে দিয়েছেন শরদিন্দুস্যার। বৃত্ত মেলে না।' তারপর বলল, 'আমার বাবাও বলে, মিলবে না।' ছেলেটার ফাজলামিটা একবার ভাবুন! আমি বললাম, মিলবে না মানে? ছেলেটা ফস করে বলল, আমি পাগল! কী স্পর্ধা! তারপর আমাকে আরও আজেবাজে গালাগালি করছিল, আমি তার জবাবে গালে একটা চড় দিয়েছি মাত্র। তাও খুব আস্তে! তারপর ছেলেটা দিব্যি ক্লাস করল। কাল রাতে হেডস্যার আমাকে ফোন করে বললেন, ওই ছেলেটাকে নার্সিংহোমে ভরতি করা হয়েছে! আজ খানিকক্ষণ উনিই জানালেন, থানা থেকে তাঁকে ফোন করা হয়েছিল। ছেলেটার গার্ডিয়ান নাকি কমপ্লেন করেছে আমার নামে! ছেলেটা নার্সিংহোম থেকে পালিয়েছে, তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

একজন শিক্ষক বললেন, "ছেলেটা কি পাগল? হয় মাথায় পাগলামি বুদ্ধি চেপেছে, নয় বম্বে যাবে হিরো হতে।"

বিকাশ বললেন, "আমার তো তাই মনে হয়। আমার ব্যাচে একটা ছেলে পড়ে ওদের ক্লাসের। আগে একই পাড়ায় থাকত তারা। সে বলল, ছেলেটার বাবা সত্যিই পাগল! তাই তাদের পাড়া থেকে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

শরদিন্দু তাঁদের কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন সব। অভ্রও যে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, খেয়াল ছিল না তাঁর।

হেডমাস্টারের ঘর থেকেই স্টাফরুমে চেঁচামেচির শব্দ পেয়ে এসে

ঢুকলেন সুনীলবাবু। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বিকাশবাবুসহ আরও কয়েকজন ঘিরে ধরল। বিকাশবাবু বললেন, "এসব কী হচ্ছে, সুনীলদা?"

সুনীল বললেন, "আমি দেখছি ব্যাপারটা। হেডমাস্টারের সঙ্গে এই নিয়েই আলোচনা হচ্ছে। সেক্রেটারিও এসেছেন। কথা হচ্ছে।"

বিকাশবাবু বললেন, "আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, এত আলোচনার কী আছে? সামান্য একটা ঘটনা..."

সুনীল ফের বললেন, "সাবধানে এগোতে হবে। আজকাল মিডিয়া খুব অ্যাক্টিভ। কখন আবার তারা এসে হাজির হয়ে যাবে।"

পাশ থেকে এক শিক্ষক মন্তব্য করল, "এই মিডিয়াই তো ছাত্র-গার্ডিয়ানদের মাথা খাচ্ছে। কোনও কাজ নেই, দু'দিন পরপর কোন স্কুলে কোন ছাত্রকে কে মারল, তাই দেখিয়ে বেড়ায়! এক্সপোজার পাওয়ার লোভে সামান্য কিছু হলেই কিছু ছাত্র আর তাদের বাপ-মা তিলকে তাল করছে! দ্যাখো আবার, ছেলেটার মা-বাবাই তাকে কোথাও সরিয়ে দিয়েছে কি না!"

সুনীল বলার চেষ্টা করলেন, "এই কেসটা কিন্তু সাধারণ ব্যাপার নয়। পুলিশ কেস যখন হয়েছে, তখন মানতেই হবে, ব্যাপারটা বেশ কমপ্লিকেটেড।"

বিকাশবাবু ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, "একটা কথা আপনাকে স্পষ্ট বলে দিই, সুনীলদা, ওসব কমপ্লিকেটেড কেসফেস বুঝি না। আমি পনেরোবছর ধরে অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য। প্রতিবছর চাঁদা দিই। লাস্ট ইলেকশনে পার্টি ফান্ডে একহাজার টাকা চাঁদা দিয়েছি। আমি যদি বিপদে পড়ি, কাউকে ছাড়ব না। দু'মাস পর ম্যানেজিং কমিটির ইলেকশন, দেখব কে কীভাবে জেতে!"

চেঁচামেচি আরও বাড়ল। কেউ বললেন, "এসব তো অ্যাসোসিয়েশন আর অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের দেখা উচিত। না হলে স্কুলটা তো গোল্লায় যাবে! আমাদের আর কী? ক্লাসে ঢুকে চুপচাপ বসে থাকব, মাসের শেষে মাইনে নিয়ে বাড়ি যাব।"

কেউ বা আবার দাবি করলেন, "আজ বিকাশের প্রতি অন্যায় হচ্ছে, কাল আমাদের উপর হতে কতক্ষণ। আসলে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে গভীর চক্রান্ত শুরু হয়েছে। আসলে আমাদের মাইনেপত্র বেড়েছে বলেই সকলেই আমাদের প্রতি জেলাস।"

শেষ কথাটার প্রতিবাদে অবশ্য ইতিহাসের সিনিয়ার টিচার ভানুবাবু বলতে গেলেন, "আমার মনে হয়, কথাটা ঠিক নয়। মানুষ আর-পাঁচজন

BanglaBook.org

চাকুরিজীবীর চেয়ে আমাদের কাছ থেকে বাড়তি কিছু এক্সপেক্ট করে। রেসপেক্টও করে। ফলে আমাদের সামান্য ভুলত্রুটিও বড় হয়ে ধরা দেয় তাদের চোখে। আমাদেরও সচেতন হয়ে চলা উচিত। লোকে আমাদের মানুষ গড়ার কারিগর বলে।"

যাঁর কথার জবাবে ভানুবাবু কথাগুলো বললেন, তিনি আরও চেঁচিয়ে বললেন, "রাখুন মশাই আপনার এক্সপেক্ট রেসপেক্ট! আপনাদের মতো কিছু মানুষের জন্যই আমাদের এই অবস্থা। কোলিগকে সেভ করার বদলে বস্তাপচা জ্ঞান দিচ্ছেন!"

হট্টগোল যখন চরমে পৌঁছেছে, ঠিক তখনই ক্লাসে যাওয়ার জন্য ঘণ্টা পড়ল। হেডমাস্টার দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনারা এখনই উত্তেজিত হবেন না। ব্যাপারটা আমরা গুরুত্ব দিয়েই দেখছি। আপনারা দয়া করে এখন ক্লাসে যান।"

তাঁর কথা শুনে একজন বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাচ্ছি! কিন্তু ব্যাপারটার সমাধান না হলে, আমরা ক্লাস বয়কটের ডাক দেব।"

জটলাটা এবার ভেঙে গেল। যাঁদের ক্লাস আছে, তাঁরা প্রস্তুত হলেন ক্লাসে যাওয়ার জন্য।

"স্যার, আমি ক্লাসে যাচ্ছি," একটা গলা পেয়ে শরদিন্দু দেখলেন, তাঁর পাশেই অভ্র দাঁড়িয়ে আছে।

তিনি বললেন, "ওহ্, তুমি এসেছ! ঠিক আছে, ক্লাসে যাও। আমিও যাচ্ছি।"

অভ্র বেরিয়ে যাওয়ার পর তিনিও ক্লাসের দিকে এগোলেন। একটা অপরাধবোধ কাজ করছে শরদিন্দুর মধ্যে। বাচ্চাটা তো ঠিকই বলেছিল। তিনিই তো অর্ধবৃত্ত এঁকেছিলেন তার খাতায়। তবে কথাটা স্টাফরুমে বললে কেউ কি বিশ্বাস করত? শরদিন্দু বৃত্ত আঁকতে পারছেন না, এটা তো অবিশ্বাস্য ব্যাপার! কিন্তু তাঁর জন্যই কি মার খেল ছেলেটা? বিকাশকে সে হঠাৎ গালাগালিই বা দিল কেন? নানা চিন্তাভাবনার জট পাকতে থাকল তাঁর মনে। তবে একটা প্রশ্ন বারংবার খোঁচা দিতে লাগল তাঁকে। তিনি অপরাধী নন তো? তাঁর জন্যই পুরো ব্যাপারটা ঘটেনি তো?

পরপর বেশ কয়েকটা ক্লাস। ক্লাস চলাকালীন শরদিন্দু পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, তাঁর মন বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। চেষ্টা করেও তিনি মন বসাতে

BanglaBook.org

পারছেন না। বারবার শুধু মনে হচ্ছে, তিনিই কি ঘটনাটার জন্য দায়ী?

ক্লাসের ফাঁকে একবার এসে তিনি ঘুরে গেলেন হেডমাস্টারের ঘরে। কিন্তু তাঁকে পেলেন না। টিফিনের ঘণ্টা পড়ল। শরদিন্দু তখন স্টাফরুমে ফিরছেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন, তাঁর পাশ দিয়ে জয় যাচ্ছে। ছেলেটা ফাইভ বি-তেই পড়ে। তাঁর পাড়াতেই ছেলেটার বাড়ি। ওর বাবাও ছাত্র ছিলেন শরদিন্দুর। ছেলেটা তাঁকে পাড়ায় 'দাদু' বলে ডাকে। বেশ শান্ত ছেলে, ধীরস্থির প্রকৃতির। পাড়ার সম্পর্কের সুবাদে তাঁর সঙ্গে জয়ের বেশ সখ্য আছে। শরদিন্দু তাকে দেখতে পেয়ে বললেন, "শোন তো, বাবা, একটা কথা আছে।"

একটু তফাতে গিয়ে, মাঠের একপাশে দাঁড়িয়ে শরদিন্দু জানতে চাইলেন, "পরশু তোদের ক্লাসে বিকাশস্যারের সঙ্গে ওই ছেলেটার কী হয়েছিল, খুলে বল তো? স্যার ওকে মারলেন কেন? সত্যি কথা বলবি। আমি কাউকে বলব না।"

ছেলেটা প্রথমে শরদিন্দুর প্রশ্ন শুনে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল, তারপর তাঁর আশ্বাসে ভরসা পেয়ে বলতে শুরু করল, "স্যারের লেখা ভূগোলের এক-টা বই বুকলিস্টে আছে রেফারেন্স হিসেবে। স্যার প্রথমে ক্লাসে ঢুকে বললেন, 'আমার বইটা যারা কিনেছিস, তারা হাত তোল।' আমরা সকলেই হাত তুললাম, কিংশুক খালি তুলল না। স্যার ওর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই কিনিসনি কেন?' কিংশুক কোনও জবাব দিল না। স্যার এরপর ওর খাতার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এসব কী এঁকেছিস?' ও বলল, 'বৃত্ত।' স্যার বললেন, 'বৃত্ত না হাতি! কে শিখিয়েছে বৃত্ত? তোর বৃত্ত অর্ধেক কেন? মিলল না কেন?' ও জবাব দিল, 'শরদিন্দুস্যার শিখিয়েছেন। এটা মিলবে না। আমার বাবাও বলেন, মিলবে না।' তখন স্যার বললেন যে, 'তোর বাবা নিশ্চয়ই পাগল।' তা শুনে সকলে হেসে উঠল। স্যার তারপর বললেন, 'বইটা কিনে এনে কাল আমাকে দেখাবি। নইলে বাপ-ছেলের পাগলামি ঘুচিয়ে দেব।' তারপর একজনের কাছ থেকে কম্পাস নিয়ে তার হাতে দিয়ে, সকলকে বৃত্ত আঁকতে বললেন স্যার। আমরা পারলাম। কিংশুক শুধু পারল না। তখন স্যার বললেন, 'তুই পারবি কী করে? তুই পড়াশোনা করতে আসিস না স্কুলে। ফাজলামি করতে আসিস। দ্যাখ, সকলে আমার বই কিনেছে। কাল বইটা কিনবি, না হলে স্কুলে ঢুকতে দেব না।' কিংশুক তখন বলল, 'আমি বই কিনব না। আমাদের পয়সা নেই। আপনি আমার বাবাকে পাগল বললেন কেন?' ওর কথা শুনে

BanglaBook.org

স্যার রেগে গেলেন। কিংশুকের চুলের মুঠি ধরে টেবলের কাছে এনে মারতে মারতে বললেন, 'বল, কিনবি, না কিনবি না?' ও সমানে বলতে লাগল, 'না, কিনব না।' স্যার আরও রেগে গিয়ে ওকে মারতে থাকলেন। কিংশুকের কান দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। তখনই ঘণ্টা বেজে গেল। স্যার আমাদের ক্লাস থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন। আমরাও বেরিয়ে গেলাম," ঘটনাটার বর্ণনা দেওয়ার পর আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠল জয়ের মুখে।

শরদিন্দু প্রশ্ন করলেন, "কিংশুক, স্যারকে পাগল বলেছিল কি?"

জয় বলল, "না তো, বলেনি!"

"ঠিক তো?"

"হ্যাঁ, একদম ঠিক! ও বলেনি," জয়ের গলাটা ভেঙে এল, "আমার খুব ভয় করছে।"

শরদিন্দু বললেন, "কেন? তুইও কিছু করেছিস নাকি?"

জয় কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, "বিকাশস্যার যদি আমাকে মারেন, সেই ভয়ে আমিও হাত তুলেছিলাম। বইটা আমারও এখনও কেনা হয়নি। অচিন্ত্য, পার্থপ্রতিমরাও কেনেনি। স্যার যদি আমাদের স্কুলে ঢুকতে না দেন? মারেন?"

শরদিন্দু পকেট থেকে পাঁচটাকার কয়েন বের করে জয়ের হাতে দিয়ে বললেন, "তুই ভয় পাস না। আমি বলে দেব, তোকে মারবে না। টাকাটা দিয়ে টিফিনে কিছু কিনে খাস।"

জয় 'আচ্ছা' বলে চলে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। বলল, "স্যার, কিংশুককে কি পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছে?"

শরদিন্দু অবাক হয়ে বললেন, "পুলিশে ধরবে কেন?"

জয় বলল, "পরশু ঘণ্টা বাজার পর স্যার যখন আমাদের বেরিয়ে যেতে বললেন, তখন আমরা কয়েকজন বাইরে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিলাম। ঘরের ভিতর স্যার, কিংশুককে বলছিলেন, 'বাড়িতে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, তোর কানে রক্ত কেন? বলবি, রাস্তায় পড়ে গিয়েছিস। কাউকে যদি বলিস যে, আমি তোকে মেরেছি তা হলে তোকে পুলিশের হাতে দিয়ে দেব। দেখেছিস তো, আমি পুলিশের গাড়িতে আসি।' কিংশুক স্কুলে আসছে না কেন, স্যার? ওকে কি পুলিশ ধরেছে? ও কি স্যারের নাম বলে দিয়েছে?" সভয়ে জানতে চাইল জয়।

BanglaBook.org

বিকাশের পুলিশের গাড়িতে করে স্কুলে আসার ব্যাপারটা ধরতে পারলেন না শরদিন্দু। তারপর খেয়াল হল, মাসতিনেক হল, ভবানীবাবুর সঙ্গে ব্যাঙ্ক থেকে স্কুলের স্টাফদের বেতন আনতে যায় বিকাশ। অনেক টাকা থাকে, তাই পুলিশের জিপ ওদের দু'জনকে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে যায়। ছাত্ররা সেটা দেখেছে বা বিকাশ নিজেই সেটা প্রচার করেছেন। তিনি জয়কে বললেন, "না, ওকে পুলিশে ধরেনি। ঠিক আছে, তুই এখন যা।"

শরদিন্দু স্টাফরুমে ফিরে শুনতে পেলেন, ওই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলার জন্য সুনীল আর বিকাশ কোথায় যেন গিয়েছেন। কেউ বলল নার্সিংহোমে, কেউ বলল থানায়, আবার কেউ বলল ছেলেটার বাড়ি গিয়েছেন তাঁরা। কোনটা সঠিক, তা বুঝতে পারলেন না শরদিন্দু। ছুটির ঘণ্টা বেজে গিয়েছে। স্টাফরুম ফাঁকা হতে শুরু করেছে। কারও বাড়ি ফেরার, কারও আবার টিউশনিতে যাওয়ার তাড়া। শরদিন্দু স্টাফরুমেই বসে রইলেন। ছেলেটাকে যদি তিনি সেদিন বৃত্তটা এঁকে দিতেন, তা হলে হয়তো ওকে মার খেতে হত না! বুকের মধ্যে কাঁটার মতো খচখচ করতে লাগল ব্যাপারটা।

॥ ১৭ ॥

স্টাফরুম প্রায় ফাঁকা হওয়ার পর হেডমাস্টারের ঘরে গেলেন শরদিন্দু। ঘরে তিনি একাই ছিলেন, শরদিন্দুকে দেখে তিনি বললেন, "বসুন। ভাবছিলাম, কখন আপনি আসবেন? সব শুনেছেন নিশ্চয়ই?"

শরদিন্দু জবাব দিলেন, "স্টাফরুমের আলোচনা শুনেছি।"

হেডমাস্টার চাপাস্বরে বললেন, "থানা থেকে আমার কাছে ফোন এসেছিল। বলল, এনকোয়ারি করতে স্কুলে আসতে চায়। কোনওমতে বুঝিয়ে শুনিয়ে ওদের রাজি করিয়েছি স্কুলে না আসতে। তবে ওরা বলেছে, কাল বিকাশবাবুকে নিয়ে থানায় যেতে। না হলে স্কুলে পুলিশ আসবে। আল্টিমেটলি ছেলেটাকে যদি না পাওয়া যায় আর ওর গার্ডিয়ান যদি কমপ্লেন উইড্র না করে, তা হলে বিকাশবাবুকে পুলিশ অ্যারেস্ট করবেই," বেশ অসহায় শোনাল তাঁর গলা, "আমি কী করি, বলুন তো? একদিকে পুলিশের চাপ, অন্যদিকে টিচারদের চাপ! যে যার মতো বলছে। যেন হেড

BanglaBook.org

অফ দ্য ইনস্টিটিউশন হওয়ার জন্য ঘটনার জন্য আমিই দায়ী। আমাকেই সব ঝামেলার দায়িত্ব নিতে হবে!"

শরদিন্দু জিজ্ঞেস করলেন, "বিকাশকে কোথাও পাঠিয়েছেন?"

"সুনীলবাবুর সঙ্গে ছেলেটার বাড়িতে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু একটু আগে তারা ফোন করে জানাল, অ্যাডমিশন রেজিস্টার দেখে যে ঠিকানায় ওরা খুঁজতে গিয়েছিল, সে ঠিকানায় ছেলেটা আর থাকে না। ওরা অন্য কোথাও চলে গিয়েছে।"

খানিকক্ষণ হেডমাস্টার আর শরদিন্দু চুপ করে রইলেন।

একসময় আক্ষেপের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে হেডমাস্টার বললেন, "কেন যে এরা এসব কাণ্ড ঘটায়! আমাদের মাস্টারমশাইরাও মারতেন। কিন্তু এখনকার মতো এই অমানুষিক ব্যাপার বা থানা-পুলিশের ব্যাপার ছিল না! এখন যেন শিক্ষক বনাম ছাত্র-অভিভাবকের দ্বৈরথ বেধেছে!"

শরদিন্দু একটু চুপ করে থেকে বললেন, "আমার মনে হয়, শিক্ষক-ছাত্রদের মধ্যে আগে যে মানসিক ওয়েভলেংথ ছিল, সেটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। হয়তো এর জন্য সমাজব্যবস্থা দায়ী, হয়তো আমরাও।"

হেডমাস্টার বললেন, "বিকাশ যা ঘটিয়েছে, তা আমি ব্যক্তিগতভাবে কিছুতেই সমর্থন করি না। আমি জানি, আপনিও করেন না। কিন্তু প্রধানশিক্ষক হিসেবে স্কুলটা যাতে ঠিকভাবে চলে, সেটাও দেখতে হয় আমাকে। অনেক ছেলের ভবিষ্যৎ জড়িয়ে আছে স্কুলের সঙ্গে।"

শরদিন্দু কিছু না বলে মাথা নাড়লেন।

গলাটা পরিষ্কার করে হেডমাস্টার প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, ডাক্তার চক্রবর্তী, যিনি নতুন নার্সিংহোম খুলেছেন, তিনিও তো শুনেছি আপনার ছাত্র ছিলেন। এই স্কুলেরই ছাত্র। আপনার সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ আছে?"

হঠাৎ প্রশান্তর প্রসঙ্গ ওঠায় শরদিন্দু বললেন, "কেন?"

হেডমাস্টার বললেন, "উনিই প্রথম কাল টেলিফোনে ব্যাপারটা আমাকে জানান। ওর নার্সিংহোমেই ছেলেটা ভরতি হয়েছিল এবং ওখান থেকেই সে নিখোঁজ হয়। আমার..." কথাটা শেষ করলেন না তিনি। গভীর নিশ্বাস নিয়ে শরদিন্দুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনার কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে। আপনি যদি নার্সিংহোমে গিয়ে ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলেন, একটু ওই ছাত্রর বাড়ির লোকদের সঙ্গে কথা বলে, তাঁদের একটু কনভিন্স করেন।

BanglaBook.org

আপনাকে এই শহরে সকলেই শ্রদ্ধা করে, অন্যদের চেয়ে একটু আলাদা চোখে দেখে। হয়তো আপনাকে রিকোয়েস্ট করা আমার উচিত নয়। বিশ্বাস করুন, আমি কিন্তু বিকাশের কথা ভেবে আপনাকে বলছি না। বলছি, এই স্কুলটার কথা ভেবে। একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হলে স্কুলের পরিবেশ নষ্ট হবে, ছাত্রদের ক্ষতি হবে। দেখুন, আপনি যদি কিছু করতে পারেন!" হেডমাস্টারের শেষের কথাগুলোয় অসহায়তার সুর স্পষ্ট বুঝতে পারলেন শরদিন্দু। তিনি বললেন, "ঠিক আছে, আমি খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করছি।" তিনি এমনিতেও খোঁজখবর নিতেন। কারণ, সেই কাঁটাটা তাঁর বুকের মধ্যে বিঁধে রয়েছে। তাঁর জন্যই ছেলেটার এই অবস্থা হল না তো?

শরদিন্দু যখন বাড়ি যাওয়ার জন্য সাইকেল বের করছেন, ঠিক তখনই অভ্র এসে দাঁড়াল তাঁর সামনে। একটু অবাক হয়ে তিনি বললেন, "তুমি এখনও বাড়ি যাওনি?"

অভ্র বলল, "না স্যার। গতকাল যাওয়ার সময় দেখা করতে পারিনি। তাই আজ ভাবলাম, আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই।"

শরদিন্দু সাইকেল নিয়ে এগোলেন গেটের দিকে। পাশে অভ্র। গেটের মুখে পৌঁছে সে জিজ্ঞেস করল, "স্যার কি এখন বাড়ি যাবেন?"

শরদিন্দু গেটের মুখে দাঁড়িয়ে বললেন, "অন্যদিন তো এই সময় বাড়ি ফিরি। তারপর আবার এপাশে হাঁটতে আসি। আজ ভাবছি, বাড়ি ফেরার আগে একটু অন্যদিকে যাব। স্কুলের ঘটনাটা শুনেছ তো? ওই ব্যাপারেই একটু খোঁজখবর নিতে যাব। প্রথমে যাব প্রশান্তর নার্সিংহোমে। দেখি, ছেলেটার ঠিকানা যদি পাওয়া যায়।"

অভ্র কথাটা শুনে বলে ফেলল, "ওই নার্সিংহোমে আমার পরিচিত একটি মেয়ে চাকরি করে। ও রিসেপশনিস্ট, নাম, নীলা । আপনার যদি প্রয়োজন হয়, তা হলে ও আপনাকে সাহায্য করতে পারে।"

শরদিন্দু বললেন, "মেয়েটিকে আমি দেখেছি, বেশ হাসিখুশি। তা ও তোমার কীরকম পরিচিত? পাড়ায় থাকে, না আত্মীয়-বন্ধু?"

তিনি লক্ষ করলেন, তাঁর কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মুহূর্তের জন্য একটা লজ্জার ভাব ফুটে উঠল অভ্রর মুখে। শরদিন্দু অনুমান করতে পারলেন দু'জনের সম্পর্কটা। বুঝতে পারলেন, এই প্রশ্ন করা তাঁর উচিত হয়নি।

BanglaBook.org

অভ্র জবাব দিল, "না... মানে, এমনি একটু পরিচয় আছে। যদি আপনার সুবিধে হয়, তাই বললাম।"

শরদিন্দু বললেন, "ঠিক আছে, প্রয়োজন হতেই পারে, হলে নিশ্চয়ই বলব।"

দু'জনের কথার ফাঁকেই হঠাৎ উদয় হলেন সুনীল আর বিকাশ। শরদিন্দুর মনে হল, তাঁরা যেন এতক্ষণ পাঁচিলের আড়ালেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। দু'জনেরই মুখ গম্ভীর। বিকাশবাবু, শরদিন্দুর দিকে তাকিয়ে শুকনো হেসে, সুনীলের সঙ্গে স্কুলে ঢুকে গেলেন। বাইরে বেরিয়ে অভ্র সাইকেলে উঠল। শরদিন্দুও উঠলেন। তাঁর নজর গেল স্কুলগেটের উলটোদিকে, রাস্তার ওপাশে, বটগাছের দিকে। কাল প্রায় এরকম সময়ই পুরনো এক মুখ মুহূর্তের জন্য চোখে পড়েছিল তাঁর। আজ অবশ্য সেখানে কেউ নেই। কাল তবে কি তিনি ঠিক দেখেছিলেন? প্যাডেলে চাপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাটা ফের ঘুরপাক খেতে থাকল তাঁর চেতনায়।

স্কুল থেকে বেরিয়ে সোজা নার্সিংহোমেই চলে এলেন শরদিন্দু। রিসেপশনে সেই মেয়েটাই বসে আছে। উলটোদিকের কয়েকটা বেঞ্চে রোগী বা তার আত্মীয়স্বজনের ভিড়। নার্সিংহোমে ভিজিটিং আওয়ার্স চলছে। উপরে ওঠার সিঁড়ির মুখ আগলে দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক। একজন একজন করে ভিজিটরদের সে উপরে যেতে দিচ্ছে।

BanglaBook.org

শরদিন্দু মেয়েটার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ডাক্তারবাবু কোথায়?"

সে হেসে জবাব দিল, "উপরেই আছেন। সাড়ে পাঁচটার সময় নীচে নামবেন পেশেন্ট দেখার জন্য।"

ঘড়ি দেখলেন শরদিন্দু, পাঁচটা বাজে। তিনি অনুরোধ করলেন, "আমি উপরে যাব? বিশেষ দরকার আছে।"

মেয়েটা হাসিমুখেই জবাব দিল, "যান, আপনাকে স্যার কিছু বলবেন না।"

শরদিন্দুও এবার হেসে বললেন, "তোমার নাম নীলা তো?"

মেয়েটি একটু অবাক হয়ে বলল, "হ্যাঁ, স্যার বলেছেন আপনাকে?"

শরদিন্দু বললেন, "না, স্যার বলেননি। স্কুল থেকে বেরোনোর সময় অভ্র আমাকে বলল। ও তো আমাদের স্কুলে জয়েন করেছে। ও ও আমার ছাত্র ছিল একসময়।"

তিনি দেখলেন, অভ্রর নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই উজ্জ্বল এক আভা ছড়িয়ে পড়ল নীলার মুখে। ছাত্রর মুখে নীলার নাম শুনে তাঁর মনে যে আবছা ধারণা হয়েছিল, মেয়েটির মুখের ভাব দেখে সেই ধারণাই প্রতিষ্ঠিত হল।

নীলা লাজুক ভঙ্গিতে বলল, "হ্যাঁ স্যার, আমি ওকে চিনি।"

শরদিন্দু এরপর এগোলেন লিফ্‌টের দিকে।

দরজায় টোকা দিতে প্রশান্তই দরজা খুলল। শরদিন্দুর মনে হল, তাঁকে দেখে সে যেন একটু বিস্মিত হল। পরমুহূর্তেই অবশ্য সে বিস্মিত ভাবটা কাটিয়ে উঠে বলল, "ভিতরে আসুন, স্যার।"

প্রশান্তর টেব্‌লের উলটোদিকের একটা চেয়ারে বসলেন শরদিন্দু। সে বলল, "আসলে, আমি আজ আর কাল খুব ব্যস্ত ছিলাম। সাইকায়াট্রিস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওঠা হয়নি। আপনি তো, মনে হয়, স্কুল থেকে ফিরলেন। কী খাবেন, বলুন?"

শরদিন্দু বললেন, "না, না, আমি এখন কিছু খাব না। বাড়িতে ফিরে একেবারে ভাত খাব।"

তাঁর আপত্তি সত্ত্বেও প্রশান্ত একবার বাড়ির ভিতরে গেল। সম্ভবত খাবারের বন্দোবস্ত করতে। সে ফিরে এসে বসার পর শরদিন্দু দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বললেন, "আমি ডাক্তারের ব্যাপারে খোঁজ করতে আসিনি। সে খবর তো তুমি জানিয়ে দেবে বলেছ। আমি এসেছি অন্য এক ব্যাপারে।"

"কী ব্যাপারে?" প্রশান্তর মুখটা ঈষৎ গম্ভীর হয়ে গেল।

শরদিন্দু কয়েকমুহূর্ত নিজেকে গুছিয়ে নিলেন। বললেন, "আমি এসেছি, আমাদের স্কুলের যে ছাত্র তোমার এখানে ভরতি হয়েছিল, তার ব্যাপারে একটু খোঁজ নিতে। আমি কিন্তু কারও পক্ষ থেকে আসিনি। এসেছি ব্যাপারটা জানতে।"

"আপনাকে দেখে আমি সেরকমই অনুমান করেছিলাম। কী জানতে চান, বলুন, স্যার? ছেলেটা পরশু একটা ইন্‌জুরি নিয়ে বাড়ি ফেরে। ওর মা রাত ন'টা নাগাদ ওকে আমার এখানে নিয়ে আসেন। গতকাল সকাল থেকেই ছেলেটা নিখোঁজ। বিকেল পর্যন্ত খুঁজে যখন তাকে পাওয়া গেল না, তখন আমিই পুলিশ ডাকি। পুলিশের কাছে ওর মা স্টেটমেন্ট দেন, কমপ্লেন করেন। এখন পর্যন্ত বাচ্চাটার খোঁজ মেলেনি," বলল প্রশান্ত। ঘটনাটা বিবৃত করে সে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, স্কুলে কী ঘটেছিল, বলুন তো?"

BanglaBook.org

শরদিন্দু বললেন, "যা ঘটেছে, তা অভিপ্রেত নয়। আমি যতটুকু খোঁজ পেয়েছি, ছেলেটার এই ব্যাপারে কোনও দোষ ছিল না। বরং এই ঘটনায় হয়তো আমার একটা প্রচ্ছন্ন দোষ থাকলেও থাকতে পারে। তবে বিকাশই চূড়ান্ত অন্যায়টা করেছে।"

"আপনার দোষ থাকতে পারে মানে?" চমকে উঠে জানতে চাইল প্রশান্ত।

শরদিন্দু বললেন, "তোমার প্রথমদিন বলেছিলাম না, একটা ছেলের খাতায় বৃত্ত আঁকতে পারিনি, এ হল সেই ছেলেটাই। বিকাশ ওকে ক্লাসে বৃত্ত আঁকতে বলেছিল। ও পারেনি। আমার মতো অর্ধবৃত্ত এঁকেছিল। পারলে হয়তো এতটা হত না। অবশ্য সেটা ছিল উপলক্ষ মাত্র। সেটার সুযোগ নিয়েই বিকাশ..." কথাটা আর শেষ করলেন না শরদিন্দু। একটু দম নিয়ে প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, ছেলেটার বাবা কী করেন? কোথায় থাকেন?"

কয়েকমুহূর্ত চুপ করে থেকে প্রশান্ত বলল, "এখানেই থাকেন। শিবতলার ওদিকে। উনি কিছুই করেন না।"

"মানে?"

"তিনি অসুস্থ। মানসিক রোগী।"

মানসিক রোগী! সেই জন্যই তার বাবাকে বিকাশ পাগল বলায় ছেলেটা সহ্য করতে পারেনি, মনে মনে ভাবলেন শরদিন্দু।

দু'জনেই চুপচাপ বসে রইলেন কিছুক্ষণ। পাশের ঘর থেকে তিতাসের গলার আওয়াজ মাঝে মাঝে কানে আসছে। কার সঙ্গে যেন কথা বলছে সে।

প্রশান্ত হঠাৎ বলে উঠল, "আপনি কিন্তু ছেলেটার বাবাকেও চেনেন স্যার। সেও আপনার ছাত্র ছিল।"

"আমার ছাত্র? কে?"

প্রশান্ত স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল শরদিন্দুর দিকে। তাকে এরকমভাবে কোনওদিন চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকতে দেখেননি তিনি। শরদিন্দুর অস্বস্তি হল। অনুচ্চারিত বহু কথা যেন লুকিয়ে আছে সেই দৃষ্টিতে। মনের কোণে অজানা ভয় জেগে উঠল তাঁর। প্রশান্ত দু'হাতে মাথা চেপে সামনের নিচু টেব্‌লের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, "ও হল অনি, অনির্বাণ।"

অনির্বাণ! অনেকদিন পর তার নামটা শুনে চমকে উঠলেন শরদিন্দু।

BanglaBook.org

বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, "অনির্বাণ মানসিক রোগী? ওরকম একটা ব্রিলিয়ান্ট ছেলে! কীভাবে তার এই অবস্থা হল?"

নিস্তব্ধ কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল। তারপর টেব্‌লের দিকে চোখ রেখেই প্রশান্ত ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল, "ও ঠিকই ছিল। একটা ব্যাঙ্কে চাকরিও করত। বছরখানেক হল ওর মাথার গন্ডগোল দেখা দিয়েছে। আপনি যেদিন আমার কাছে দেখাতে এলেন, তার পরদিনই ওর স্ত্রী ওকে আমার কাছে নিয়ে আসেন। ওর মাথার গন্ডগোলের কারণটা আমি ধরতে পেরেছি স্যার। অনেকদিনের পুরনো একটা চোট... ওর মাথার পিছনে সেই ছোট্ট কাটা চিহ্নটা এখনও আছে স্যার..." প্রশান্তর গলা যেন ক্রমশ বুজে আসছে। শরদিন্দুর মনে হল, তিনি বধির হয়ে যাচ্ছেন। শুধু নিজের হৃৎস্পন্দনের ক্রমবর্ধমান শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। তাঁর হৃৎপিণ্ড যেন ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। প্রশান্ত বলে চলেছে, "আসলে ও পরীক্ষার খাতায় ইচ্ছে করেই অঙ্কটা ভুল করেছিল, যাতে পুরস্কারের টাকাটা আমি পাই। আপনার সামনে ওর বারবার সহজ অঙ্ক ভুল করাটা ইচ্ছাকৃত ছিল। পরদিন ওই টাকায় আমি কপি ফিলআপ করি। আমি আপনাকে সেদিন কিছু বলতে পারিনি... ও বলেছিল, 'মিলছে না, মিলছে না, কিছুতেই মিলবে না।' আমি চুপ করে ছিলাম সেদিন। এখনও শুধু ওই কথাটাই বলে, 'মিলছে না, মিলছে না, কিছুতেই মিলবে না।'"

শরদিন্দু আর শুনতে পারলেন না। নিজের কানদুটো চেপে ধরলেন।

দু'জনেরই ধাতস্থ হতে বেশ খানিকটা সময় লাগল। প্রশান্ত বলল, "আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, স্যার। আমি আপনাকে আঘাত করার জন্য কথাগুলো বলিনি। দোষটা তো আমারই ছিল। আমি আপনাকে ব্যাপারটা সেদিন বললে, আপনি উত্তেজিত হতেন। হয়তো আজ আপনাকে বলে আমার পাপস্খালন হল।"

শরদিন্দু মনে মনে ভাবলেন, কিন্তু আমার পাপস্খালন কী করে হবে? একসঙ্গে দুটো অপরাধ! আমার কোনও নৈতিক অধিকারই নেই তাদের কোনও অনুরোধ করার। তিনি মুখে বললেন, "তুমি ওদের ঠিকানাটা দিতে পারবে? আমি একবার গিয়ে দেখে আসব তাকে।"

প্রশান্ত বলল, "সে এখানেই আছে!"

অনির্বাণ এখানেই আছে! আরও অবাক হলেন শরদিন্দু।

প্রশান্ত বলল, "হ্যাঁ, ও আর ওর স্ত্রী। অসহায় মানুষ ওরা। আমার ধারণা,

BanglaBook.org

কমপ্লেন উইড্র করার জন্য ওদের উপর চাপ আসবে। ইতিমধ্যে তার আভাসও পেয়েছি আমি। আমার কাছেও এই ব্যাপারে দু'বার ফোন এসেছে। যাতে ওদের দিয়ে কমপ্লেন উঠিয়ে নেওয়া হয়। এটা এখনও রিকোয়েস্টের পর্যায়ে আছে। তবে আমি জানি, না শুনলে এটা রিকোয়েস্ট থ্রেটে রূপান্তরিত হবে।"

শরদিন্দু বললেন, "তা হলে কী করবে তোমরা?"

প্রশান্ত এবার যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে বলল, "না, কমপ্লেন তোলা হবে না! আর কতবার এসব ঘটনা ঘটবে! আপনি জানেন, আমার মেয়ে আর স্কুলে যায় না? কেন যায় না, জানেন? আপনাকে আমি সেদিন সত্যি কথা বলতে পারিনি লজ্জায়। আসল কথাটা হল, এক দিদিমণি ওর আঙুল ভেঙে দিয়েছিলেন। আঙুলের ক্ষতটা সেরেছে ঠিকই, কিন্তু মনের ক্ষত সারেনি। কোনওদিন সারবে কি না, জানি না। এই তিতাস, এই কিংশুকরাই হয়তো ভবিষ্যতের অনির্বাণ। না, এসব থামাতেই হবে," নিজেকে একটু সামলে বলল, "আপনি আসুন আমার সঙ্গে, ওরা পাশের ঘরেই আছে।"

প্রশান্তর সঙ্গে পাশের ঘরে ঢুকে শরদিন্দু দেখলেন, একজন অল্পবয়সি বিবাহিতা মহিলার কোলে তিতাস বসে কথা বলছে। শরদিন্দুকে দেখেই পাংশু হয়ে গেল তার মুখ। সে সভয়ে জড়িয়ে ধরল মহিলার গলা। পরমুহূর্তেই শরদিন্দু চিনতে পারলেন সেই মহিলাকে। এই মহিলাই তো ক'দিন আগে স্কুলে গিয়েছিলেন বইয়ের ক্যানভাসিং-এর জন্য! এরপরই নিজের পুরনো ছাত্র অনির্বাণকে দেখতে পেলেন শরদিন্দু। শূন্য দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। নিষ্প্রাণ, অসাড় তার চাউনি। জীবনের কোনও অঙ্কই যেন তার মিলবে না। অথবা সব অঙ্ক মিলিয়ে দিয়ে স্থবির হয়ে পড়েছে সে। পৃথিবীর কোনও ঘটনা-দুর্ঘটনা আজ আর তাকে স্পর্শ করে না।

তিনি তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। আজ অনির্বাণ নির্বাক শিক্ষক আর শরদিন্দু তার ছাত্র।

প্রশান্ত, তিথির উদ্দেশে বলল, "ইনি শরদিন্দুস্যার। উনি আমাদের শিক্ষক ছিলেন।"

তিথি, তিতাসকে কোল থেকে নামিয়ে শরদিন্দুকে প্রণাম করে বলল, "আমি স্যারকে চিনি।"

শরদিন্দু তাকালেন মেয়েটার মুখের দিকে। চোখের কোল বসে গিয়েছে। অব্যক্ত যন্ত্রণার স্পষ্ট ছাপ ফুটে আছে তার মুখে, রাতজাগা চোখের তারায়

জেগে আছে এক প্রশ্নচিহ্ন। আগেরদিন স্কুলে দেখা মহিলার সঙ্গে অনেক পার্থক্য এই মহিলার।

শরদিন্দু তাকে আশ্বস্ত করার জন্য বললেন, "সব ঠিক হয়ে যাবে। চিন্তা কোরো না।"

তিথি বলল, "কিংশুক যখন একদম ছোট ছিল, তখন অনির্বাণ বলত, 'ছেলেকে আমি ক্লাস ফাইভে বয়েজ় স্কুলে ভরতি করাব। আরও অনেক স্কুল আছে ঠিকই, কিন্তু সেখানে শরদিন্দুস্যারের মতো টিচার নেই। মানুষ হতে গেলে শুধু বাবা-মা ভাল হলে হয় না, ভাল শিক্ষকও প্রয়োজন। এই যে আমরা আজ ভাল চাকরিবাকরি করছি, তার পিছনে শরদিন্দুস্যারের অবদান বাপ-মায়ের চেয়ে কম নয়।' ওর ওই ইচ্ছে পূর্ণ করার জন্যই এই স্কুলে বাবলুকে ভরতি করিয়েছিলাম আমি। না করলে হয়তো...' তিথি আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল।

কেউ একজন ঘরে ঢুকে চা আর খাবার দিয়ে বেরিয়ে গেল। সেদিকে খেয়ালই করল না কেউ। খানিক পর সে শান্ত হল। শরদিন্দু বাকরুদ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন সিলিং-এর দিকে। তাঁর চেতনা, শিক্ষক জীবনের পরিতৃপ্তি, সবকিছুই যেন কাচের টুকরোর মতো ভেসে বেড়াচ্ছে ঘরের বাতাসে। ক্লাসের শেষ বেঞ্চের অঙ্ক না মেলাতে পারা ছাত্রর মতো অসহায় দৃষ্টি তাঁর চোখে।

"স্যার, আমাকে এবার যেতে হবে। নীচে চেম্বার আছে। আপনি ওদের সঙ্গে বসে কথা বলুন," প্রশান্ত বলল।

তার কথায় সংবিৎ ফিরে পেয়ে শরদিন্দু বললেন, "না, আমি আর এখন বসব না, পরে আসব।"

ঠিক তখনই অন্য একটা গলা শোনা গেল, "স্যার, আপনি চলে যাচ্ছেন? আবার আসবেন।"

গলাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সকলে চমকে উঠে তাকাল সেদিকে। শরদিন্দুও তাকালেন। কখন যেন ঘরের কোণের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে অনির্বাণ। কণ্ঠস্বরটা তারই! ঘোলাটে দৃষ্টি নিয়েই সে তাকিয়ে আছে শরদিন্দুর দিকে। তার ঠোঁটের কোণে একটা আবছা হাসির রেশ।

বিস্মিত প্রশান্ত বলে উঠল, "অনি, তুই স্যারকে চিনতে পেরেছিস!"

অনির্বাণ প্রশান্তর কথার কোনও জবাব দিল না। শরদিন্দু এগিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন তাকে।

BanglaBook.org

॥ ১৮ ॥

সেকেন্ড পিরিয়ডে ক্লাস নিচ্ছিল অভ্র। পিরিয়ড শেষে দুটো ঘণ্টা বাজার পরিবর্তে ঢং ঢং করে স্কুল ছুটির ঘণ্টা বেজে গেল! অভ্র ক্লাসের বাইরে তাকিয়ে দেখল, ক্লাস ছেড়ে ছেলেরা সব মাঠে নেমে এসেছে। সে যে অঙ্কটা দেখাচ্ছিল, সেটা শেষ করার পর ক্লাস ছেড়ে দিল। আকস্মিক ছুটির আবহাওয়ায় ছেলেরাও হইহই করতে করতে ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে এল।

ক্লাস থেকে বেরিয়ে হেডমাস্টারের ঘরের কাছে গিয়ে অভ্র দেখল, তাঁর ঘরের বাইরে শিক্ষকদের জটলা। তাঁদের চোখে-মুখে উত্তেজনার ছাপ। ঘরের ভিতরেও আছেন কেউ কেউ। দু'দিনে সকলকে চিনে উঠতে পারেনি অভ্র। কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে সামান্য পরিচয় হয়েছে তার। হেডমাস্টারের ঘরের ভিতর থেকে কার যেন উত্তেজিত গলা শোনা গেল, "আমরা এসব কিছু শুনতে চাই না, কিছু বুঝতেও চাই না। যা ব্যবস্থা আপনাকেই করতে হবে। নইলে স্কুল চলতে দেব না। দেখি ,আপনি একলা কীভাবে স্কুল চালান!" হেডমাস্টার তাঁকে কী যেন বোঝাবার চেষ্টা করছেন।

মিনিটখানেকের মধ্যেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেল অভ্রর কাছে। ফার্স্ট পিরিয়ডেই ক্লাসে চলে গিয়েছিল সে। তারপর আর এদিকে আসেনি। একটু আগেই নাকি পুলিশ এসেছিল স্কুলে, বিকাশবাবুকে খুঁজতে। তাঁর বাড়িতেও খোঁজ করতে গিয়েছিল তারা। তাঁকে অবশ্য পাওয়া যায়নি। তিনি গা ঢাকা দিয়েছেন। এই ঘটনার প্রতিবাদেই ক্লাস বয়কট করছেন শিক্ষকরা। তাঁদের মধ্যেই কে একজন যেন ছুটির ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছেন!

যাঁরা হেডমাস্টারের ঘরের ভিতর ছিলেন, তাঁরা বাইরে বেরিয়ে অপেক্ষারত শিক্ষকদের নিয়ে সদলবলে এগোলেন টিচার্স রুমের দিকে। অভ্রও তাঁদের সঙ্গে গিয়ে ঘরে ঢুকল। ঘরের এক কোণে পাশাপাশি বসে আছেন শরদিন্দুস্যার আর ইতিহাসের ভানুবাবু। অভ্র তাঁদের একটু তফাতে গিয়ে বসল। যাঁরা হেডমাস্টারের ঘর থেকে এলেন, তাঁরা মাঝখানে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে শলাপরামর্শ জুড়ে দিলেন। জটলার মধ্যে থেকে একজন বললেন, "হেডমাস্টার বলছেন তিনি নাকি চেষ্টা করছেন! কী চেষ্টা করছেন, তা তো বোঝাই যাচ্ছে!"

আর একজন বললেন, "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুলিশ ঢুকল আর উনি এখনও

BanglaBook.org

'দেখছি-দেখব' করছেন। নাটক হচ্ছে! না, না, কাল থেকে কোনও ক্লাস হবে না! বিকাশদার ব্যাপারে যতক্ষণ না সমাধান হচ্ছে, ততক্ষণ কিচ্ছু হবে না। কাল স্কুলগেটে প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে ধরনায় বসব আমরা।"

কেউ একজন ফুট কাটলেন, "না, না, ধরনায় বসে কিছু হবে না। কাল ছাত্রদের নিয়ে থানা ঘেরাও করব। দেখি, পুলিশ কীভাবে কেস না ওঠায়!"

আগামী কর্মপন্থা কী হবে, তা নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা চলতে থাকল টিচার্স রুমের মধ্যে। অভ্র শুনতে পেল, ভানুবাবু চাপাস্বরে শরদিন্দুস্যারকে বললেন, "অমৃতেন্দু আর নিখিলেশ এখন কী ইউনাইটেড, দেখেছেন? ক'দিন আগে ওরাই স্টাফরুমে টিউশন করা নিয়ে নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি করছিল! কার্ল মার্ক্স বেঁচে থাকলে, ওদের নিয়ে নতুন করে শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্ব লিখতেন!"

শরদিন্দুস্যার কোনও মন্তব্য করলেন না। তাঁর মুখটা যথেষ্ট গম্ভীর বলে মনে হল অভ্রর।

উত্তেজিত শিক্ষকদের মধ্যে একজনের চোখ হঠাৎ পড়ল ভানুবাবুর দিকে। তিনি বললেন, "ভানুদা, রিকোয়েস্ট করা সত্ত্বেও আপনি আমাদের সঙ্গে গেলেন না? এসকেপিস্ট হয়েই সারাজীবন কাটিয়ে গেলেন! কোনও কোলিগ ফিলিংস নেই আপনার?"

ভানুবাবুও উত্তেজিত হয়ে বললেন, "তুমি কী বলতে চাইছ, অমৃতেন্দু? কোলিগ বলেই অন্যায় মেনে নিতে হবে? তার জন্য আন্দোলন করতে হবে? শিক্ষক আন্দোলন কাকে বলে, জানো তুমি? আমি ছাত্র থাকাকালীন মাস্টারমশাইদের আন্দোলন দেখেছি। দেখেছি, কীভাবে আন্দোলন করতে গিয়ে তাঁরা পুলিশের লাঠির ঘায়ে রক্তাক্ত হয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ছেন। দেখেছ নাকি ছয়ের দশকের সেই আন্দোলন?"

তাঁকে কথা শেষ করতে না দিয়ে একজন বলে উঠলেন, "রাখুন ওই ছয়ের দশকের আন্দোলন! ও গল্প শুনতে শুনতে কান পচে গিয়েছে। যতসব বস্তাপচা গালগপ্পো! কাল থেকে আমরা স্কুল চালাতে দেব না!"

ভানুবাবু বললেন, "চালাতে দেবে, না দেবে না, সে তোমাদের ব্যাপার। কিন্তু এত ছাত্র, তাদের দিকটা একবার ভাববে না?"

তিনি কথা শেষ করতে না-করতেই সম্মিলিত মৌখিক আক্রমণ ধেয়ে এল তাঁর দিকে। ভানুবাবুর কথা চাপা পড়ে গেল অন্যান্য শিক্ষকদের চিৎকারে।

BanglaBook.org

অভ্র দেখল, শরদিন্দুস্যার তাঁর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। সেও উঠে পড়ল এবার।

স্কুলগেট থেকে তাঁর পিছন পিছনই বেরল অভ্র। বাইরে বেরিয়ে শরদিন্দু খেয়াল করলেন তাঁকে। হঠাৎ ছুটি হয়ে যাওয়ায় স্কুলগেটের সামনে ছাত্রদের জটলা। ব্যাপারটা চাউর হয়ে গিয়েছে। ছাত্র-অভিভাবক থেকে শুরু করে রিকশাচালক, সকলের মুখেই কৌতূহলের ছাপ। বিকাশস্যারের ব্যাপারটা নিয়েই সকলে আলোচনা করছেন। তাদের ফাঁক গলে রাস্তায় এসে শরদিন্দু তাঁর পাশে সাইকেল নিয়ে হাঁটতে থাকা অভ্রকে বললেন, "স্কুলের ব্যাপারটা দেখেছ তো? তুমি কিন্তু এসবে থেকো না।"

অভ্র বলল, "হ্যাঁ স্যার। ব্যাপারটাকে আমিও সমর্থন করছি না।"

শরদিন্দু বললেন, "সেটাও প্রকাশ্যে কাউকে বলতে যেয়ো না। তুমি টেম্পোরারি স্টাফ। আমি জানি, এই কাজটার উপর এখন তোমার জীবনের অনেককিছুই নির্ভর করছে। হয়তো তোমার সঙ্গে আরও একজনের জীবনও।"

অভ্র ঠিক বুঝতে না পেরে বলল, "তার মানে, স্যার?"

আরও কয়েক পা এগিয়ে, একটু ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে শরদিন্দু বললেন, "তুমি এখন বড় হয়ে গিয়েছ। এখন আর এসব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে দ্বিধা নেই। এই চাকরির উপর ভিত্তি করেই তো তোমাকে নীলার বাড়িতে কথা বলতে যেতে হবে।"

বিস্মিত অভ্রর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "নীলা আপনাকে এসব কথা বলেছে!"

শরদিন্দু হেসে বললেন, "না, তার সঙ্গে আমার এই ব্যাপারে কোনও কথা হয়নি। তবে মেয়েটাকে দেখে আমার ভালই মনে হয়েছে। আমাকে কথাটা বলেছে তিথি, আমার ছাত্র অনির্বাণের স্ত্রী। যে ছেলেটাকে নিয়ে এতবড় ঘটনা, তার মা তিথি। হয়তো দুঃখ, একাকিত্বের জন্যই ওই দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে এই দু'দিনেই। পরশু রাতটা তিথির বাড়িতেই কাটিয়েছে নীলা। সে-ই সব বলেছে তিথিকে আর কথাপ্রসঙ্গে তিথি কথাগুলো আমাকে জানিয়েছে। গতকাল স্কুল থেকে বেরিয়ে আমি নার্সিংহোমে গিয়েছিলাম। অনেক রাত পর্যন্ত ছিলাম ওদের সঙ্গে। আজ সকালেও গিয়েছিলাম।"

অভ্র কী জবাব দেবে বুঝতে না পেরে লজ্জিত স্বরে বলল, "বাড়িতে

BanglaBook.org

বিয়ে নিয়ে নীলার দাদা-বউদি ওর উপর চাপ দিচ্ছে। বিয়ে প্রায় ঠিকই করে ফেলেছে এক জায়গায়। আমি তাই ওর বাড়িতে একবার কথা বলতে যাব ভাবছি।"

শরদিন্দু হাঁটতে হাঁটতে এবার দাঁড়িয়ে পড়লেন। অভ্রর মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে চুপ করে থেকে বললেন, "জীবন একটা বৃত্তের মতো। সকলেই সেটা মেলাতে চায়। তুমিও সেটা মেলাবার চেষ্টা করো। তুমি মেয়েটার বাড়ি যেয়ো।"

আর কোনও কথা না বলে তিনি সাইকেলে উঠে পড়লেন। বিস্মিত অভ্র তাকিয়ে রইল তাঁর যাত্রাপথের দিকে।

গতকাল রাতে নীলার সঙ্গে মোবাইলে বেশ কিছুক্ষণ কথা হয়েছে অভ্রর। বাড়িতে বিয়ের কথা নিয়ে তার সঙ্গে দাদা-বউদির বেশ তর্কাতর্কি হয়েছে। তারউপর নার্সিংহোমের ঝামেলা তো আছেই। সব মিলিয়ে বেশ টেনশনে আছে মেয়েটা। তার কথা ভাবতে ভাবতে সাইকেলে বাড়ির দিকে রওনা হল অভ্র।

বাড়ি ফিরে এক ছাত্রর বাড়িতে ফোন করে সে জানিয়ে দিল, সন্ধেবেলার বদলে দুপুর তিনটে নাগাদ পড়াতে যাবে। সেই মতো খাওয়া সেরে, ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নিয়ে অভ্র যখন সাইকেল নিয়ে বেরোচ্ছে, ঠিক তখনই বাড়ির গেটের সামনে বাইক নিয়ে হাজির হল সুবীর। বলল, "সাইকেল রাখ। আমার সঙ্গে চল। নীহারদার কাছে তোকে নিয়ে যাব।"

অভ্র বলল, "আমি তো এখন পড়াতে যাচ্ছি।"

সুবীর বলল, "পরে যাস। দাদা আমাকে ফোন করেছিলেন। তোর জন্য অপেক্ষা করছেন। এখনই নিয়ে যেতে বললেন। আমি আবার তোকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যাব।"

অভ্র বলল, "আমার জন্য অপেক্ষা করছেন কেন?"

সুবীর বলল, "জানি না। শুধু তোকে খুঁজে নিয়ে যেতে বলল। তবে আমার ধারণা, তোদের স্কুলের ব্যাপারেই কোনও কথা বলবে হয়তো। তোদের স্কুলে ছাত্র পেটানো নিয়ে তো লাফড়া শুরু হয়েছে। ঘণ্টাখানেক আগে তোদের স্কুলের সুনীলবাবুকে পার্টি অফিসে দাদার কাছে ঢুকতে দেখে এসেছি। দাদার ঘরে তখন টিটার্স অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি রসময়বাবু ছিলেন। তোর জন্য যাঁকে ধরা হয়েছিল।"

BanglaBook.org

ব্যাপারটা অভ্রর মাথায় ঢুকল না। কথা না বাড়িয়ে, সে সাইকেল বাড়িতে রেখে বাইকে উঠে পড়ল। সুবীর ঝড়ের গতিতে বাইক চালিয়ে অভ্রকে নিয়ে পৌঁছে গেল পার্টি অফিসে। নীহার চৌধুরীর ঘরে ঢুকে অভ্র দেখল, তিনি ছাড়া সে ঘরে আরও দু'জন আছেন। তাদের মধ্যে একজনকে অভ্র চেনে। স্কুল ম্যানেজিং কমিটির মেম্বর সুনীলবাবু। অপরজন পলিত কেশ, চশমাপরা, বেশ মোটাসোটা চেহারা। নীহারদার মতো অতটা না হলেও, তাঁর চেহারায় বেশ একটা গাম্ভীর্য আছে।

নীহারদা চোখের ইশারায় অভ্র আর সুবীরকে বসতে বললেন। তারা বসার পর সুনীলবাবু, অভ্রকে দেখিয়ে অন্য ভদ্রলোককে বললেন, "রসময়দা, এ-ই সেই অভ্র। যাকে আমরা নিচ্ছি। আপনি ওর ব্যাপারে আমাদের বলেছিলেন ঠিকই। কিন্তু ওকে তো আপনি দেখেননি।"

অভ্র বুঝল, ইনিই শিক্ষকনেতা রসময়বাবু!

রসময়বাবু, সুনীলবাবুর কথার জবাবে বললেন, "আমার সবসময় সকলকে দেখার দরকার হয় না। নীহারদা যা বলেন, অর্থাৎ পার্টির যা ডিসিশন, সেটাই আমি তোমাদের জানাই।"

নীহারদা এবার মৃদু ধমকের সুরে তাঁদের উদ্দেশে বললেন, "এসব আলোচনা রেখে এবার ছেলেটার সঙ্গে কথা বলুন। আপনাদের জন্য আমি আর কতক্ষণ বসে থাকব? আপনাদের লোক একটা কেস ঝামেলা পাকাবে আর আপনারা সব এনে আমার ঘাড়ে ফেলবেন! নিন এবার, কথা শুরু করুন।"

সুনীলবাবু এবার অভ্রকে বললেন, "ক্লাস থেকে আমি রিপোর্ট নিয়েছি, এই দু'দিন তুমি খুব ভাল পড়িয়েছ। ঠিকমতো লেগে থাকতে পারলে কিছুদিনের মধ্যেই হাজারপাঁচেক টাকার মতো টিউশনও জুটে যাবে। জানো তো, আমাদের স্কুলের টিচারদের বাইরেও খুব চাহিদা। অন্য স্কুলের ছাত্ররাও পড়তে চায়।"

রসময়বাবু বললেন, "এই ব্যাপারে আমিও মনে হয় কিছু সাহায্য করতে পারি। আমার পরিচিত কিছু অভিভাবক একজন ভাল অঙ্কের টিচার খুঁজে দেওয়ার কথা বলছেন ক'দিন ধরে। আমি না হয় তোমার কাছে তাঁদের পাঠিয়ে দেব। পয়সাওয়ালা লোক সব," তারপর একটু থেমে বললেন, "কিন্তু যে প্রতিষ্ঠান তোমার বা এই সুনীলের অন্নসংস্থান করে, তুমি নিশ্চয়ই চাও, সেই প্রতিষ্ঠানের সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকুক?"

BanglaBook.org

অভ্র এবার জবাব দিল, "হ্যাঁ স্যার, অবশ্যই চাই।"

রসময়বাবু বললেন, "তুমি তো জানোই দু'দিন ধরে একটা ব্যাপার নিয়ে তোমাদের স্কুলে গন্ডগোল শুরু হয়েছে। ঝামেলা না মেটা পর্যন্ত আগামীকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস বয়কটের ডাক দিয়েছেন মাস্টারমশাইরা। তাঁদের আমি দোষ দিতে পারি না। আক্রান্ত হলে তাঁরাই বা আন্দোলন করবেন না কেন? তাঁদের মধ্যে অনেকেই আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত। কিন্তু মুশকিল হল, স্কুলটাকে বাঁচাতে হবে, তার সুনাম রক্ষা করতে হবে এবং এই ব্যাপারে মনে হয় তুমি আমাদের সাহায্য করতে পারো।"

অভ্র অবাক হয়ে জিজ্ঞেস বলল, "আমার সাহায্য? কী সাহায্য?"

নীহারদা চশমার ফাঁক দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন অভ্রর দিকে। মুখটা যেন নিরেট পাথরের। সুনীলবাবুর মুখটাও সেরকমই মনে হল অভ্রর।

রসময়বাবু ফের শুরু করলেন, "ব্যাপারটা নিয়ে যে থানা-পুলিশ হয়েছে, তুমি জানো। নীহারদা থানায় কথা বলেছেন। কিন্তু সমস্যা হল, কমপ্লেন যদি উইড্র না করা হয়, তা হলে পুলিশ কিছু করতে পারবে না। ওরা বলছে, বিকাশকে অ্যারেস্ট করবে।"

অভ্র এবার বলে ফেলল, "কিন্তু আমি তো শুনেছি, পুলিশ তো নীহারদারই কথা শোনেন।"

এতক্ষণ পর মুখ খুললেন নীহারদা। গম্ভীরভাবে বললেন, "হ্যাঁ, তা শোনে ঠিকই। আমি এসপি-র কাছে ফোন করলে, তিনি এখনই শুনবেন। কিন্তু আমি এই সামান্য ব্যাপারটা নিয়ে অতদূর এগোতে চাইছি না। ওসি-র সঙ্গেও আমার কথা হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হল এই কেসের ইনভেস্টিগেটিং অফিসারকে নিয়ে। উনি থানায় নতুন এসেছেন। আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি, সেই অফিসার কলেজ লাইফে আমাদের বিরোধী ছাত্র সংগঠন করতেন। স্বাভাবিকভাবেই তিনি আমাদের প্যাঁচে ফ্যালার চেষ্টা করবেন। তিনি ওসি-কে বলেছেন, কমপ্লেন উইড্র না করা হলে তাঁর কিছুই করার নেই। তবে ওসি আমাকে একটা সাজেশন দিয়েছেন। সেটা করতে পারলে ইনভেস্টিগেটিং অফিসারও কিছু করতে পারবেন না। সেই ব্যাপারেই তোমাকে ডাকা হয়েছে।"

অভ্র অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল নীহারদার দিকে।

তিনি বলে চললেন, "তিনজন পুলিশের কাছে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন। মূল

BanglaBook.org

কমপ্লেন ছেলেটার মা করলেও, অন্য একজনের স্টেটমেন্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ। সে হল নার্সিংহোমের রিসেপশনিস্ট নীলা। সে যদি স্টেটমেন্ট পালটে বলে যে, বাচ্চাটার মা প্রথমে বলেছিলেন যে, রাস্তায় গাড়ির ধাক্কায় ছেলেটা চোট পেয়েছে, তা হলে অভিযোগকারীর স্টেটমেন্ট দাঁড়াবে না। বিকাশ কোর্টে উঠেই জামিন পাবে। পুলিশও তাকে আর হ্যারাস করবে না। ওকে দিয়ে কাল সকাল আটটার মধ্যে কাজটা করাতে হবে তোমাকে।"

কথাগুলো আদেশের মতো শোনাল। অভ্র হতবাক হয়ে গেল তাঁর কথা শুনে। নীলার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা এঁরা জানলেন কী করে! সুবীর বলেছে? না কাল যখন স্কুলগেটে অভ্র, শরদিন্দুস্যারকে নীলার কথা বলছিল, তখন পাঁচিলের আড়ালে দাঁড়িয়ে সুনীলবাবুরা শুনেছেন সে কথা!

রসময়বাবু, অভ্রকে চুপ করে থাকতে দেখে হেসে বললেন, "কী ভাবছ? আমরা ব্যাপারটা কীভাবে জানলাম? তোমার বন্ধু কিন্তু আমাদের জানায়নি। এই শহরে একটা পাতা নড়লেও সে খবর নীহারদার কাছে পৌঁছোয়। এটা তো নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার। যার চাকরির জন্য আমরা সুপারিশ করি, তার সম্বন্ধে কিছু খোঁজখবর আমাদের রাখতেই হয়। মেয়েটার স্টেটমেন্টটা তোমাকে কিন্তু বদলাতেই হবে। সামনেই তোমাদের স্কুলে ম্যানেজিং কমিটির ইলেকশন। আমরা চাই না স্কুলগুলো আমাদের হাতছাড়া হোক।"

অভ্র এবার বলার চেষ্টা করল, "কিন্তু স্টেটমেন্ট উইড্র করাটা অন্যায় হবে। ব্যাপারটা তো সত্যিই ঘটেছে..."

নীহারদা বললেন, "ন্যায়-অন্যায়ের ব্যাপারটা আপেক্ষিক। তোমার চেয়েও ভাল তিনজন ক্যান্ডিডেট ইন্টারভিউ দিয়েছিল, তাদের বাদ দিয়ে তোমাকে নেওয়া হয়েছে। এটাও তো তাদের প্রতি অন্যায়। যাই হোক, এসব বলে আমি সময় নষ্ট করতে চাই না। কাল সকালের মধ্যে আশা করি ব্যাপারটা তুমি মিটিয়ে ফেলবে। ওরা তোমাকে ফোন করবে। এখন এসো তা হলে।"

পার্টি অফিসের বাইরে এসে সুবীরের বাইকের পিছনে চুপচাপ উঠে বসল অভ্র। বাইকটা স্টার্ট করে কিছুদূর যাওয়ার পর সুবীর বলল, "বিশ্বাস কর, নীলার ব্যাপারটা আমি ওদের বলিনি। পার্টি করলেও এতটা নীচে আমি এখনও নামিনি।"

অভ্র বলল, "জানি। কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে রসময়বাবুরা হঠাৎ এরকম উদ্যোগী হলেন কেন? অ্যাসোসিয়েশনের স্বার্থে?"

BanglaBook.org

"এসবের সঙ্গে ওদের ব্যক্তিগত স্বার্থও জড়িয়ে আছে প্রবলভাবে। সেই জন্যই ওরা স্কুলগুলোকে হাতে রাখতে চায়। ওই যে ম্যানেজিং কমিটির ইলেকশনের কথা বলছিল... স্কুলগুলো দখলে রাখার উপরে ওদের অনেককিছু নির্ভর করে।"

"কীরকম?"

সুবীর বাইক চালাতে চালাতে জবাব দিল, "অনেকরকম স্বার্থ। তোকে একটা উদাহরণ দিই। ধর, রসময়বাবুর আন্ডারে কুড়িটা স্কুল আছে। প্রতিটা স্কুলে ফাইভ-টু-টেন, কমপক্ষে পঞ্চাশ সেট বই লাগে। কুড়িটা স্কুল মানে হাজার সেট বই। প্রতি স্কুলে অ্যাসোসিয়েশনের ইনফ্লুয়েন্স খাটিয়ে যদি দশ সেট বই করা যায়, তা হলে, সব মিলিয়ে দুশো সেট। করতে পারলেই পাবলিশাররা দু'লাখ দিয়ে যাবে। কেউ জানলও না, দু'লাখ পকেটে ঢুকে গেল! এ ছাড়া নিজেদের লোক দিয়ে স্কুলবিল্ডিং তৈরি করানো, মাল সাপ্লাই দেওয়াও আছে। ওই জন্যই ম্যানেজিং কমিটি দখলের জন্য এত মারামারি। সকলেই নাকি শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য নিবেদিত প্রাণ," বলে কারও উদ্দেশে গাল পাড়ল সে।

"নীহারদা এসব জানেন না?"

"সবই জানেন। কিন্তু কিছু করার নেই। পার্টি করতে হলে সকলকে নিয়ে চলতে হয়। সামনে ইলেকশন। জনমানসে আবার শিক্ষকদের একটা প্রভাব আছে। সবই ভোটের ব্যাপার। রসময়বাবুই দাদাকে কনভিন্স করিয়েছে তোকে ব্যাপারটা বলার জন্য।"

অভ্র বলল, "তুই আমাকে এখন কী করতে বলছিস?"

"আমি ব্যক্তিগতভাবে তোকে কোনও চাপ দেব না। নীলার সঙ্গে কথা বলে দ্যাখ, সে কী বলে। আমার ভয় শুধু তোর চাকরির ব্যাপারে। নীহারদার উপর কোনও কথা বলার ক্ষমতা আমার নেই রে," অসহায় গলায় বলল সুবীর।

সুবীর তাকে পাড়ার মোড়ে নামিয়ে দিয়ে যাওয়ার পর, সেখানে দাঁড়িয়েই নীলাকে মোবাইলে ধরে অভ্র বলল, "তুমি আজ আসতে পারবে একবার?"

নীলা বলল, "পারব, তবে সাড়ে ছ'টায় আমাকে নার্সিংহোমে ঢুকতে হবে। বেশিক্ষণ থাকতে পারব না। সাড়ে পাঁচটার সময় কুসুমবাগানের মোড়ে অপেক্ষা কোরো।"

BanglaBook.org

"আচ্ছা," অভ্র ফোনটা কেটে দিল।

ঠিক সাড়ে পাঁচটায় কুসুমবাগানে পৌঁছে গেল অভ্র। নীলা দাঁড়িয়েই ছিল। তার সাইকেলের ক্যারিয়ারে সে বসার পর অভ্র বলল, "চলো, কোথাও গিয়ে বসা থাক।"

"কোথায় যাবে?" জানতে চাইল নীলা।

অভ্র বলল, "চলো, পরিবাড়ির ওখানে যাব। তবে বাড়ির ভিতরে নয়। ওই পুকুরটার ধারে কিছুক্ষণ বসে চলে আসব।"

ফাঁকা রাস্তা আর জংলাবাগান পেরিয়ে পরিবাড়ির কাছে পৌঁছে গেল তারা। সাইকেল রেখে পুকুরের ভাঙা সিঁড়ির ধাপে বসল দু'জন। আসল কথাটা বলার আগে অভ্র বলল, "তোমার বাড়ির খবর কী?"

নীলা বলল, "তুমুল অশান্তি চলছে। পাত্রপক্ষ সামনের সপ্তাহেই রেজিস্ট্রি সেরে নিতে চায়। আমি বলেছি, করব না। পরশু বিকেলে দাদা বাড়ি থাকবে, তুমি যেয়ো। ওরা তোমার সঙ্গে কী ব্যবহার করবে, জানি না। ও হ্যাঁ, তুমি টেম্পোরারি না পার্মানেন্ট, তা আগ বাড়িয়ে বলতে যেয়ো না। স্কুল মাস্টারের কাজ করো, এটুকুই শুধু বলবে। ওরা স্কুলের ব্যাপার তিলশত বোঝে না," কথাটা শেষ করে একটু হেসে সে জুড়ল, "তোমার কোনও দাবিদাওয়া আছে নাকি? আমাদের পাড়ার সুবলস্যার বিয়েতে বাইক নিল। তুমিও একটা চেয়ে দেখতে পারো দাদার কাছে!"

অভ্রও হেসে ফেলল তার কথায়। বলল, "ছেলেটার কোনও খবর পাওয়া গেল?"

নীলা হাসি থামিয়ে বলল, "না, পাওয়া যায়নি। স্যার ওর ছবি দিয়ে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। কাল সেটা বেরোবে মনে হয়," সে বলেই চলল, "ছেলেটার মায়ের কষ্ট আর চোখে দেখা যাচ্ছে না। এখন তো কাঁদতে কাঁদতে তিথিদির চোখের জলও শুকিয়ে গিয়েছে। ওর স্বামীর আবার মাথায় গন্ডগোল আছে। তিথিদি কত কষ্ট করে ছেলেটাকে বড় করেছে। আমি একরাত ছিলাম ওর বাড়িতে। সারারাত আমরা কথা বলেছি। অনেক কষ্ট ওর।"

অভ্র বলল, "আর সেই কথার মাঝে তুমি আমাদের সম্পর্কের কথা ওকে বলেছ, ভদ্রমহিলা আবার কথাপ্রসঙ্গে সেটা শরদিন্দুস্যারকে বলেছেন। এমনকী, তোমার বাড়িতে আমার যাওয়ার কথা পর্যন্ত! উনি আজ স্কুল থেকে

BanglaBook.org

ফেরার সময় সেকথা বললেন। উনি আমার স্যার তো, আমার বেশ লজ্জাই লাগছিল।"

নীলা বলল, "যা সত্যি, সেটাই আমি তিথিদিকে বলেছি। শরদিন্দুস্যার তো কাল আমাদের ওখানে, স্যারের ফ্ল্যাটে অনেকক্ষণ ছিলেন। তখনই কথাটা হয়েছে বোধহয়।"

অভ্র এবার আসল প্রসঙ্গে গেল, "তোমাকে একটা খবর জানাই। আজ দুপুরে নীহারবাবু, সুবীরকে দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে। সুবীরের সঙ্গেই গিয়েছিলাম পার্টি অফিসে। টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের দুই নেতাও ছিলেন সেখানে। তাঁদের মধ্যে একজন আবার আমাদের স্কুলেরই ম্যানেজিং কমিটির টিচার্স রিপ্রেজেন্টেটিভ। সেখানে ওঁরা তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা বললেন। ওঁরা সব খবর রাখেন, ব্যক্তিগত সম্পর্কের খবরও।"

নীলা বিস্মিতভাবে বলল, "তার মানে?"

অভ্র বলল, "বিকাশস্যারের পক্ষ নিয়ে অন্য শিক্ষকরা ক্লাস বয়কট করছেন। নীহারবাবুরা চাইছেন সমস্যার সমাধান হোক। অর্থাৎ বিকাশস্যার যাতে ঝামেলার হাত থেকে মুক্ত হন। পুলিশ ওদের বলেছে, সেটা অভিযোগ তুলে না নিলে সম্ভব নয়। তবে একটা পথ খোলা আছে। সেটা হল, তুমি যদি পুলিশের কাছে দেওয়া স্টেটমেন্ট পালটে দাও। তোমাকে বলতে হবে যে, তিথিদি যখন ছেলেটাকে নার্সিংহোমে আনেন, তখন তিনি তোমাকে বলেছিলেন যে, রাস্তায় বাচ্চাটার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। তা হলে অভিযোগে জোর থাকবে না। কাল সকাল আটটার মধ্যে তোমাকে দিয়ে কাজটা আমাকে করাতে বলেছেন।"

ইটের একটা টুকরো হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল নীলা। অভ্রর কথা শেষ হতেই সে টুকরোটা সজোরে জলে ছুড়ে মারল।

একঝাঁক লাল ফড়িং জল থেকে ছিটকে উঠে, ইতিউতি উড়তে লাগল। চিৎকার করে সে বলে উঠল, "না, আমি এতবড় বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না! জানো, এর মধ্যেই ওরা স্যারকেও নার্সিংহোমে ফোন করে থ্রেট করেছে। বলেছে, নার্সিংহোমে একদিন কোনও না-কোনও রোগী মরবেই। তখন স্যারকে ওরা দেখে নেবে। স্যার রাজি হননি। ওদের জন্যই উনি তিথিদিদের নিজের বাড়িতে এনে রেখেছেন। তুমি কী বললে ওদের?"

অভ্র বলল, "আমি বলার চেষ্টা করছি, ব্যাপারটা অন্যায়।"

BanglaBook.org

নীলা বেশ উত্তেজিতভাবে বলল, "তখনই তোমার স্পষ্টভাবে না বলে দেওয়া উচিত ছিল। তুমি জানো, ওই বিকাশস্যার কত বড় শয়তান! তিথিদি ক'দিন আগে তোমাদের স্কুলে গিয়েছিল বইয়ের ক্যানভাসিং-এর জন্য। সেখানে বিকাশস্যারের সঙ্গে তার কথা হয়। যেদিন ছেলেটাকে মারার ঘটনা ঘটে, সেদিন দুপুরে স্কুল থেকে বেরিয়েছিলেন উনি। তার আগেরদিন টেলিফোনে তিথিদিকে বইয়ের ব্যাপারে কথা বলবেন বলে, এক জায়গায় দেখা করতে বলেন। স্কুলের স্যার ডেকেছেন, তাই সরল বিশ্বাসে তিথিদি সেখানে গিয়েছিল। তারপর লোকটা কথা বলার নাম করে কুইন্স ক্যাফের একটা কেবিনে নিয়ে গিয়ে ওর গায়ে হাত দিয়েছিল! তিথিদি সেকথা অন্য কাউকে বলতে পারেনি। আমি তার বুকে সে দাগ দেখেছি। লাল দগদগে ক্ষতচিহ্ন," কথাগুলো বলেই শিউরে উঠল নীলা।

অভ্র বলল, "তুমিই তো ক'দিন আগে নীহারবাবুর কাছে যাওয়ার কথা বলেছিলে। আমার চেয়ে যোগ্য যারা ছিল, তাদের বাদ দিয়ে ওরা আমাকে চাকরিতে নিয়েছে। এটাও যে অন্যায়, সেই কথাটাই ওরা আমাকে মনে করিয়ে দিল।"

নীলা বলল, "হ্যাঁ, অবশ্যই অন্যায়। আসলে আমরা নিজেদের অবস্থান থেকে সব দেখি। গভীরভাবে কিছু ভাবি না। আমি ভুল করেছি, আর তার প্রায়শ্চিত্ত আমিই এবার করব। তার জন্য হয়তো আমাকে অনেক ত্যাগ করতে হবে। তবু আমি করব! তিথিদির বুকের দাগটা এখনও আমার চোখে ভাসছে!"

নীলাকে দেখে অভ্রর মনে হল, এ এক অন্য নারী! তার সঙ্গে এই নারীর আগে পরিচয় হয়নি!

পরিবাড়ির পিছনে সূর্য ডুবে গিয়েছে। কালো হয়ে আসছে পুকুরের জল। অন্ধকার দ্রুত গ্রাস করে নিচ্ছে চারপাশ। একসময় নীলা বলল, "চলো, এবার ফিরতে হবে।"

দু'জনে উঠে দাঁড়াল। ঠিক সেই সময় অভ্রর মোবাইল বেজে উঠল। অচেনা নম্বর। সে কলটা রিসিভ করতেই, ওপাশ থেকে শোনা গেল, "অভ্র, আমি রসময়স্যার বলছি। কিছু হল? নীহারদা আমাকে খোঁজ নিতে বললেন। তোমার কথা হয়েছে মেয়েটার সঙ্গে?"

অভ্র একবার নীলার দিকে তাকাল। অন্ধকারে তার মুখ ঠিক বোঝা যাচ্ছে

BanglaBook.org

না। অভ্র জবাব দিল, "হ্যাঁ, হয়েছে। ও পারবে না।"

রসময় বললেন, "কাল সকাল পর্যন্ত সময় দিচ্ছি। তুমি ওকে বোঝাও..."

"আমিও পারব না," রসময়কে কিছু বলতে না দিয়ে লাইনটা কেটে দিল অভ্র।

কথা শেষ হওয়ার পর সাইকেলে উঠে বসল দু'জনে। প্যাডেলে চাপ দিল অভ্র, তারপর তারা দু'জনেই হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

॥ ১৯ ॥

"তারপর? তারপর কী হল?" বসুধরা জানতে চাইলেন।

বাবলু জবাব দিল, "একবার, দু'বার, তিনবার, শরদিন্দুস্যার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। সবগুলোই অর্ধেক অর্ধেক গোল্লা হল," উত্তর দেওয়ার পরই মলিন হাসি ফুটে উঠল ছেলেটার মুখে।

বসুধরা একবার তার কপাল ছুঁলেন। না, জ্বরটা ছেড়েছে। এই দু'রাত ছেলেটার জন্য প্রায় জেগেই কাটিয়েছেন তিনি। ছেলেটার হুঁশ অবশ্য গতকাল দুপুরেই ফিরেছিল। তবে আতঙ্ক কাটিয়ে স্বাভাবিক হতে সময় লেগেছে। পল্টুর দু'দিন ধরে কোনও পাত্তা নেই। ছেলেটার জন্য স্টেশন পর্যন্ত গিয়ে ওষুধ কিনে এনেছেন বসুধরা। তাতে কাজ দিয়েছে। কানের ব্যথাটাও আর নেই বলছে। ভয় কাটিয়ে ধীরে ধীরে প্রায় সব কথাই সে বলেছে তাঁকে।

বসুধরা কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ছেলেটার মুখের দিকে। কত আর বয়স হবে ওর। বড়জোর দশ! তাঁর নাতি প্রিতমের বয়সি হবে ছেলেটা। পাঁচবছর হতে চলল বসুধরা দেখেননি তাকে। এই বাচ্চাটার সান্নিধ্য যেন দু'দিনের জন্য প্রিতমকেই এনে দিয়েছে তাঁর কাছে। জ্বরের ঘোরে প্রথম রাতে যখন বাচ্চাটা মাঝে মাঝে জড়িয়ে ধরছিল বসুধরাকে, তখন তার মধ্যে যেন নাতির স্পর্শই অনুভব করছিলেন তিনি।

বসুধরা জানতে চাইলেন, "তুমি নার্সিংহোম থেকে পালালে কেন?"

বাবলু বলল, "ওই যে, সকালবেলা ওই মেয়েটা বলল, 'পুলিশ আসবে!'"

BanglaBook.org

"কোন মেয়েটা?"

বাবলু একটু ভেবে বলল, "সেদিন ভোরবেলা একটা মেয়ে ঢুকল আমার ঘরে। আমি শুয়েছিলাম। সে আমার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার নাম তিতাস। তোমাকে কি স্কুলে খুব মেরেছে?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' সে বলল, 'কাল যখন বাবা আর নীলামাসিরা তোমার কথা বলছিল, তখন আমি আড়াল থেকে শুনেছি। আমি কোনও পেশেন্টের ঘরে ঢুকি না, বাবার বারণ আছে। তবু তোমাকে দেখতে এলাম।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন দেখতে এলে?' সে ডানহাতের একটা আঙুল দেখিয়ে বলল, 'স্কুলে আমাকেও মেরেছে। দিদিমণি আমার আঙুল ভেঙে দিয়েছিল। তখন আমার খুব কষ্ট হয়েছিল, আমার বন্ধুরা কেউ দেখতে আসেনি। একা একা শুয়ে থাকতে আমার ভাল লাগত না। তাই ভাবলাম, তোমারও নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে। সেই জন্যই দেখা করতে এলাম।' তারপরই মেয়েটা বলল, 'আজ পুলিশ আসবে!' আমি চমকে উঠে বললাম, 'কেন?' সে উত্তর না দিয়ে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তখনই আমার মনে পড়ল, বিকাশস্যার বলেছিলেন, কেউ জিজ্ঞেস করলে আমি যেন বলি যে রাস্তায় পড়ে গিয়ে আমার লেগেছে। আমার মনে হল, হয়তো আমি বিকাশস্যারের কথা বলে ফেলেছি মাকে। সবাই জেনে ফেলেছে ব্যাপারটা। পুলিশ এলে তো আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। পুলিশ তো বিকাশস্যারের বন্ধু হয়।"

বাবলুর কথার পাত্রপাত্রীরা পরিচিত না হলেও বসুধরা মোটামুটি ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিলেন।

একটু দম নিয়ে বাবলু ফের বলল, "পুলিশ যদি আমাকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়, তাই আমি মনসার ঢিপিতে গিয়ে লুকিয়েছিলাম। কিন্তু জঙ্গলে আমার ভয় করছিল, তাই আমি এখানে চলে এলাম।"

বসুধরা বলল, "কিন্তু তোমাকে তো বাড়ি ফিরতে হবে। তোমার বাবা-মা নিশ্চয়ই তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। খুব চিন্তা করছেন। তোমাকে তো বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে।"

বাবলু বলল, "না, না, আমি বাড়ি যাব না। তা হলে পুলিশ আমাকে ধরবে। আমার বাবা-মাকেও ধরে নিয়ে যাবে। আমি বাবা-মাকে খুব ভালবাসি!"

বসুধরা বাবলুর মাথায় হাত বুলিয়ে, তাকে আশ্বস্ত করার জন্য বললেন, "সেই জন্যই তোমাকে বাড়ি ফিরতে হবে। তুমি যেমন তাঁদের ভালবাসো,

BanglaBook.org

তাঁরাও তো তোমাকে ভালবাসেন। তাঁরা কত কষ্ট পাচ্ছেন, বলো তো? পুলিশ তোমাকে ধরবে না। পুলিশ আমারও বন্ধু। আমি ওদের বলে দেব।"

বাবলু চোখ গোল গোল করে বলল, "তোমারও বন্ধু হয়! তুমি বললে ওরা আমাকে ধরবে না! সত্যি বলছ?"

বসুধরা তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "হ্যাঁ, সত্যি! আচ্ছা, এবার তুমি বলো, তোমার বাড়ি কোথায়?" গত দু'দিন ধরে বেশ কয়েকবার তার ঠিকানা জানতে চেয়েছেন তিনি। পাছে বসুধরা তাকে বাড়ি নিয়ে যান, সেই ভয়ে তার বাড়ির ঠিকানা বলতে চাইছে না বাচ্চাটা। ভালনামটাও বলেনি, শুধু ডাকনামটা বলেছে, বাবলু। কিন্তু বসুধরাকে কাল ফিরে যেতে হবে। এতটুকু ছেলেকে এই বাড়িতে ফেলে রেখে চলে যাওয়া যাবে না। তিনি মনে মনে ভাবলেন, ঠিকানাটা না বললে শেষপর্যন্ত হয়তো পুলিশের হাতেই তাকে দিয়ে দিতে হবে।

উত্তরের আশায় বাবলুর দিকে তাকিয়ে ছিলেন তিনি। সে প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, "বাড়ি গেলেই মা আমাকে স্কুলে পাঠাবে। বিকাশস্যার আবার আমাকে বৃত্ত আঁকতে বলবেন। আমি পারব না। না পারলে আবার মারবেন স্যার। আমি তখন কী করব?"

বসুধরা বললেন, "ঠিক আছে, আমি তোমাকে বৃত্ত আঁকা শিখিয়ে দেব।"

বিস্মিত বাবলু বলে উঠল, "তুমি পারবে? মেলাতে পারবে? শরদিন্দুস্যার মেলাতে পারেনি, বাবাও বলে, 'মিলবে না, মিলবে না।' তুমি পারবে?"

বসুধরা জানালার বাইরে তাকালেন। নিঝুম দুপুরে দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলো যেন নিশ্চুপ হয়ে আছে তাঁর উত্তরের আশায়। সেদিকে তাকিয়ে তিনি অস্পষ্ট স্বরে তাদেরই যেন বললেন, "না, আমিও যে মেলাতে পারিনি!"

নির্জন দুপুরের দমকা বাতাসে যেন মৃদু কেঁপে উঠল গাছের পাতা। নাকি বসুধরার দীর্ঘশ্বাস ছুঁয়ে গেল তাদের?

"তুমি না পারলে, আমায় এঁকে দেবে কী করে?" বাবলু অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

বসুধরা হেসে বললেন, "আমি বলে দেব, কীভাবে আঁকতে হয়। তারপর তুমি নিজেই দেখবে, আঁকতে পারছ। নিজেই মেলাতে পারবে। এবার বলো, তোমার বাড়িটা কোথায়?"

BanglaBook.org

বাবলু বলল, "ঠিক আছে, আগে তুমি আমাকে শিখিয়ে দাও। তারপর বলব।"

"সত্যি তো?"

বাবলু তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, "হ্যাঁ, সত্যি, সত্যি, সত্যি!"

ঠিক এই সময় একটা গাড়ি এসে থামল নীচে। ওদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন বসুধরা। তিনি জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন, জনা চারেক লোক নামল বেশ বড় এবং ঝকঝকে একটা গাড়ি থেকে। তাদের মধ্যে দামি সুটে সজ্জিত এক ভদ্রলোককে দেখতে পেলেন তিনি। তাকে অবশ্য তরুণই বলা চলে। সঙ্গের লোকগুলো সম্ভবত তার অধস্তন কর্মী। তারা উপরের দিকে তাকাতেই বসুধরার সঙ্গে চোখাচোখি হল। তিনি তাদের উপরে উঠে আসতে বললেন। দোতলায় উঠে এল তারা। সুট পরা তরুণটি নিজের পরিচয় দিল। তার নাম শুভব্রত। বসুধরা বুঝতে পারলেন, এর সঙ্গেই টেলিফোনে কথাবার্তা হয়েছে তাঁর।

কিছু সৌজন্যসূচক কথাবার্তার পর আসল ব্যাপারে চলে এল শুভব্রত। একটা সেল ডিডের কাগজ বের করে এগিয়ে দিল বসুধরার দিকে। তার থেকে পেন চেয়ে কাগজে সই করতে গিয়েও থেমে গেলেন তিনি।

শুভ্রবত তা দেখে বললেন, "সেল ডিডের কোথাও কি কোনও অসুবিধা আছে, ম্যাডাম? আমাদের ফার্মের ল' অফিসার তৈরি করেছেন ডিডটা। আপনার যদি কোনও কোয়ারি থাকে, আমি ক্ল্যারিফাই করে দিতে পারি।"

গোটা কাগজটা ঝাপসা মনে হচ্ছে বসুধরার। অক্ষরগুলো চোখে পড়ছে না। তিনি অস্পষ্টভাবে বললেন, "আসলে আমি মানুষ বলেই মনে করি পরিটাকে। কতদিনের সম্পর্ক... সেই ছোটবেলা থেকে! তাকে দিয়ে দিচ্ছি তো..." গলাটা ধরে এল তাঁর।

শুভব্রত বলল, "বুঝতে পারছি, ম্যাডাম। পুরনো জিনিস তো, আপনার কষ্ট হচ্ছে। তবে একটা ব্যাপার আপনাকে অনেস্টলি অ্যাশিয়োর করছি, ও যেখানে থাকবে, ভাল থাকবে। আমরা যত্নে রাখব ওকে।"

বসুধরা আর দেরি করলেন না। যদি তাঁর নিজের মত বদলে যায়, সেই ভয়ে তিনি কাঁপা কাঁপা হতে সই করে দিলেন।

সইসাবুদ মিটে যাওয়ার পর শুভব্রত একটা খাম বের করে বসুধরার হাতে দিয়ে বলল, "চেকটা একবার দেখে নিন, ম্যাডাম। যা বলেছিলাম, সেই

BanglaBook.org

অ্যামাউন্টই আছে। যদিও এমন একটা ওয়র্ক অফ আর্টের মূল্য টাকাপয়সা দিয়ে মাপা যায় না। তবুও..."

বসুধরা খামটা আর খুললেন না। তিনি শুভব্রতকে বললেন, "আপনার কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে।"

তিনি আসলে বলতে চাইছিলেন যে, আজকের রাতটা অন্তত পরিটা নিজের জায়গাতেই থাকুক। শেষ রাতটা তার কাছেই থাকতে চান বসুধরা। সম্ভব হলে কাল ভোরে তিনি চলে যাওয়ার পর তারা যেন ওকে নিয়ে যায়। কিন্তু তিনি সে কথা পাড়ার আগেই শুভব্রত বলল, "হ্যাঁ, আপনার রিকোয়েস্ট শুনব। তবে তার আগে একটা কথা বলে নিই। যে গাড়িতে আমাদের পরিটা নিয়ে যাওয়ার কথা, রাস্তায় সেটার ব্রেকডাউন হয়েছে। গাড়িটার এখানে পৌঁছোতে রাত হয়ে যাবে। কাজেই আজ আর পরিটা নেওয়া যাবে না। রাতটা এখানেই কোনও একটা হোটেলে কাটিয়ে কাল সকালে এসে পরিটাকে নিয়ে যাব। হ্যাঁ, এবার বলুন, কী রিকোয়েস্ট?"

যে অনুরোধ বসুধরা করতে যাচ্ছিলেন, তা কাকতালীয়ভাবে শুভব্রতর মুখ থেকে বেরিয়ে আসায় তিনি আর সে প্রসঙ্গে গেলেন না। তিনি বললেন, "আপনাদের গাড়িটা কি আমাকে কিছুক্ষণের জন্য শহরের দিকে নিয়ে যেতে পারে? আধঘণ্টার মতো সময় লাগবে হয়তো। কাল চলে যাচ্ছি তো, এর জন্য কয়েকটা জিনিস কিনতে হবে," বলে তিনি পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বাবলুকে দেখালেন।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্বচ্ছন্দে নিয়ে যান। আমি ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি। ইন দ্য মিনটাইম, আমি আমার সঙ্গের মিস্ত্রিদের ভাল করে বুঝিয়ে দিই, কীভাবে তারা পরিটাকে বেদি থেকে খুলে নীচে নামাবে। কাজটা খুব সাবধানে করতে হবে, যাতে খুলতে বা নামাতে গিয়ে কোনও আঘাত না লাগে। অনেক পুরনো জিনিস তো," বলতে বলতে শুভব্রত বাবলুকে দেখিয়ে বললেন, "আপনার নাতি?"

বসুধরা বললেন, "হ্যাঁ, ও খুব ভাল ছেলে। ও বাড়িতেই রইল। আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসব।"

বসুধরা গাড়ি নিয়ে সোজা চলে গেলেন স্টেশনবাজারে। একটা বই-খাতার দোকান দেখতে পেয়ে গাড়িটা থামালেন। দোকানে তাঁর যা যা দরকার, সব পেয়েও গেলেন। দোকান থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠতে গিয়ে

BanglaBook.org

ফুটপাতের গায়ে ল্যাম্পপোস্টে সাঁটা একটা হ্যান্ডবিলে চোখ আটকে গেল তাঁর। সেখানে বড় বড় হরফে লেখা 'সন্ধান চাই' আর তার সঙ্গে একটা ছবি ছাপা। আরে, এ তো বাবলুর ছবি! কৌতূহলী হয়ে বসুধরা এগিয়ে গেলেন। বিজ্ঞাপন থেকে ওর ভাল নামটাও জানতে পারলেন তিনি, কিংশুক মজুমদার। হ্যান্ডবিলে তার বিবরণ, নিখোঁজ হওয়ার তারিখ, ঠিকানা সবই দেওয়া রয়েছে। সঙ্গে রয়েছে যোগাযোগের জন্য তিনটে ফোননম্বর। প্রথমটা জনৈক ডক্টর চক্রবর্তীর, দ্বিতীয়টা কিংশুকের মা তিথি মজুমদারের। তৃতীয় নামটা দেখেই চমকে উঠলেন বসুধরা। স্পষ্ট লেখা আছে, শরদিন্দু মিত্র এবং তার মোবাইল নম্বর! কী যেন ভেবে সেটা একটা কাগজে টুকে, গাড়িতে উঠে বসলেন বসুধরা।

ফেরার সময় একটা রাস্তার মোড়ে গাড়িটা বাঁক নিতেই হঠাৎ পল্টুকে দেখতে পেলেন তিনি। উলটোদিক থেকে রিকশা নিয়ে আসছিল সে। পরস্পরকে দেখে দু'জনেই থামল। পল্টুর চেহারা কেমন উসকোখুসকো। দেখে মনে হচ্ছে, তার উপর দিয়ে খুব ধকল গিয়েছে। বসুধরা তাকে বললেন, "কী রে, দু'দিন ধরে তো তুই একদম বেপাত্তা! কাল ভোরে আমি চলে যাব, জিনিসপত্র নিতে আসবি না? তা কী হল, ছেলে না মেয়ে?"

পল্টু হেসে জবাব দিল "ছেলে," তারপর বলল, "দু'দিন খুব ঝক্কি গেল। তোমার কাছে তাই যেতে পারিনি। কাল যাচ্ছ কখন? এ গাড়ি কার?"

বসুধরা বললেন, "গাড়িটা অন্য লোকের। আমি কিছুক্ষণের জন্য নিয়েছি। এই গাড়ি চলে যাবে। কাল খুব ভোরে আমি রওনা দেব। সাড়ে ছ'টার ট্রেন ধরব।"

পল্টু বলল, "আমি পাঁচটায় পৌঁছে যাব তোমার কাছে। তবে জিনিসপত্তরের জন্য নয়, ঠাকুমা। তোমাকে আমি ইস্টিশনে একেবারে গাড়িতে উঠিয়ে দেব।"

"ঠিক তো?"

"একদম ঠিক," পল্টু হাসল।

বসুধরা যখন পরিবাড়িতে ফিরলেন, তখন বিকেল গড়িয়ে গিয়েছে। বাড়ির নীচেই সদলবলে অপেক্ষা করছিল শুভব্রত। তিনি গাড়ি থেকে নামার পর সে বলল, "তা হলে, আমরা এখন আসছি, ম্যাডাম। কাল সকালে আমরা আসব।"

বসুধরা বললেন, "আমি কাল ভোরের ট্রেন ধরব। দেখা না হলেও

BanglaBook.org

আপনাদের কোনও অসুবিধা হবে না," কথাটা শেষ করে কয়েকমুহূর্ত চুপ করে থেকে তিনি বললেন, "ওকে আপনাদের হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছি। ওকে যত্নে রাখবেন।"

বসুধরা উপরে এসে দেখলেন, জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বাবলু। বিকেলের আলো জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকছে। বিষণ্ণতার ছোঁয়া লেগে থাকলেও তার মুখটা যেন কোনও নিষ্পাপ দেবশিশুর মতোই। বসুধরার হাতের প্যাকেটগুলো দেখে সে বলল, "ওসব কী আনলে?"

বসুধরা বললেন, "এসব তোমারই জন্য। এসো, আমরা দু'জনে মিলে এখানে বসি।"

বাবলুকে নিয়ে জানালার পাশে মেঝেতে বসলেন তিনি। প্যাকেট থেকে দুটো জিনিস বের করতেই সেটা দেখে বাবলু অবাক হয়ে গেল, একটা খাতা আর একটা জ্যামিতি বক্স!

যতক্ষণ না বাইরের আলো মুছে গেল, তিনি বাবলুকে নিয়ে সেখানেই বসে রইলেন। তারপর উঠে মোমবাতি জ্বালিয়ে গোছগাছ শুরু করলেন। খুব ভোরে তাঁকে রওনা দিতে হবে। সেই বইটাও তিনি ঢুকিয়ে নিলেন ব্যাগে। সরোর স্পর্শ লেগে আছে তাতে! পল্টুকে তিনি পয়সা দিয়ে দেবেন, এর বদলে একটা বই কিনে নেওয়ার জন্য। শুধু পাথরের আংটিটা বাইরে রাখলেন। গোছগাছ, খাওয়াদাওয়া সেরে, ছেলেটাকে ঘুম পাড়াবার পর ঘর থেকে ছাদে উঠে এলেন বসুধরা।

BanglaBook.org

জ্যোৎস্না-প্লাবিত চরাচর। অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে সেই আলোয়। পুকুরের জলেও ছায়া পড়েছে চাঁদের। পরিবাড়ির বাগানের গাছগুলোর মাথা চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে। বসুধরার মনে হল, তারা যেন গাছ নয়, পরিবাড়িকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাচীন সব মানুষের দল। তারা তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে।

ধীরপায়ে বসুধরা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন চিলেকোঠার পরির সামনে। উজ্জ্বল এক আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার গা থেকে। পরির মুখে কি আবছা হাসির আভাস? কাল থেকে আর নিঃসঙ্গ পরিবাড়ির আকাশের ভার বহন করবে না সে। অনেককাল সে দায়িত্ব পালন করেছে। এবার তার মুক্তি। ডানা মেলে সত্যি হয়তো সে এবার উড়ে যাবে চাঁদের দেশে। তিনি পরির পায়ের কাছে বসে তাকিয়ে রইলেন তার মুখের দিকে।

চাঁদের আলোয় বসে স্মৃতি রোমন্থন করছিলেন বসুধরা। এখানে আজই তাঁর শেষ রাত। আর কোনওদিন তিনি ফিরবেন না এই বাড়িতে। নিশুতি রাতে তাঁর কল্পনায় পরিবাড়ির বাড়ির ইট-কাঠ-পাথর, পুকুরের জল, বাগানের গাছ সবকিছুই যেন জীবন্ত হয়ে উঠল। পরমুহূর্তেই চমকে উঠলেন তিনি। একজোড়া জ্বলজ্বলে সবুজ চোখ ছাদের কোনায়! ভামবিড়াল জাতীয় একটা প্রাণী কখন যেন ছাদে উঠে এসেছে। বসুধরাকে দেখতে পেয়ে কয়েক হাত তফাতে থমকে দাঁড়িয়েছে। তাড়া দিতেই সে ছুটল চিলেকোঠার সেই অন্ধকার ঘরটার দিকে। সেখানেই মনে হয় তার বাস। বসুধরার চোখ আটকে গেল ঘরটার দিকে। সেই ঘরটা, যার দিকে তিনি তাকাতে চাননি। এতক্ষণ নিজের ভাবনায় তিনি ছায়া পড়তে দেননি চিলেকোঠার ঘরটার। সচেতনভাবেই এতক্ষণ এড়িয়ে গিয়েছেন তাকে। এই সেই ঘর, যা তাঁর জীবনটাকে ওলটপালট করে অন্য খাতে বইয়ে দিল! এই সেই ঘর, যার জন্য সরোর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে আজও ভয় পান তিনি! পাছে সরো তাঁকে জিজ্ঞেস করে, সেই কুয়াশামাখা বিকেলে তার বাড়ি ছেড়ে কেন বেরিয়ে এসেছিল বসু? কেন বসু এই পরিবাড়ি ছেড়ে হারিয়ে গিয়েছিল অনেক, অনেক দূরে? না চাইলেও, ঘরটার দিকে তাকাতেই সেই অবাঞ্ছিত ছবিটা ভেসে উঠল তাঁর চোখের সামনে। তখন বসু একটু বড়। কোজাগরী পূর্ণিমার দিন। সন্ধেবেলা লক্ষ্মীপুজোর পর বাবা ছুটি দিয়েছেন সকলকে। বাড়ি ফাঁকা। বসু নিজের ছোট্ট মুঠোয় লক্ষ্মীপুজোর দুটো নাড়ু আগলে রেখেছে অনেকক্ষণ। দুটো নাড়ুর একটা সে দেবে পরিকে, আর-একটা সে পরি মারফত পাঠাবে মায়ের কাছে। কেউ কোথাও নেই বুঝতে পেরে একসময় সে ছাদে উঠে এল। চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে গোটা ছাদ। সিঁড়ির ঘর ছেড়ে বসু ছাদে পা রাখতে যাবে, এমন সময় একটা গলার শব্দ শুনতে পেল সে। বাবার গলা! কার সঙ্গে কথা বলছেন বাবা? বাবাও কি পরির সঙ্গে কথা বলেন? সেই জন্যই কি রাতে ছাদে উঠতে মানা সকলের? এক নারীর চাপা কণ্ঠস্বরও কানে আসছে তার। সেটা কি পরির গলা? বসু ছাদে এসে দাঁড়াল। না, পরি একলাই দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। বাবা তো নেই! তারপরই বসু বুঝতে পারল, কথাবার্তার শব্দ আসলে ভেসে আসছে চিলেকোঠার ওই ঘর থেকে। ঘরের দরজা বন্ধ, জানালা খোলা। সেজবাতির মৃদু আলো খোলা জানলা দিয়ে বাইরে আসছে। ওঘরে কার সঙ্গে কথা বলছেন বাবা? কৌতূহল চাপতে

BanglaBook.org

না পেরে বসু ভয়ে ভয়ে, সন্তর্পণে এগিয়ে গেল জানালার দিকে। জানলার কাছাকাছি পৌঁছতেই তার কানে এল সেই নারীকণ্ঠ, "লোকে আড়ালে বলে, আমার জন্যই তোমার স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে।"

বাবার গলা শোনা গেল এবার, "লোকের মুখ বন্ধ করা যাবে না। চলো, আমরা অন্য কোথাও চলে যাই।"

সে নারী বলল, "কিন্তু ছেলেটা?"

বসু শুনল, বাবা বললেন, "ও তো আমার ছেলে..."

এর পরের কথাগুলো ঠিক কানে ঢুকল না বসুর। সে তখন উঁকি দিয়েছে ঘরের ভিতর। এই দৃশ্য সে কোনওদিন দেখেনি। এক নারী এবং এক পুরুষ সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে শুয়ে আছে খাটে। এক অচেনা নারীর মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে বসু। সেজবাতির আলো এসে পড়েছে সেই মুখে। চিবুকের কাছে জ্বলজ্বল করছে একটা তিল। কয়েকটা মুহূর্ত কাটল, তারপরই হঠাৎ জানালার দিকে তাকিয়ে বসুকে দেখতে পেয়ে আর্তনাদ করে উঠল সেই নারী। বসুও সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়ে ছুটল নীচে নামার জন্য।

বসু আর কোনওদিন দেখেনি সেই নারীকে। কিন্তু সেদিনের টুকরো টুকরো কথাগুলো, আর সেই নারীর মুখ স্থায়ীভাবে গেঁথে গিয়েছিল তার মনে। সেই কারণেই ওই ঘটনার বহুদিন পর, সেই বিকেলে সরোর ঘরের ছবিটাকে দেখে তৎক্ষণাৎ চিনে ফেলেছিল বসু আর তারপর...

যে ধারণা নিয়ে বসু সরোর বাড়ি থেকে চলে এসেছিল, এই পরিবাড়ির পরিকে ছেড়ে দিয়েছিল, সে ধারণা ভাঙতে আরও অনেকবছর সময় লেগেছিল। তখন বসুধরা অন্য কারও ঘরনি। মুম্বই যাওয়ার প্রায় দশবছর পর, বাবার মৃত্যুর পর, একটা দরকারি কাগজ খোঁজার জন্য তাঁর ট্রাঙ্কটা খুলেছিলেন বসুধরা। তার ভিতরে ছিল বাবার ব্যাবসা-সংক্রান্ত পুরনো কাগজ, খাতাপত্র আর তারই মধ্যে বাবার ব্যক্তিগত ডায়েরির খোঁজ পান তিনি। সেই ডায়েরিরই এক বিবর্ণ পাতায় লেখা ছিল,

কাল ভোরে বসুকে নিয়ে এবাড়ি ছেড়ে বম্বে চলে যাচ্ছি আমি। আমার স্ত্রী মাধবী, কুসুম, সকলেই একে একে হারিয়ে গিয়েছে পরিবাড়ি ছেড়ে, এ শহর ছেড়ে, অন্য কোনও নক্ষত্রলোকে। কীসের আকর্ষণে আর এখানে পড়ে থাকব আমি? আক্ষেপ শুধু একটাই, চলে যাওয়ার আগে কুসুমের ছেলে সরোর জন্য কিছু করে যেতে পারলাম না। কেন করলাম না? সে আমার

BanglaBook.org

উদ্দেশ্যেই এত সব। কিন্তু তাঁর উপর [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

পাহাড়ের [illegible] তাঁর [illegible]
[illegible] আবছা ফুটে উঠেছে [illegible]
[illegible] একটা [illegible]
[illegible] একটা
[illegible] শুরু
করলেন।

হাত দুটো একবার চোখের উপর বুলালেন বঙ্কুবাবু। [illegible]
[illegible]
গিয়েছিল কাছে গিয়ে তিনি আলোটা তুলে নিলেন। [illegible]
দেখলেন, অন্ধকার ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে। আবছা ফুটে উঠেছে দূরের
গাছপালা। [illegible] এখানেই কোথাও পড়ে আছে। [illegible] কাছে আছে [illegible]
বাক্সটার আগে একবার [illegible] কিছু [illegible]
ভাবলেন, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক।

বঙ্কুবাবু তাঁর কাঁধের ব্যাগ থেকে একটা [illegible]
কাপড়ের টুকরো বের করলেন। [illegible] তৈরি করে
রেখেছিলেন তিনি। [illegible] বঙ্কুবাবুকে কিছুটা [illegible]
হাতে আলো জ্বলে উঠল, [illegible]
ব্যাটারি তো [illegible] কাঁপা কাঁপা হাতে [illegible] করে [illegible]

কানে দিলেন তিনি।

ওপাশে রিং হচ্ছে। শুনতে পাচ্ছেন বসুধরা। তার সঙ্গে শুনতে পাচ্ছেন নিজের হৃৎস্পন্দনও।

রিং থামল। ওপাশে থেকে একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "হ্যালো?"

চুপ করে রইলেন বসুধরা।

এরপর আরও স্পষ্ট শোনা গেল সেই কণ্ঠস্বর, "হ্যালো? আপনি কে বলছেন?"

হ্যাঁ, এবার সেই গলা চিনতে পারল বসু। হ্যাঁ, এ সরোরই কণ্ঠস্বর!

তাঁর শরীর প্রচণ্ড আবেগে কাঁপতে শুরু করেছে। নিজেকে কোনওরকমে সামলে নিয়ে সে জবাব দিল, "আমি পরিবাড়ির পরি বলছি!"

এরপরই বসুধরাকে ওপাশের কথা শোনার সুযোগ না দিয়ে ফোনটা অফ হয়ে গেল। তিনি বারকয়েক চেষ্টা করলেন, সেটটা চালু করার। কিন্তু যন্ত্রের শক্তি ফুরিয়ে গিয়েছে।

সেটা যথাস্থানে রেখে, আংটিটা নিয়ে মোমবাতির সামনে দাঁড়ালেন বসুধরা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আংটিটা দেখলেন। কী করবেন তিনি এই আংটিটা নিয়ে?

আলো ফুটতে শুরু করেছে বাইরে। ঘুমন্ত বাবলুর নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকিয়ে বসুধরার মনে হল, এই বাচ্চাটাই হয়তো ভবিষ্যতের কোনও সরো। সঙ্গে সঙ্গেই আংটিটা ঘিরে তাঁর মনে তৈরি হওয়া প্রশ্নের উত্তরও পেয়ে গেলেন। বসুধরা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন ঘুমন্ত বাবলুর কাছে।

BanglaBook.org

॥ ২০ ॥

আবছা অন্ধকারে ঘুম ভেঙে খাটের উপর বসে, পাশে রাখা মোবাইল ফোনটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন শরদিন্দু। ভোর হচ্ছে। আলোকবিন্দু ঘুলঘুলি দিয়ে ঘরে ঢুকতে শুরু করেছে। টেলিফোনের দিকে তাকিয়ে শরদিন্দু ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না, ব্যাপারটা সত্যি, না কি তাঁরই দেখা স্বপ্নের একটা অংশ? ফোনে সত্যিই কি কেউ বলল, 'আমি পরিবাড়ির পরি বলছি!"

গতকাল বিকেলে একটা চলন্ত গাড়িতে ঠিক তার মতোই একজনকে আবারও দেখেছেন শরদিন্দু। তিনি তখন স্টেশনরোড ধরে নার্সিংহোম যাচ্ছিলেন। একটা বইয়ের দোকানের সামনে থেকে হুস করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা। শরদিন্দু তার কয়েক হাত দূরেই ছিলেন। ড্রাইভারের পাশে বসা মহিলাকে স্পষ্ট দেখেছেন। শুধু তাঁর মাথার ধবধবে সাদা চুলটাই ধন্দে ফেলে দিয়েছে তাঁকে। দু'বারই কি ভুল দেখলেন তিনি, নাকি ব্যাপারটা সত্যি? এই চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে রাতে ঘুমে।তে গিয়েছিলেন তিনি এবং সেই চিন্তা রেশ ধরেই তাঁর স্বপ্নে হানা দিয়েছিল পরিবাড়ি আর অবশ্যই পরিবাড়ির পরি। সারারাত তাকে নিয়ে তিনি ভেসে বেড়াচ্ছিলেন, কখনও পরিবাড়ির বাগানে, কখনও মনসার ঢিপিতে। উজ্জ্বল প্রজাপতির ঝাঁক স্বপ্নের মধ্যে উড়ে বেড়াচ্ছিল শরদিন্দু আর পরিকে ঘিরে। ঠিক সেই সময়ই তাঁর ফোন বেজে উঠেছিল। স্বপ্নের মধ্যেই যেন ফোনটা ধরেছিলেন তিনি।

ফোনটা কেটে যাওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ খাটে চুপচাপ বসে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করলেন তিনি। হঠাৎ তাঁর চিন্তাজাল ছিন্ন হলো। ফোনটা আবার বাজছে! পাশের ঘরে গিয়ে ফোনটা ধরতেই তিথির গলা ভেসে এল, "বাবলুকে পাওয়া গিয়েছে, স্যার!"

"কোথায়?"

"আজ ভোরে আমি বাড়ি ফিরেছিলাম একটা জিনিস নিতে। ঠিক তখনই একজন এসে তাকে ফেরত দিয়ে গেলেন। আপনি আসুন, সব বলছি। তাড়াতাড়ি আসুন, স্যার," উচ্ছাস আর আনন্দের বশেই হয়তো লাইনটা কেটে দিল তিথি।

ভোরবেলা হাঁটতে বেশ ভালই লাগে শরদিন্দুর। জোরকদমে হেঁটে মিনিটকুড়ির মধ্যেই তিথির বাড়ি পৌঁছে গেলেন তিনি। তিথি তাঁর সাড়া পেয়ে বারান্দার গ্রিলের দরজা খুলতে খুলতে প্রবল উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলল, "ডাক্তারবাবু ওর আর-একটা ছবি দেওয়ার কথা বলছিলেন, সেটা নিতে বাড়ি ঢুকছিলাম। ঠিক তখনই ওরা রিকশা থেকে নামল!"

শরদিন্দু বললেন, "কিন্তু কে দিয়ে গেল ওকে?"

তিথি বলল, "এক বয়স্ক ভদ্রমহিলা। ওঁর কাছেই নাকি এই ক'দিন ছিল বাবলু। কালই বিজ্ঞাপনটা দেখেন উনি। আজ ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন। আসুন আমার সঙ্গে, বাবা-ছেলে দু'জনেই ভিতরের বারান্দায় আছে।"

BanglaBook.org

তার সঙ্গে শরদিন্দু ভিতরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। সেখানেও ভোরের মৃদু আলোর পরশ। সেই আলোয় একটা মাদুরের উপর বসে আছে বাবা-ছেলে। সামনে একটা খাতা খোলা, কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে শরদিন্দু দেখলেন, তাতে নানা আকারের অনেকগুলো বৃত্ত আঁকা। বাচ্চাটার হাতে একটা নতুন কম্পাস। সেটা দিয়ে আরও একটা বৃত্ত আঁকছে সে, আর ধীরে ধীরে বাবাকে বলছে, "মিলবে না কেন? এই দ্যাখো, মিলবে!"

তার খাতার দিকে তাকিয়ে বৃত্ত আঁকা দেখছে অনির্বাণ।

একটা নিটোল বৃত্ত আঁকল বাবলু। একদম নিখুঁত বেশ বড় একটা বৃত্ত। ঠিক যেমন আঁকতেন শরদিন্দু। তিনি এগিয়ে গিয়ে তাদের পাশে বসতেই, খাতা থেকে মুখ তুলে তাঁকে দেখে বিস্মিত হয়ে গেল বাবলু। তিনি তার পিঠে হাত রেখে বললেন, "বাহ্, তুমি তো সুন্দর বৃত্ত আঁকা শিখে ফেলেছ!"

বাবলুর মুখে এবার হাসির রেখা ফুটে উঠল। সে বলল, "পরিবাড়ির দিদা আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে, কীভাবে বৃত্ত আঁকতে হয়। তবে দিদা আমাকে এঁকে দেখায়নি। দিদা বলল, 'তুমি পারবে, তুমি পারবে, হাতটা আরও ঘোরাও...' তারপর আমিই আঁকলাম!"

পরিবাড়ির দিদা! চমকে উঠলেন শরদিন্দু আর ঠিক সেই মুহূর্তেই বাবলুর কম্পাস ধরা হাতের উপর তাঁর চোখ পড়ল। ছেলেটার অনামিকায় সেই পাথরের আংটিটা! সূর্যের আলোয় একবার মৃদু ঝিলিক দিয়ে উঠল আংটিতে বসানো লাল বিন্দুর মতো চুনি পাথরটা। বিস্মিত শরদিন্দু তাকিয়ে রইলেন বাবলুর কম্পাস ধরা হাতের দিকে।

তাঁকে ওভাবে হাতের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বাবলু ব্যাপারটা আঁচ করে বলল, "এই আংটিটা আমাকে দিদা দিয়েছে। বলেছে, এই আংটি পরা থাকলে আমি বড় হয়েও বৃত্ত আঁকতে পারব। দিদা বলল, 'তোমার শরদিন্দুস্যার পারেননি, আমি পারিনি, কিন্তু তুমি যাতে পারো, সেই জন্যই এই আংটি তোমাকে দিয়ে গেলাম!'"

তিথি পাশে দাঁড়িয়ে শরদিন্দুকে বলতে থাকল, "ওঁর নাম বসুধরা। পরিবাড়িতে ক'দিনের জন্য এসেছিলেন। ওটা ওঁদেরই বাড়ি। একসময় ওখানেই থাকতেন, এখন মুম্বইয়ে থাকেন। উনিই কম্পাস কিনে দিয়েছেন বাবলুকে। একটা খামও দিয়ে গিয়েছেন আমার হাতে। পরে খুলে দেখি, অনেক টাকা তাতে। আমি আগে জানলে এই টাকা নিতাম না। কত করে

BanglaBook.org

তাঁকে একটু বসতে বললাম, তিনি কিছুতেই বসলেন না। বললেন, ট্রেন ধরতে দেরি হলে ফ্লাইট মিস হয়ে যাবে। আমার বাবলুকে ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন উনি। যেখানেই থাকুন, ভগবান যেন ভাল রাখেন তাঁকে।"

তিথির বাড়ি থেকে বেরিয়ে কয়েক পা হাঁটতেই পিছনে রিকশার হর্নের প্যাঁক প্যাঁক শব্দ শুনে শরদিন্দু দেখলেন পল্টুকে। বাড়ি ফিরে স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হতে হবে। পল্টুর রিকশায় উঠে পড়লেন তিনি।

পল্টু রিকশা চালাতে চালাতে বলল, "এদিকে কোথায় এসেছিলেন, স্যার?"

শরদিন্দু অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল, "এই তো এখানে আমাদের স্কুলের এক ছাত্রর বাড়ি।"

পল্টু বলল, "ওই যে বাচ্চাটাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, তার বাড়ি কি?"

শরদিন্দু বললেন, "হ্যাঁ, তুই কী করে জানলি?"

সে জবাব দিল, "আমিই তো পরিবাড়ি থেকে ঠাকুমা আর বাচ্চাটাকে নিয়ে ওদের বাড়িতে পৌঁছোলাম। ভোরবেলা, সোয়া পাঁচটার সময় ঠাকুমা আর বাচ্চাটাকে নিয়ে বেরোলাম বাড়ি থেকে। উনি টাকার কাউন্টার থেকে টাকা তুললেন। তারপর ছেলেটাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এলেন। তারপর ঠাকুমাকে ইস্টিশনে ট্রেনে তুলে দিয়ে এলাম।"

শরদিন্দু আরও বিস্মিত হয়ে বললেন, "তুই পৌঁছে দিলি স্টেশনে? তুই কি চিনতিস তাঁকে?"

পল্টু জবাব দিল, "আমিই তো গেল হপ্তায় ইস্টিশন থেকে ঠাকুমাকে পরিবাড়িতে পৌঁছে দিলাম। চারদিন আমার গাড়িতেই তো ঘুরল ঠাকুমা। যেদিন আমি বই আনতে ইস্কুলে গেলাম, সেদিন তো রাস্তায় আমার গাড়িতেই বসে ছিল ঠাকুমা। আপনাকে দেখে, আপনার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছিলেন আমাকে। আপনি যে বইটা আমাকে দিয়েছিলেন, সেটা উনি সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন।"

বিহ্বল শরদিন্দু জিজ্ঞেস করলেন, "কেন?"

পল্টু উত্তর দিল, "ঠাকুমা শিক্ষিত মানুষ তো। বোধহয় বইটা ভাল লেগেছে। বইটা সেদিন আপনার থেকে নিয়ে ওর হাতে দিলাম। আমি গাড়ি চালাতে চালাতে নুকিংগেলাস দিয়ে দেখেছি, বইটা কোলে নিয়ে তাতে হাত বোলাচ্ছিল ঠাকুমা," তারপর বলল, "ঠাকুমা সেদিন আপনার বাড়ির

BanglaBook.org

কথা জিজ্ঞেস করছিল। আপনি কোথায় থাকেন, বাড়িতে কে-কে আছে, এসব কথা। আমাকে একবার বলেও ছিল, 'তুই একবার আমাকে ওর বাড়ি নিয়ে যেতে পারিস?' কিন্তু তারপর তো দু'দিন আমি যেতেই পারলাম না পরিবাড়িতে। আপনার কথা অনেক বলেছি তো, তাই হয়তো আমি থাকলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে যেতেন।"

শরদিন্দু প্রশ্ন করলেন, "যেতে পারলি না কেন?"

রিকশার প্যাডেল ঘোরাতে ঘোরাতে পল্টু জবাব দিল, "আমার ছেলে হল যে!"

তিনি আনমনে বললেন, "বাহ্, এটা তো ভাল খবর!"

পল্টু বলল, "হ্যাঁ। এবার বাচ্চাটাকে মানুষ করতে হবে আমাকে। ওর মা তো ওকে জন্ম দিয়েই চলে গেল!"

শরদিন্দুর চমকে উঠলেন এই খবরটায়। তিনি তাকে কী বলবেন, ঠিক বুঝতে পারলেন না।

পল্টু বিষণ্ণভাবে বলেই চলল, "বুঝলেন স্যার, সনাতন বাউল ঠিকই বলে, 'এক জীবনে অর্ধেকের বেশি মেলে না।' ছেলে পেলাম, বউটা চলে গেল।"

শরদিন্দুর কানে ভাসতে থাকল পল্টুর কথাটা, 'এক জীবনে অর্ধেকের বেশি মেলে না...'

আজও ঠিক সময়ই স্কুলে এলেন তিনি। গেটের সামনে উৎকণ্ঠিত, ছাত্র-অভিভাবকদের জটলা। দু'দিন ধরে ছাত্ররা এলেও, টিচারদের ক্লাস বয়কটের ফলে, পঠনপাঠন বন্ধ। আজ স্কুল হবে কি?

সাইকেল রেখে হেডমাস্টারের ঘরে অ্যাটেন্ড্যান্স দেওয়ার জন্য ঢুকলেন শরদিন্দু। হেডমাস্টার তাঁকে দেখে বললেন, "আজ ক্লাস হবে। টিচাররা রাজি হয়েছেন। বাচ্চাটা ফিরে এসেছে, শুনেছেন হয়তো। পুলিশ বলেছে, ও যখন ফিরে এসেছে, তখন কেসটা লাইট করা যাবে। কমপ্লেন না উঠলেও, বিকাশ কোর্টে দাঁড়ালে জামিন পেয়ে যাবে। বিকাশ একজন বড় উকিলের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েশনের রসময়বাবুর মাধ্যমে যোগাযোগ করেছে। এই ক'দিন স্কুলে যা ঝামেলা গেল!"

শরদিন্দু কোনও মন্তব্য না করে অ্যাটেড্যান্স খাতায় সই করলেন।

হেডমাস্টার এরপর বললেন, "আপনার আজ একটু চাপ হবে। অঙ্কের দু'জন টিচার আজ আসবেন না। বিকাশের সঙ্গে অ্যাডভোকেটের কাছে

BanglaBook.org

যাওয়ার কথা ওদের। আপনি আর পরিতোষবাবু শুধু আছেন।"

"ঠিক আছে। অভ্রও তো আছে। তিনজন মিলে ক্লাসগুলো ভাগ করে সামাল দেওয়া যাবে," কথাটা বলে ক্লাসের দিকে যাচ্ছিলেন শরদিন্দু।

হেডমাস্টার তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "অভ্রকে পাবেন না। ও এসেছিল একটু আগে। আমি ওকে স্কুলে আসতে বারণ করে দিলাম।"

বিস্মিত শরদিন্দু ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "বারণ করে দিলেন কেন?"

হেডমাস্টার একটু ইতস্তত করে বললেন, "সেক্রেটারির নির্দেশ, তাই! আমি কী করব, বলুন?" তারপর গলা নামিয়ে বললেন, "শুনেছি, অভ্রর সঙ্গে নীলা বলে একটা মেয়ের সম্পর্ক আছে। মেয়েটা ওই নার্সিংহোমের রিসেপশনিস্ট। বিকাশের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে মেয়েটাও কী একটা স্টেটমেন্ট যেন দিয়েছিল। নীহারবাবু-রসময়বাবুরা অভ্রকে পার্টি অফিসে ডেকে, ওই মেয়েটা যাতে তার স্টেটমেন্ট পালটায়, সেটা দেখতে বলেছিলেন। অভ্র রিফিউজ় করে। তাই ওরা বলে দিয়েছে, অভ্রকে আর রাখা যাবে না। ইন্টারভিউতে তো ওকে ফার্স্ট করা হয়েছিল। কাগজকলমে অবশ্য দেখানো হবে, এখানে চাকরি করতে সে আর আগ্রহী নয়।"

"কীভাবে?"

"ইন্টারভিউ বোর্ডে অভ্রকে দিয়ে একটা সাদা কাগজে সই করিয়ে নেওয়া হয়েছিল সেক্রেটারির নির্দেশে। তাতেই টাইপ করে বসিয়ে দেওয়া হবে কথাগুলো। জানি, ব্যাপারটা আনএথিক্যাল। কিন্তু আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের উপর আর কতটুকুই নির্ভর করে।"

শরদিন্দু আর দাঁড়ালেন না। ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

BanglaBook.org

॥ ২১ ॥

বেশ ক'দিন পর আবার বিকেলবেলা এদিকে হাঁটতে এলেন শরদিন্দু। সূর্য ঢলতে শুরু করেছে, বড় বড় গাছের ডালের ফাঁক দিয়ে নেমে আসা আলোয় ঝোপের উপর প্রজাপতি, কাচপোকার দল ব্যস্ত হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। কোথা থেকে যেন বুনো ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। হাঁটতে হাঁটতে পরিবাড়ি যাওয়ার নির্জন পথটাই ধরলেন তিনি। দু'পাশে বড় বড় গাছ। তার নীচে পুটুশফুলের

ঝোপ। কিছুটা যাওয়ার পরই কথাবার্তার শব্দ যেন শুনতে পেলেন তিনি। কয়েক পা এগিয়েই তিনি দেখলেন, রাস্তার কিছুটা তফাতে একটা বড় ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে কথা বলছে দু'জন, অভ্র আর নীলা। কয়েকমুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালেন শরদিন্দু। শুনলেন, অভ্র বলছে, "তোমার বাড়ি আর যাওয়া হল না আমার।"

নীলা জবাব দিল, "হয়তো হল না। তবে যেখানেই আমি থাকি, জানব যে, এই পৃথিবীতে তোমার মতো একজন মানুষকে কাছে পেয়েছিলাম আমি। আমার ভালবাসা, আমার বিশ্বাস সবকিছুই জমা রইল তোমার কাছে। এই বিশ্বাস তোমার উপর ছিল বলেই, তুমি যখন সেদিন দুপুরে আমার বাড়ি গিয়েছিলে, তখন আমার সবকিছু উজাড় করে তোমাকে দিয়েছিলাম। ওই দুপুরের স্মৃতিটুকু সম্বল করেই না হয় বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব।"

অভ্রর উত্তর শোনার জন্য আর দাঁড়ালেন না শরদিন্দু। অতি সন্তর্পণে সে জায়গা পেরিয়ে হাঁটতে লাগলেন।

আরও কিছুটা এগিয়েই তিনি দেখতে পেলেন, রাস্তার পাশে একটা গাছের নীচে বাণীবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে দেখেই তিনি বললেন, "আরে মশাই, আপনার খবর কী? আমি রোজ রোজ একা একা আসি আর ফিরে যাই,"

শরদিন্দু বললেন, "এই ক'দিন একটু ব্যস্ত ছিলাম, তাই আসতে পারিনি। চলুন..."

পরিবাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে বাণীবাবু বললেন, "আপনার স্কুলে কীসব ঝামেলা চলছে, শুনছিলাম। কোন স্যার, কোন ছেলেকে মেরেছে, সেই ছেলেটা আবার নিখোঁজও হয়ে গিয়েছে! ওসব নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন বুঝি? তা, ঝামেলা মিটেছে?"

"সে ফিরে এসেছে," সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন শরদিন্দু। অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ার জন্যই বাণীবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার খবর কী? ছেলের বিয়ে ব্যাপারে কিছু এগিয়েছে?"

বাণীবাবু বললেন, "এগিয়ে ছিল ঠিকই, কিন্তু ওখানে বিয়েটা হবে না।"

"হবে না কেন?"

"ছেলে কলকাতায় অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে রেজিস্ট্রি সেরে রেখেছে। আমরা অ্যাদ্দিন পর জানলাম। যখন পাকা কথা দিতে যাব, তখন ছেলে খবরটা জানাল।"

BanglaBook.org

শরদিন্দু বললেন, "ভালই হল তা হলে। একটা অনুষ্ঠান করে বউকে ঘরে নিয়ে আসুন। আপনার মেয়ের অভাব পূর্ণ হবে।"

মুহূর্তখানেক চুপ করে থেকে বাণীবাবু বললেন, "সেটা আর হবে বলে মনে হয় না। আপনার কথাটাই বলেছিলাম ছেলেকে। ছেলেও নাকি কথা পেড়েছিল তার কাছে। মেয়েটা সাফ জানিয়ে দিয়েছে, কলকাতা ছেড়ে এখানে সে আসবে না। অনুষ্ঠান একটা হবে ঠিকই। কিন্তু সেটা কলকাতায়।"

দু'জনে চুপচাপ হাঁটতে থাকলেন পরিবাড়ির দিকে। পুকুরটার কাছাকাছি পৌঁছে বাণীবাবু বললেন, "একটা কথা জানা হয়নি। আপনার হাতের খবর কী?"

শরদিন্দু জবাব দিলেন, "ডাক্তার বলল, হাত ঠিকই আছে।"

"তা হলে?"

শরদিন্দু বিড়বিড় করে বললেন, "হয়তো মনে সমস্যা।"

বাণীবাবু সেকথা শুনতে পেলেন না। তিনি বললেন, "ডাক্তার যদি বলে সমস্যা নেই, তা হলে তো সবকিছু ঠিকই আছে। ওই ছেলেটাকে বৃত্ত এঁকে দিয়েছেন আপনি?"

শরদিন্দু বললেন, "আমি আঁকিনি। সে নিজেই এঁকেছে। আসল ব্যাপারটা কী, জানেন? আমরা কেউই কোনওদিন বৃত্ত আঁকতে পারিনি। আশা করি, এইসব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যেন বড় হয়ে জীবনবৃত্ত আঁকতে পারে।"

তাঁর কথা শুনে ঘাড় নাড়লেন বাণীবাবু।

পুকুরের সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে বসলেন দু'জন। অন্যদিনের মতো একইরকম নির্জন জায়গাটা। পাশের ঝোপঝাড় থেকে কাচপোকার শব্দ ভেসে আসছে। ফড়িঙের দল উড়ে বেড়াচ্ছে জলের উপর। কাঠিপোকা লাফাচ্ছে জলে। বৃত্ত হতে হতে ভেঙে যাচ্ছে জলতরঙ্গ। তাঁরা দু'জন জলের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে রইলেন। একসময় বাণীবাবু বললেন, "বেলা শেষ হয়ে এল। চলুন, এবার ফিরতে হবে।"

উঠে দাঁড়ালেন দু'জনে। বাণীবাবু হঠাৎ বললেন, "একটা ব্যাপার খেয়াল করেছেন? বাড়ির মাথায় পরিটা আর নেই!"

শরদিন্দু তাকালেন বাড়িটার দিকে। সত্যি, পরিবাড়ির মাথায় সেই পরিটা আর নেই। অসীম শূন্যতা বিরাজ করছে সেখানে। সূর্য ডুবে গিয়েছে। বাড়ির মাথার উপর আকাশ দেখা যাচ্ছে। সেটা ঠিক যেন নিটোল এক অর্ধবৃত্ত।

BanglaBook.org